

3/209

শ্রী প.
শ্রীমতী,
শ্রী উদ্ভব ও
শ্রী বসন্ত

Library
SHREE SHREE MA ANANDAMAYEE ASHRAM

Bhadaini, Varanasi-1

No 3/209.....

Book should be returned by date (last) noted below
or re-issue arranged. Otherwise a fine of 10 N.P.
daily shall have to be paid.

--	--	--	--	--

3/209

१/३३

संस्कृत (२)

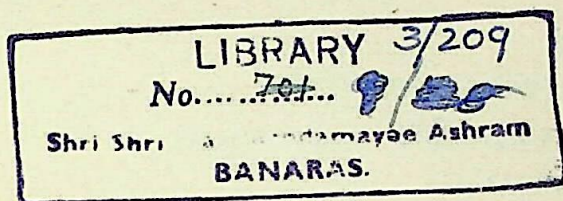
3/209

35



সাদু-তপস্বী

দ্বিতীয় খণ্ড



অুধাংশুরঞ্জন ঘোষ

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকতা-১৬

প্রথম প্রকাশ—বৈশাখ, ১৩৭৫

প্রকাশক

ময়ূখ বসু

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

১৪, বঙ্কিম চাট্টো স্ট্রীট

কলিকাতা—১২

মুদ্রক

দি প্রেস উত্তরা

অজিতকুমার রায়

১, রমাশ্রমাদ রায় লেন,

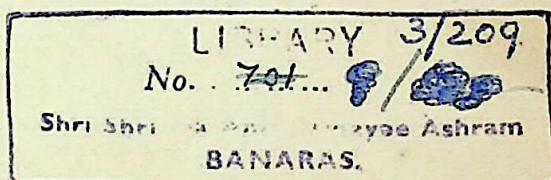
কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদশিল্পী

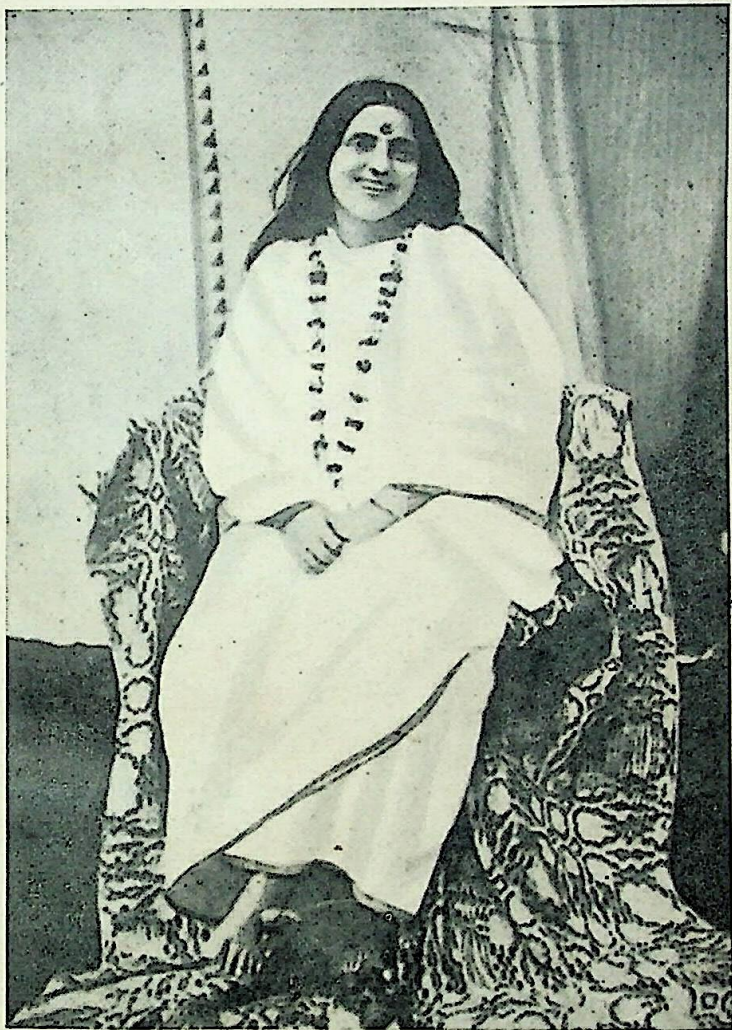
আশিস সেনগুপ্ত

ছয় টাকা পঞ্চাশ পয়সা

পরমারাধ্যা জননী শ্রীকালিদাসী ঘোষ
শ্রীচরণকমলেশু



শ্রীশ্রীআনন্দময়ী মা	১
শ্রীশ্রীঠাকুর অন্নকুলচন্দ্র	৩২
শ্রীশ্রীঠাকুর ওঙ্কারনাথ সীতারাম দাস	৯০
নিরালম্ব স্বামী	১৩১
মোহনানন্দ স্বামী X	১৬৩
দেবমানব মহাত্মা গুরুনাথ	১২৮



শ্রী শ্রী আনন্দময়ী মা

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী

আজ থেকে ঠিক একাত্তর বছর আগের কথা। ১৩০৩ সালের ১৯শে বৈশাখ।

সেকালে কন্ঠা-সন্তানের প্রতি বাপ-মার খুব একটা উৎসাহ থাকত না। কিন্তু ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত খেওড়া গ্রামের বিপিনবিহারী ভট্টাচার্য মশায় ছিলেন অগ্নি ধরনের মানুষ। জীবনের সব ভাল-গন্দ যিনি ঈশ্বরের উপর সঁপে দিয়েছেন, কোন একটি বিশেষ ঘটনার প্রতি তাঁর কোন উৎসাহ বা নিরুৎসাহ থাকার প্রশ্নই ওঠে না। অত্যন্ত ধর্ম-প্রাণ আর সরলস্বভাবের মানুষ ছিলেন বিপিনবিহারী। এই জগতে এবং জীবনে যা-কিছু ঘটে তা সবই বিধিনির্দিষ্ট, এ-বিষয়ে তাঁর বিশ্বাস ছিল যেমন গভীর তেমনি অটল।

তাই ১৯ বৈশাখ রাত্রি তৃতীয় প্রহর গত হতে না হতেই যখন একটি কন্ঠাসন্তান জন্মগ্রহণ করল তাঁর ঘরে, তখন কোনরূপ বিচলিত হলেন না মনে মনে। পুত্রই হোক বা কন্ঠাই হোক সব তাঁরই দান।

মেয়ে নয়, যেন একটি সত্ত্ব ফোটা ফুল। ধবধবে সাদা রঙ, মাথায় এক মাথা চুল। গাঁয়ের যারা দেখতে আসে মেয়ের রূপ দেখে অবাক হয়ে যায়। কিন্তু বিপিনবিহারী ভাবেন শুধু গুণের কথা। শুধু রূপ হলে চলবে না। গুণ চাই। রূপে ভুবন আলো করতে পারে না; একমাত্র গুণের আলোই অবিচার অন্ধকারকে দূর করে আলোকিত করে জগৎ সংসারকে।

মেয়ের নাম রাখা হলো নির্মালা। জ্যোতিষীরা জাতকের জন্মলগ্ন ও রাশিচক্র বিচার করে আশ্চর্য হয়ে গেলেন। এরকম কোষ্ঠী দেখাই যায় না। তাঁদের অনেকে বললেন, এ মেয়ে রাজরাণী হবে। তবে ধনসম্পদের রাণী নয়, পার্থিব ভূসম্পত্তির রাণী নয়, ইনি হবেন আধ্যাত্মিক জগতের রাণী।

সে এখন পরের কথা। তবে খেলার সাথীদের মধ্যে অল্পকালের মধ্যেই প্রিয় হয়ে উঠলেন নির্মলা। শিশুসুলভ চঞ্চলতা বা দৌরাড্যা কোন কিছুই ছিল না তাঁর। তবু পাড়ার সমবয়সী ছেলেমেয়েদের উপর তাঁর প্রভাব ছিল বড় অদ্ভুত। যাকে যা বলতেন তাই সে তৎক্ষণাৎ শুনত। ছোট থেকেই বড় শান্ত ও শিষ্ট স্বভাবের মেয়ে ছিলেন নির্মলা। এত শান্তশিষ্ট যে গাঁয়ের অনেকে তাঁকে হাবা-বোবা বলত।

বাবা-মা ভাবতেন হাবা-বোবা হয়েই বেঁচে থাক। কিন্তু অনেকে আবার এই হাবা-বোবা ভাবটাকেই গুণ বলে মনে করত। শান্ত-নয় ভাবটার মধ্যে আছে তাঁর স্বভাবের এক বিরল মাধুর্য। কালো কালো ভাসা-ভাসা চোখ দুটোর মধ্যে আছে এক স্থির বুদ্ধির ছটা। অনেকে ভাবত নির্মলা বড় হয়ে রূপে গুণে আলো-করা মেয়ে হবে।

কিন্তু ছোট্ট মেয়ে নির্মলার একটা কাণ্ড দেখে অবাক হয়ে গেল অনেকে। এমনিতেই নির্জনে একা একা থাকতে ভালবাসেন নির্মলা। খেলার সাথীরা তার জন্ম পাগল হলেও খেলাধুলার প্রতি তাঁর নিজের তেমন আগ্রহ নেই। তা না থাকলেও কেউ কখনো গাছপালার সঙ্গে কথা বলে না। নির্মলা অনেক সময় একা একা গাছপালার সঙ্গে কথা বলে—এটা দু'চারদিন অনেকরই চোখে পড়েছে। গাছপালাগুলোর সঙ্গে অন্তরঙ্গতার সুরে কথা বলে নির্মলা। ঠিক যেন ওদেরও প্রাণ আছে, অনুভূতি শক্তি আছে। দেখে-শুনে আশ্চর্য হয়ে যায় সবাই।

বাবা-মা কিন্তু শুধু আশ্চর্য হলেন না কথাটা শুনে, চিন্তাশ্রিত হয়ে পড়লেন। মেয়েটা আবার শেষকালে পাগল হয়ে যাবে না তো! মা মোক্ষদাসুন্দরী ধর্মপ্রাণ ও বড় হরিভক্তিপরায়ণা মহিলা ছিলেন। মুখে তাঁর হরিনাম লেগেই থাকত। হরিভক্তি ও ধর্মসাধনার জন্ম তাঁদের বংশের খ্যাতি আছে। এই বংশের একজন সতীসাম্বী মহিলা হরিনাম করতে করতে স্বামীর জলন্ত চিতায় বাঁপ দিয়ে স্বেচ্ছায় সহমৃত্যু হন।

সব কিছু দেখে-শুনে মা মোক্ষদাসুন্দরী একদিন স্বামীকে বললেন,

ভবিষ্যতে কে কী হবে তা ভাববার আমরা কে বলতে পার ? যাঁর ভাবনা তিনিই ভাববেন । হরি যা করেন তাই হবে । তাঁর উপর মেয়ের ভবিষ্যতের সব ভাল-মন্দ ছেড়ে দিয়ে চুপ করে বসে থাক ।

গাঁয়ের অনেকে পরামর্শ দিল, মেয়েকে পরগোত্র করে দাও ; অণ্ড একজনের ভাগ্যের সঙ্গে ওর ভাগ্যকে জুড়ে দিলেই দেখবে ওর ভাগ্যের পরিবর্তন হবে । তোমাদের চিন্তার কিছু থাকবে না ।

তাছাড়া সে-সময় অল্প বয়সেই বিয়ে হত । পাত্রের সন্ধান চলতে লাগল । মেয়ের জন্ম সংপাত্র চান বিপিনবিহারী । শাস্ত্রে বলেছে, সংপাত্রে কন্যাদান । পাত্রের বাড়ির আর্থিক অবস্থা বা তাদের ভূসম্পত্তির পরিমাণ দেখতে চান না তিনি ।

অবশেষে সন্ধান মিলল । যেমনটি চেয়েছিলেন বিপিনবিহারী ঠিক তেমনটি । ঢাকা জেলার অন্তর্গত বিক্রমপুরের কাছাকাছি আটপাড়া গাঁয়ের বিখ্যাত ভরদ্বাজ বংশের সন্তান । নাম রমণীমোহন চক্রবর্তী । ছেলেকে দেখে ও তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলে খুব খুশি হলেন বিপিনবিহারী ।

এমন ধর্মভীরু ও পরোপকারী ছেলে খুব কম পাওয়া যায় ।

বিয়ের পর নির্মলা কিছুদিন শ্বশুরবাড়িতে থাকেন । তারপর আসেন বাপের বাড়ি বিছাকুটে । খেওড়াতে জন্ম হলেও আসল বাপের বাড়ি খেওড়া নয় । খেওড়া হচ্ছে তাঁর বাবার মামার বাড়ি এবং সেইখানেই বিপিনবিহারীর প্রথম জীবন কাটে । পরে বাবার চাকরির জায়গা মৈমনসিং-এর অন্তর্গত বাজিতপুরে গিয়েও পাঁচ-ছয় বছর থাকতে হয় নির্মলাকে ।

কিন্তু যখন যেখানে যার কাছেই থাকুন না কেন, কোথাও কখনো সংসারের প্রতি বিন্দুমাত্র আসক্তিও দেখা যায় নি নির্মলার মধ্যে । সদা সর্বদা এক দিব্যভাবে বিভোর হয়ে আছে যেন তাঁর মনপ্রাণ । মাঝে মাঝে ঠাকুরের ধ্যান করতে গিয়ে তন্ময় হয়ে যান । কোন বিষয়েই কোন হুঁশ থাকে না । বিশেষ করে হরিনাম বা কোন কীর্তনগান কানে

যাবার সঙ্গে সঙ্গেই বাহুজ্ঞান হারিয়ে ফেলেন তিনি । এক অপূর্ব দিব্যভাবে আবেশ জড়িয়ে উঠে সারা দেহে ।

তঁার এই অবস্থা দেখে চিন্তায় আকুল হয়ে উঠলেন বাপের বাড়ির ও শ্বশুরবাড়ির অনেকে । বাবা-মা আশঙ্কা করতে লাগলেন, মেয়েটা সন্ন্যাসিনী হয়ে বেরিয়ে যাবে না তো । শ্বশুরবাড়ির অনেকে বলতে লাগল, এমন রূপবতী ও গুণবতী বউটি শেষকালে পাগল হয়ে যাবে নাকি । একমাত্র রমণীমোহনই নির্বিকার । কোনরূপ চিন্তা বা শঙ্কাই অনুভব করলেন না তিনি । স্ত্রীকে ভালবাসেন রমণীমোহন । এবার সেই ভালবাসার সঙ্গে যুক্ত হলো এক গভীর শ্রদ্ধা । স্ত্রীর প্রতি সেই শ্রদ্ধাবিমিশ্রিত ভালবাসাটা দিনে দিনে বেড়ে যেতে লাগল তঁার । সর্ব রকমে সাহায্য করতে লাগলেন স্ত্রীর ধর্মসাধনায় ।

একটা কথা ভেবে আশ্চর্য হয়ে যায় সবাই । নির্মলার এখনো গুরুকরণ হয়নি । কারো কাছে পূজার বিধি, দেবদেবীর ধ্যানমন্ত্র বা যোগক্রিয়ার পদ্ধতির বিষয়ে কোন কিছু শিক্ষা করেননি । তবু এগুলি আপনা হতেই কীভাবে যে আয়ত্ত্ব করে ফেলেছেন তিনি তা কেউ কিছু বুঝতে পারে না ।

একজন সিদ্ধ যোগীর মতো তিনি আসনে বসে ধীরে ধীরে মগ্ন হয়ে যান যোগক্রিয়ায় । পরে সমাধিস্থ হয়ে পড়েন । এই অবস্থায় এক-একদিন তঁার মুখ হতে বহু দৈববাণী ও অধ্যাত্মসাধনার বহু গূঢ় তত্ত্ব আপনা হতে বেরিয়ে আসে । তার সব অর্থ সাধারণ লোক তো দূরের কথা, শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতরাও উদ্ধার করে উঠতে পারতেন না ।

ঢাকার শাহবাগে সিদ্ধেশ্বরী কালীবাড়ি হিন্দুদের একটি প্রসিদ্ধ ধর্মক্ষেত্র । বাজিতপুরের থাকার সময়েই এই জায়গাটির কথা মনে হয় নির্মলার । এতদিন সিদ্ধেশ্বরীর আসনটি সংস্কারের অভাবে অবহেলিত অবস্থায় জীর্ণ হয়ে পড়ে ছিল । নির্মলা এসে সেই আসনের সংস্কার করলেন এবং সেখানে এসে মৌনব্রত অবলম্বন করে নূতন উত্তম

সাধনা শুরু করলেন।

এই সিদ্ধেশ্বরী আসনেই একদিন তাঁকে শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী নামে নামকরণ করেন ভক্তেরা।

শাহবাগে আসার পর হতে বহু ভক্তের সমাগম ঘটতে থাকে মার কাছে। এই সময় এখানে যে-সব পূজা কীর্তন ও যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হতে থাকে, তাতে দলে দলে অসংখ্য লোক যোগ দেয়। তখন তাঁকে ভক্তরা বলত শাহবাগের মা।

উপর থেকে মাকে দেখে মনে হয় যেন সৌম্য শান্ত লজ্জাশীল। এক সাধারণ কূলবধু। কিন্তু কাছে গেলেই দেখা যায় উচ্চতর সাধনলব্ধ দিব্যভাবের এক অলৌকিক বিভূতি ঝরে পড়ছে সর্বান্তে। যে দেখে এক গভীর স্বতস্কৃত মাতৃভাবে ভরে যায় তার হৃদয়। সকলেরই মনে হয়, ইনি আমার মা। শুধু আমার মা নয়। ইনি সারা জগতের মা। নির্বিশেষ জগন্মাতা অসংখ্য জীবের মুক্তির জন্য সশরীরে আর্বিভূত হয়েছেন পাপ-তাপ জর্জরিত এই সংসারে।

বেশ ফর্সা এবং উজ্জ্বল রঙ। মৌনব্রত অবলম্বনের জন্য মুখে সব সময় কথা না বললেও মুখে হাসি কিন্তু সর্বদা লেগেই আছে। একখানি সাদা শাড়িতে সর্বাঙ্গ ঢাকা। একরাশ কালো চুল আলুলায়িত হয়ে ছড়িয়ে আছে পিঠের উপর।

মার এই মূর্তি দেখার সঙ্গে সঙ্গে যে কোন মানুষের শোক তাপ মুহূর্তে দূর হয়ে যায়। ত্রিতাপ জ্বালা হতে মুক্ত হয়ে যায় নিমেষের মধ্যে। শিশু যেমন কোন কষ্ট পেয়ে কাঁদতে কাঁদতে এক নিশ্চিন্ত নির্ভরতায় মার কোলে ঢলে পড়ে এক অপার শান্তি লাভ করে, তেমনি মাকে পেয়েও অসংখ্য ভক্ত অনন্ত ও অনাবিল শান্তি লাভ করে।

হাসি নয় যেন অমৃত। পরম আনন্দের এক অফুরন্ত অমৃতধারা ঝরে পড়ছে মার হাসিতে। সে হাসির দিব্য ছটায় জগৎ হতে নিঃশেষে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে যত অশান্তি আর পাপের অন্ধকার। মার শুভ্র বসন বিশুদ্ধতা ও পবিত্রতার প্রতীক। তাঁর পরিধেয় বসনের এই শুভ্রতা

উপহাস করছে যেন পৃথিবীর সমস্ত রকমের মলিনতাকে। মা আলুলায়িত কুন্তলা। তাঁর মুক্ত কেশপাশ যেন অখণ্ড মুক্তির প্রতীক। মা ভব বন্ধন অর্থাৎ লজ্জা, ঘৃণা, ভয়, মোহ, দ্বেষ, শঙ্কা, চৈতন্য ও জগৎসা—এই অর্টপাশ হতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়েছেন বলেই এক জগদ্ব্যাগী সত্তায় ছড়িয়ে পড়তে পারেন সব জীবের অন্তরে। মোক্ষের সন্ধান দিতে পারেন অসংখ্য বদ্ধ জীবকে।

সকল জীবকেই মা সন্তান জ্ঞানে ভালবাসতেন, জীবরাও যেন বুঝতে পারত তাদের প্রতি মার এই অকুণ্ঠ স্নেহ আর মমতার কথা। দেখা গেছে, মা যখন ধ্যানমগ্ন অবস্থায় থাকতেন তখন ছাগল কুকুর বিড়াল প্রভৃতি অনেক জীব এক আশ্চর্য শ্রদ্ধাভরে মার প্রতি তাকিয়ে থাকত নিমেষহারা চোখে। হরিনাম শুনত। এমন কি একদিন এক ভক্ত ভয়ে ও বিস্ময়ে অবাক হয়ে দেখে, মা যখন একটি গাছের তলায় বাহুজ্ঞানহীন অবস্থায় ধ্যানমগ্ন হয়ে রয়েছেন তখন একটি প্রকাণ্ড বিষধর সাপ তার হিংসার্তি ভুলে গিয়ে মার পিঠে তাঁর মাথার উপর ফনা তুলে রয়েছে। অনেকক্ষণ এইভাবে থাকার পর আপনা হতেই সাপটি কোথায় চলে গেল।

আর একদিন ভক্ত নিরঞ্জনের বাড়িতেও মার পিছু পিছু একটি সাপ গিয়েছিল।

একবার ঢাকায় কালীপূজার সময় একটি বলির ছাগের উপর মার করুণা দেখে আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল সকলে। মার পূজাবিধি ছিল সত্যিই অলৌকিক। তিনি কখনো শাস্ত্রপাঠ করেননি, পূজা পদ্ধতি কারো কাছে শেখেননি; অথচ পূজার দৈহিক ও মানসিক ক্রিয়াগুলি আপনা হতেই তিনি করে ফেলতেন স্ফূর্তরূপে।

১৯২৫ সালে মার অলৌকিক স্বভাবসিদ্ধ পূজাবিধি দেখবার জন্য বহু ভক্ত কালীপূজার জন্য প্রার্থনা জানালেন মার কাছে।

মা প্রথমে বললেন, আমি পূজার আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকলাপের কোন খোঁজ-খবর রাখি না। পুরোহিতকে দিয়ে করানোই ভাল।

কিন্তু ভক্তেরা ছাড়বেন না। যা হয় হবে, মাকেই পূজা করতে হবে।

যথারীতি মূর্তি আনা হলো এবং আয়োজনও সব কিছু করা হলো। তারপর মা পূজায় বসলেন। কিন্তু আশ্চর্য হয়ে সবাই দেখল মন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে মা সমস্ত ফুল, বেলপাতা চন্দন মাখিয়ে নিজের মাথার উপর চাপাতে লাগলেন। মাঝে মাঝে তার দু'একটি কালী প্রতিমার গায়ে ছুড়ে দিলেন।

পূজার পর বলি। বলির ছাগটিকে স্নান করিয়ে মার কাছে আনা হলো। সঙ্গে সঙ্গে মা সেটিকে কোলে নিয়ে কাঁদতে কাঁদতে তার শরীরে হাত বুলাতে লাগলেন। দেখে সবার মনে হলো, ছাগশিশুটি সত্যিই যেন মার আপন সন্তান। পরে মা ছাগটির কানে কানে কী এক মন্ত্র জপ করলেন।

এর পর খড়্গ উৎসর্গ করার কথা। মা তখন মাটিতে শুয়ে পড়ে নিজের কাঁধের উপর খড়্গটিকে স্থাপন করলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে পাঁঠার কাতর চিৎকারের মত তিনটি ডাক তাঁর কণ্ঠ হতে বেরিয়ে এল। তারপর উঠে পড়ে বলির জন্তু ছাগটিকে ছেড়ে দিলেন মা। কিন্তু বলির সময় দেখা গেল ছাগটি কোনরূপ চিৎকার বা ছটফট করছে না। খড়্গাঘাতের কোন যন্ত্রণাই অনুভূত হচ্ছে না তার। বলির পর দেখা গেল, তার দ্বিখণ্ডিত দেহ থেকে এক ফোঁটা রক্তও বার হচ্ছে না। অনেক চেষ্টা করে হোমের মাত্র এক ফোঁটা রক্ত বার করা হলো।

বলির আগে মা তাঁর অলৌকিক জৈবী শক্তিবলে ঐ ছাগপশুটির সমস্ত জীবন যন্ত্রণা ও জৈবচেতনা নিজের সন্তার মধ্যে শোষণ করে নিয়ে মুক্তি দান করেছিলেন তাকে।

পরের বছরও আবার শাহবাগের ভক্তেরা মাকে কালীপূজার জন্তু পীড়াপীড়ি করতে লাগল। মা এবার ভোলানাথ বাবাকে বললেন, তুমিও তো পূজা করতে পার।

ভক্তেরা তাদের পিতাজীকে ভোলানাথ বাবা বলে ডাকত। ভোলানাথ বললেন, তোমাদের মার মুখ হতে যখন কথাটা বেরিয়েছে তখন পূজা হবেই। তবে কাল পূজা, মাত্র একদিনের মধ্যে মূর্তি যোগাড় করতে হবে।

শহরের সমস্ত দোকান ঘুরে শেষকালে দেখা গেল মাত্র একটি দোকানে একটি মূর্তিই অবিক্রান্ত পড়ে রয়েছে। আরও দেখা গেল পিতাজী যে মাপের মূর্তির আদেশ দিয়েছেন মূর্তিটি ঠিক সেই মাপের।

সেবার কিন্তু মার আদেশে ছাগবলির কোন ব্যবস্থাই হলো না। পূজোর সময় মা পিতাজীকে বললেন, আমি আসনে যাচ্ছি, তুমি পূজা কর।

মা কালীমূর্তির পাশে গিয়ে মাটির উপর বসে পড়লেন। তারপর উপস্থিত ভক্তদের চোখ বন্ধ করতে বললেন। পূজার পর সকলে চোখ খুলে দেখল, উকিল বৃন্দাবনচন্দ্র বসাক মূর্তিত হয়ে পড়ে রয়েছেন। জ্ঞান ফিরে পেয়ে তিনি বললেন, মার কথা না শুনে মার মুখের দিকে একবার তাকিয়েছিলেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মুখমণ্ডলে এক আশ্চর্য উজ্জ্বল দিব্যজ্যোতি দেখে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন।

বলির ব্যবস্থা হয় নি। পূর্ণাহুতি দেবার সময় মা বললেন, পূর্ণাহুতি দেয়া হবে না, যজ্ঞের অগ্নি রেখে দাও।

পূজার পর প্রতিমাটি রেখে দেয়া হয়। একবার মা যখন কক্স-বাজারে ছিলেন, তখন একদিন সন্ধ্যার সময় সমুদ্রের ধারে বেড়াতে বেড়াতে জ্যোতিষচন্দ্র রায় নামে একজন ভক্তকে বললেন, দেখ তো, আমার হাতখানা ভাঙা নাকি ?

পরে জানা গেল, সেই রাত্রিতেই ঢাকার শাহবাগে রক্ষিত সেই কালীমূর্তিটির হাত ভেঙে চোরে গয়নাগুলি সব চুরি করে নিয়ে গেছে।

আর একবার ঢাকার সিদ্ধেশ্বরী আশ্রমে বাসন্তী পূজা হয়। প্রতিমার প্রাণপ্রতিষ্ঠার সময় মা সেখানে গিয়ে মূর্তিগুলির দিকে একদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকতেই মাটির চোখগুলি অবিকল মানুষের চোখের

মতো হয়ে উঠেছিল।

মাকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে মা বললেন, দেবদেবীর সত্ত্বা তোমার আমার দেহের মতোই সত্য এবং ভাবের চোখে তাঁদের দর্শন লাভ হয়।

ভক্তপ্রবর জ্যোতিষচন্দ্র রায় ১৯২৪ সালে একদিন ঢাকায় মার কাছে অবস্থানকালে মাকে ‘আনন্দময়ী’ নামে ভূষিত করেন। জ্যোতিষ-চন্দ্র তখন চাকরির কাজে ঢাকায় ছিলেন। ছয়মাস আগে তিনি মার সংস্পর্শে আসেন। এই ছয় মাসের মধ্যে তাঁর মধ্যে ধর্মভাবের কতখানি উন্নতি হয়েছে তা দেখবার জন্য মা একদিন বেলা বারোটোর সময় জ্যোতিষচন্দ্রকে অফিস হতে ডেকে পাঠান।

সেদিন অফিসে খুব জরুরি কাজ ছিল জ্যোতিষচন্দ্রের। বড় সাহেব ছুটি হতে ফিরে চার্জ বুঝে নেবেন। তবু মার আদেশ লঙ্ঘন করতে পারলেন না তিনি। সব কাজ ফেলে রেখে মার কাছে চলে গেলেন। শাহবাগে যেতেই মা বললেন, সিদ্ধেশ্বরী আশ্রমে চল।

পিতাজীও সঙ্গে গেলেন। আসনের কাছে একটি কুণ্ড ছিল। মা তাঁর মধ্যে বসলেন। সঙ্গে সঙ্গে মার মুখমণ্ডল হতে বিচ্ছুরিত হতে লাগল এক অপক্লপ দিব্য আনন্দের দ্যুতি। এক মহাভাবে বিভোর হয়ে পড়লেন তিনি। তাঁর এমন আনন্দঘন মূর্তি এর আগে কখনো দেখেননি জ্যোতিষচন্দ্র। মনে হলো মা যেন সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপ। জীবের কল্যাণের জন্য স্বয়ং ব্রহ্ম যেন এমন আনন্দময়ী মূর্তিতে আবির্ভূত হয়েছেন। তাই আনন্দের অমৃত ঝরে পড়ছে মার প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হতে। তার দেহমনের প্রতিটি অনু-পরমাণু সেই অমৃত দিয়ে গড়া। ব্রহ্মস্বরূপ সৎ চিৎ এবং আনন্দ এই তিনটি রূপে বিভক্ত। কিন্তু মাকে দেখলে আর কোন রূপের কথা মনে পড়ে না। সৎ নয় চিৎ নয়, কেবল আনন্দ আর আনন্দ। তাঁর আনন্দ সত্তার অগিত উচ্ছ্বাসের মধ্যে সৎ ও চিৎশক্তির সমস্ত বিকাশ যেন নিঃশেষে তলিয়ে গেছে।

উপনিষদে আছে আনন্দই ব্রহ্মের প্রকৃত স্বরূপ। অন্ন নয়, প্রাণ নয়,

মান নয়, বিজ্ঞান নয়, আনন্দই ব্রহ্ম। ব্রহ্মের এই আনন্দময় স্বরূপটি অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় এই চারটি কোষের মধ্যে ঢাকা আছে। কিন্তু মাকে দেখে সেদিন জ্যোতিষচন্দ্রের মনে হলো, চারটি কোষের আবরণগুলি ফাটিয়ে দিয়ে ব্রহ্মের আনন্দময় স্বরূপটি আপনা হতেই প্রকাশ হয়ে পড়েছে মার মূর্তির মধ্যে।

পিতাজীকে হঠাৎ বললেন জ্যোতিষচন্দ্র, মাকে আমরা এবার হতে শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী বলব।

পিতাজী সঙ্গে সঙ্গে প্রশংসামুখে বললেন, আচ্ছা তাই হবে।

সেখান থেকে ফিরতে বিকাল হয়ে গেল। ফিরবার সময় কিন্তু অফিসের কথাটা মনে পড়ল জ্যোতিষচন্দ্রের। পরদিন সাহেবকে কী কৈফিয়ৎ দেবেন তিনি তাই ভাবছিলেন। এমন সময় মা তাঁর মনের কথা জানতে পেরে নিজে থেকেই বললেন, তোর কোন চিন্তা নেই।

পরদিন জ্যোতিষচন্দ্র অফিসে গেলে সাহেব ও বিষয়ে কোন কথাই তুললেন না।

আর একবার একটি ঘটনায় আশ্চর্য হয়ে যান জ্যোতিষচন্দ্র। সেবার ঢাকায় গভর্নর এসেছেন। একদিন তাঁর অফিসের বড় সাহেব তাঁকে বললেন, কাল সকাল সাড়ে নটায় অফিসে আসবে, আমি গভর্নরের সঙ্গে দেখা করতে যাব।

কিন্তু পরদিন সকালে শাহবাগে মার কাছে গিয়ে ফিরতে দেরি হয়ে গেল জ্যোতিষচন্দ্রের। অফিসে পৌঁছে দেখেন নটা বেজে পঞ্চাশ মিনিট হয়ে গেছে। সাহেব নিশ্চয় তাঁকে তাঁর দায়িত্বহীনতার জন্য তিরস্কার করবেন এই কথা ভাবতে লাগলেন। কিন্তু শুনলেন, সাহেব তখনো এসে পৌঁছাননি এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই সাহেব তাঁকে টেলিফোন করে জানালেন, তাঁর মোটর খারাপ হয়ে গেছে, সেজন্য আসতে পারেননি, তিনি এগারোটায় সময় গভর্নরের সঙ্গে দেখা করতে যাবেন।

সেইদিন জ্যোতিষচন্দ্র বুঝলেন, যাঁরা উচ্চ-মার্গের সাধক-সাধিকা তাঁরা ইচ্ছামত বাইরের জগতের ঘটনাকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারেন।

এটা তাঁদের লীলা ছাড়া আর কিছুই নয়।

আনন্দ হতেই যদি এই বিশ্ব-জগতের সব কিছুর উৎপত্তি হয়, আনন্দের জন্মই যদি তারা বেঁচে থাকে আবার আনন্দেতেই যদি তারা লীন হয়ে যায় তাহলে জীব ও জড়বস্তুতে ভেদ কোথায়? তাহলে শীত, গ্রীষ্ম বা ঠাণ্ডা, গরমে পার্থক্য কোথায়? একদিন একজন ভক্ত মাকে জিজ্ঞাসা করলেন, মা আপনার তো ঠাণ্ডা গরমের কোন ভেদজ্ঞান নেই। একটি জ্বলন্ত কয়লা যদি আপনার পায়ের উপর পড়ে তাহলে আপনার কষ্ট হবে না?

মা বললেন, দিয়েই দেখ না।

ভক্তটি আর কোন কথা বললেন না। কিন্তু ভক্তের মনের আসল কথাটি জানতে বাকি রইল না মার।

এর দিনকতক পর মা সেই ভক্তের সামনে একখণ্ড জ্বলন্ত কয়লা পায়ের উপর নিজেই রাখলেন। দেখতে দেখতে পায়ের সেই জায়গার ছাল চামড়া পুড়ে যা হয়ে গেল। ভক্তটি নিজে যন্ত্রণা বোধ করতে লাগলেন। অথচ মার মুখে কোন বিকৃতি নেই। হাসি মুখে চুপ করে অচ্যুতকে উদাস দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন। যেন কিছু হয়নি। এক ফোঁটা ঠাণ্ডা জলের সঙ্গে ঐ জ্বলন্ত কয়লাখণ্ডটার যেন কোন পার্থক্য নেই মার কাছে।

মাসখানেক পর একদিন ভক্তটি মার কাছে গিয়ে দেখেন মার পায়ের সেই জায়গাটিতে তখনো যা রয়েছে। মা পা দুটি ছড়িয়ে বারান্দায় বসে ছিলেন। কী মনে হতেই ভক্তটি প্রণাম করার পর মার পাঁটি ধরে সেই ঘায়ে মুখ দিয়ে সমস্ত পুঁজ চুষে বার করে দিলেন। তার পর দিন থেকে দেখা গেল ঘাটি শুকিয়ে যাচ্ছে।

পরে একদিন ভক্তটি মাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা মা, সেদিন জ্বলন্ত কয়লাটি যখন আপনার পায়ের বসে যাচ্ছিল তখন আপনার যন্ত্রণা হচ্ছিল না?

মা উত্তর করলেন, লাগালাগি তো কিছুই বুঝতে পারিনে। এ তো খেলা ছাড়া আর কিছুই নয়। অঙ্গারটি কী করছে মহানন্দে তা দেখছিলাম। প্রথমে দেখলাম লোমগুলি পুড়ে গেল, চামড়া পুড়তে লাগল, গন্ধ বার হলো। পরে জ্বলন্ত কয়লাটি তার কাজ শেষ করে নিবে গেল। যখন ঘা হলো, তখন ঘাটি তার নিজের ভাবেই ছিল। তারপর তোর যেই ইচ্ছা হলো ঘা সেরে উঠুক, তখনই ঘা শুকোতে লাগল।

সেদিন চোখের সামনে মার পাটি আস্তে আস্তে পুড়ে যেতে দেখে যেমন সবাই আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল, আজও তেমনি মার কথা শুনে আশ্চর্য হলো সবাই। সাধারণ মানুষ কখনো নিজের দেহের কোন অংশ পুড়ে যাওয়া মহানন্দে দেখতে পারে না। একমাত্র যিনি আনন্দরূপ অমৃতের মূর্তি বিগ্রহ সেই মহানন্দময়ী মা-ই তীব্র যন্ত্রণার মধ্যেও আনন্দের অমৃত খুঁজে পেতে পারেন।

এমনি আনন্দের সঙ্গে যে কোন রোগযন্ত্রণাকেও সহ্য করতেন মা। ১৯২৯ সালে মা একবার ঢাকায় অসুস্থ হয়ে পড়েন। জ্বর, শোথ, উদরাময়, রক্তদাস্ত, রক্তপ্রস্রাব প্রভৃতি নানা রকমের উপসর্গ দেখা দেয়। সকল অঙ্গ একে একে অবশ্য হয়ে পড়ে। ধরে ধরে ওঠাতে বসাতে হয়।

একদিন ব্রহ্মচারিনী গুরুপ্রিয়া মাকে কাতরভাবে মিনতি জানালেন, মা, তোমার শরীর তো আর চালাতে পারছি না, এবার তুমি কৃপা কর।

পরদিন দেখা গেল মার শরীরের সেই অবশ্য্যাব আর নেই। তবে জ্বর রয়ে গেল। মা তখন তাঁর মাথায় প্রচুর জল ঢালবার আদেশ দিলেন। পাঁচ দিন ধরে রোজ বেলা এগারটা থেকে পাঁচটা পর্যন্ত পঞ্চাশ ঘাট বালতি করে জল ঢালা হতে লাগল। তবু জ্বর আর কমে না। মা কোন ওষুধও ব্যবহার করতে চান না। ঢাকার বিশিষ্ট কবিরাজ মাকে দেখে বললেন, আমরা মানুষের রোগের চিকিৎসা করি, আগাদের নিদান মানুষের রোগের জন্ম। কিন্তু এঁরা হচ্ছেন মহামানব, এঁদের

কথা স্বতন্ত্র। এদের রোগের চিকিৎসা করার দায়িত্ব আমাদের নেই।
 মাকে এত দীর্ঘদিন ধরে রোগে শয্যাগত দেখে ভক্তদের অনেকে ভয়
 পেয়ে গেলেন। ভাবলেন মা বুঝি এবার লীলা সংবরণ করবেন। তখন
 ভক্তেরা সকলে মিলে মার কাছে গিয়ে কান্নাকাটি শুরু করে দিলেন।
 সবাই ধরে বসলেন, আমাদের জন্ম অন্ততঃ আপনাকে সুস্থ হতেই হবে।
 পরদিন ভোরে মা বললেন, ভাতের যোগাড় কর।

ভক্তদের আনন্দ আর ধরে না। আর কোন ভাবনা নেই। মা
 এবার সেরে উঠবেন। স্বেচ্ছাময়ী, লীলাময়ী মা আবার আনন্দময়ীরূপে
 সকলকে আনন্দ বিতরণ করবেন।

মার অন্ন-পথ্যের ব্যবস্থায় অনেকে আশ্চর্যও হলেন। যিনি প্রায়
 কুড়ি দিন ধরে জ্বরে শয্যাগত হয়ে আছেন, তিনি আজ হঠাৎ নিজেই
 অন্ন-পথ্যের ব্যবস্থা করে নিলেন তাঁর রোগ না যেতেই। শুধু তাই নয়,
 তিন চার জন মিলে তাঁকে যখন পথ্য করাতে বসাল তখন তিনি
 স্বাভাবিক সুস্থ মানুষের মতো সব কিছুই খেলেন। এতে সবাই আরও
 আশ্চর্য হয়ে গেল। অবশ্য স্বেচ্ছাময়ী মার সব কথাই স্বতন্ত্র। লৌকিক
 বুদ্ধি দিয়ে সেকথা বিচার করতে যাওয়া উচিত নয়।

পরদিন হতে মা সত্যিই সুস্থ হয়ে উঠতে লাগলেন। জ্বর
 একেবারে ছেড়ে গেল ; সমস্ত উপসর্গগুলিরও উপশম ঘটল।

মা সম্পূর্ণরূপে সেরে উঠলে ভক্তেরা একদিন মাকে বললেন,
 কেন আপনি এই সব রোগে ইচ্ছা করে এতদিন ভুগলেন বলুন।

মা তখন বললেন, কোথাও আমার কোন সহজাত কর্মে এ শরীরটা
 বাধা পেয়েছিল ; তাই দেহের মধ্যে এই সব বিকারের সৃষ্টি হয়েছিল।

তখন ভক্তেরা আবার প্রশ্ন করলেন, এতদিন রোগে পড়ে থাকতে
 কোন কষ্ট হয়নি আপনার ?

মা তখন হাসিমুখে বললেন, রোগশয্যায় শুয়ে থাকার সময় সুখ
 অসুখ বা সুবিধা-অসুবিধা সম্বন্ধে কোন বোধ ছিল না আমার। আমার
 শরীরের বিকার, তাদের সকলের ছুটোছুটি, কর্মব্যস্ততা দেখে আমার

মনে হত এও যেন এক আনন্দের কীর্তন ।

মার একথা শুনে অবাক হয়ে রইলেন সকলে । আর কোন কথা যোগাল না কারো মুখে ।

যিনি মনে করেন, এই বিশ্বের সব কিছুই আনন্দরূপ ব্রহ্মের অংশ-বিশেষ, যিনি জগতের সকল বস্তু ও ঘটনার মধ্যে অফুরন্ত আনন্দের অমৃতভাণ্ড খুঁজে পান, তিনি যে সমস্ত ভেদজ্ঞানের উর্ধ্বে উঠে যাবেন সেটা খুবই স্বাভাবিক ।

আসলে আমাদের সমস্ত ভেদজ্ঞানের শুরু হচ্ছে দেহ থেকে । আমরা আমাদের দেহের কোন কোন অংশকে বা কোন কোন বিশেষ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে অঙ্গগুলি থেকে বড় বলে মনে করি এবং বাকিগুলিকে ছোট ভাবি । যেমন মাথা, বুক, ডান হাত প্রভৃতিকে আমরা দেহের উৎকৃষ্ট অংশ বলে মনে করি ; কিন্তু যার উপর ভর দিয়ে আমরা দাঁড়িয়ে থাকি ও চলাফেরা করি সেই পা দুটি আমরা ঘৃণা করি । বাঁ-হাত দিয়ে আমরা শৌচক্রিয়া করি বলে সেটিকেও নিকৃষ্ট বলে ভাবি । তেমনি সমাজের কোন কোন শ্রেণীর মানুষকে আমরা শ্রদ্ধার চোখে দেখি এবং তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর মানুষদের আমরা ঘৃণার চোখে দেখি । তারপর জীবজগতের মধ্যেও শ্রেণী ভেদ করে কোন কোন জীবকে উৎকৃষ্ট এবং কোন কোন জীবকে নিকৃষ্ট বলে থাকি ।

এই বিশ্বস্থিতিতে একটি বিরাট অংশ জুড়ে আছে জড় জগৎ । কিন্তু এই জগতের চেতনা বা বাকশক্তি নেই বলে আমরা জড়বস্তুকে তুচ্ছ জ্ঞান করি । এইভাবে দেখা যায় আমাদের ভেদজ্ঞানের অন্ত নেই ।

কিন্তু আনন্দময়ী মা হচ্ছেন সমস্ত ভেদজ্ঞানের অতীত । অদ্বৈত তত্ত্বের এমন সহজতম উপলব্ধি ছোট-বড়, ভাল-মন্দ, সব কিছুর মধ্যে ব্রহ্মস্বরূপের মহিমাকে খুঁজে পাওয়ার এমন অদ্ভুত শক্তি খুব কম সাধকের মধ্যেই দেখা যায় ।

একবার অটলবিহারী ভট্টাচার্য নামে একজন ভক্ত ঢাকার শাহবাগে এসে অসুস্থ হয়ে পড়েন । হঠাৎ তাঁর মনে হলো, তাঁদের এই মা কি

শুধু নামের মা, সত্যিকারের কাজের মা হতে পারেন না? গৃহস্থ মায়ের
মত তিনি এসে তাঁর মাথা টিপে দিতে পারেন না?

অটলবিহারীর মনের এই গোপন কথাটি অজানা রইল না মায়ের।
মা সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কাছে গিয়ে কোন কথা না বলে মাথা হতে পা পর্যন্ত
হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন। পরে তিনি সুস্থ হয়ে তাঁর কাজের
জায়গায় চলে যেতে একজন ভক্ত বললেন, অটলবিহারী যেমন তেমনি
তার বুদ্ধি। আসলে অসুখটা তার চলনা মাত্র; মাকে দিয়ে সেবা
পাওয়াই ছিল তার আসল উদ্দেশ্য।

একথা শুনে মা রেগে গিয়ে সেই ভক্তকে বললেন, তোরও পা
টিপে দেব নাকি?

ভক্তটি তখন ভয়ে সেখান থেকে ছুটে পালিয়ে যান। অনেকক্ষণ
পরে মা শান্ত হয়ে বললেন, যেমন মাথা পা ইত্যাদি নিয়েই একটি
মানুষ, তেমনি আমি দেখি তোরা সাহা আমার এ-শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ
বিশেষ। সবাই সমান, কেউ কম বেশী নয়।

দেবতা সম্পর্কেও কোন ভেদজ্ঞান ছিল না মার কাছে। নিজের
ব্যক্তিসত্তার সঙ্গে দেবতাদের একাত্ম করে দেখতেন তিনি। ঢাকার
কালীপূজার সময় তিনি প্রতিমার পাশে দাঁড়িয়ে পূজা গ্রহণ
করেছিলেন। দেবীর পাদপদ্মে নিবেদিত পুষ্পাচ্চার তিনি নিজের
হাতে নিজের মাথায় চাপিয়ে নিয়েছিলেন। আর একবার নিজের
পায়ের ফুল অথবা একটি পূজার ফুলের সাজিতে তুলে দিয়েছিলেন।

একদিন বেনারসের নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নামে একজন ভক্ত মার
পাদপদ্মে কতকগুলি ফুল উৎসর্গ করেন। সেই সময় একজন লোক
পাশ দিয়ে একটি সাজিতে করে পূজার ফুল তুলে নিয়ে যাচ্ছিল। মা
হঠাৎ নিজের পা হতে ফুলগুলি কুড়িয়ে পাশের ভদ্রলোকের সাজিতে
রাখলেন। বিস্ময়ে অবাক হয়ে গেল সকলে।

নির্মলবাবু তখন মাকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলেন।

মা তখন উত্তর করলেন, ধাঁর মাথা তাঁরই পা। মাথা আর পা কি

আলাদা। সবাই তো সকলভাবে একেরই পূজা করছে।

একদিন মা মাটির উপর ছোট বালিকার মতো বসে একটি বাঁশের কঞ্চি নিয়ে মাটিতে ঘা দিচ্ছিলেন। হঠাৎ একটি মাছির গায়ে ঘা লাগতেই মাছটি মরে গেল। মা তখন হাতের মুঠোর মধ্যে মৃত মাছটিকে ধরে রাখলেন। অনেকক্ষণ পর মাছটিকে মুঠো হতে বার করে ভক্ত জ্যোতিষচন্দ্রকে বললেন, এই যে মাছটা মরে গেছে, এর একটা সদগতি করতে পারিস কি ?

জ্যোতিষচন্দ্র তখন বললেন, শুনেছি, মানুষের দেহের মধ্যেই স্বর্গ আছে। এই বলে তিনি সঙ্গে সঙ্গে মাছটিকে মার হাত থেকে নিয়ে গিলে ফেললেন।

মা হেসে বললেন, করলি কি ? মাছি খেলে যে ভেদবমি হয়।

জ্যোতিষচন্দ্র বললেন, আপনার আদেশে আমার পেটের ভিতর গিয়ে এর যদি একটা সদগতি হয় তাহলে আমার কিছুই হবে না।

সত্যিই দেখা গেল কোন অমুখেই তাঁর করল না।

মা বললেন, পোকা, মাকড়, মাছি, কীট, পতঙ্গ, মানুষ সবাই তো একপরিবার, কার সঙ্গে কার জন্মজন্মান্তরের কিরূপ সম্বন্ধ রয়েছে কে বলবে ?

শুধু মাছি বা কীট পতঙ্গের মত নিকৃষ্ট জীব নয়, জড়জগতের সঙ্গেও একাত্মতা অনুভব করতেন মা।

অনেক সময় একদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ জল মাটি গাছপালা বা পশুপাখির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তাদের মত হয়ে উঠতেন মনে মনে। কখনো কখনো মনে হত তিনিও মাটির মত জড় পদার্থ হয়ে উঠেছেন। ঝটকা বাতাস দেখলে তাঁর শরীরটা হালকা হয়ে পাতলা কাপড়ের মত উড়ে গিয়ে বাতাসের সঙ্গে মিশে যেতে চাইত। আবার কখনো গম্ভীর শঙ্খধ্বনি কানে যেতেই কেমন যেন পাথরের মত নিখর ও নিস্তব্ধ হয়ে উঠত শরীরটা। গাছ দেখতে দেখতে তাঁর মনে হত তিনিও যেন গাছ হয়ে গেছেন।

মা বলতেন, এই জগৎ ভাবময়। এই জগতে যা-কিছু দৃষ্টবশ্ত দেখছ তা সবই ভাবের মূর্তি। ভাবের দ্বারা যদি নিজেকে জাগিয়ে তুলতে পার, তাহলে দেখবে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সর্বত্রই একই ভাবের খেলা চলছে। ভাবের অভাবেই মানুষ ইতস্ততঃ হাতড়ায়, প্রকৃত তত্ত্ব বুঝতে পারে না।

মা সবচেয়ে বেশী ভাববিহীন হয়ে পড়েন কীর্তনকালে। এই সময় তাঁর লোকোত্তর ভাববিভূতি প্রকট হয়ে পড়ত সকলের সামনে।

বাংলা ১৩৩২ সালে শাহবাগে উত্তরায়ণ সংক্রান্তি উপলক্ষে কীর্তন অনুষ্ঠিত হয়। মার আশ্রমে এটাই হলো প্রথম প্রকাশ্য কীর্তন। প্রচুর লোক সমাগম হয়েছে উঠোনে। চারিদিকে লোকে লোকারণ্য। মা যেন সেদিন বিশ্বজননীর মূর্তিতে আবির্ভূত হয়েছেন। যে দেখে সেই ভক্তিভাবে অভিভূত হয়ে পড়ে।

অবশেষে বেলা দশটার সময় কীর্তন শুরু হলো। মা তখন মেয়েদের সিঁদুর দিচ্ছিলেন। হঠাৎ কোটোটি হাত থেকে পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে মা মাটিতে টলে পড়লেন, কিছুক্ষণ মাটিতে গড়াগড়ি দেবার পর উঠে পড়লেন। তারপর পায়ের বুড়ো আঙ্গুলের উপর খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে উপরে দু'হাত তুলে ও মাথাটি একেবারে পিঠের সঙ্গে লাগিয়ে অপলক দৃষ্টিতে উপরের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

এইভাবে কিছুক্ষণ থাকার পর মা চলতে শুরু করলেন। এক অলৌকিক মহাভাবের আবেশে আত্মহারা হয়ে উঠেছেন তিনি। আলুখালু বেশ! মুক্ত কেশপাশ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। মাথা ও গা হতে কাঁপড় খসে খসে পড়ছে। কোনদিকে খেয়াল নেই। কীর্তনের সুরের সঙ্গে নৃত্যের তালে তালে মা মন্ত্র গতিতে এগিয়ে চলেছেন, অবশেষে যে-জায়গায় কীর্তন হচ্ছিল সে-জায়গায় গিয়ে আবার মাটিতে পড়ে গেলেন। তাঁর মুখ হতে 'হরে মুরারে মধুকৈটভারে গোপাল গোবিন্দ নাম মুকুন্দ সৌরে'—এই গানটি আপনা হতে বেরিয়ে এল।

তারপর মা উঠে বসতেই তাঁর দুই চোখ হতে অবিরল জলের ধারা

গড়িয়ে পড়তে লাগল। চৈতন্য মহাপ্রভুর যে যে ভাববিকার হত সেদিন মার অঙ্গেও সেই সেই ভাববিকারের লক্ষণগুলি ফুটে উঠেছিল।

একদিন মাকে একজন ভক্ত জিজ্ঞাসা করলেন, কীর্তনের সময় আপনার যখন ভাবাবেশ হয় তখন আপনার শরীরে বা চোখের সামনে কোন দেবদেবীর আবির্ভাব হয় কি ?

মা বললেন, আমার লক্ষ্য তো সেদিকে নেই। আমি তো কিছুই বুঝতে পারি না। যখন যে কোন কাজ পূর্ণভাবে প্রাণ দিয়ে করা হয় তখন সেই কাজের তন্ময়তা প্রকাশ পায়। নামে তন্ময়তা আনতে পারলেই রূপসাগরে ডুব দেওয়া যায়। নাম ও নামী অভেদ। তাই নাম করতে করতে দেখবি বাইরের জগতের সব ভাব লুপ্ত হয়। তখন নামের যে স্বপ্রকাশ শক্তি তা আপনা থেকেই ফুটে ওঠে।

পরে মা একদিন বললেন, ভগবানকে যে চায় সে পায়। তিনি কখনো ভাবে, কখনো আকারে কখনো তাঁর জন্ম ফেলা চোখের জলে তিনি ধরা দেন। সর্ব আকারে ও ভাবে তাঁরই প্রকাশ। সব কিছুতে তাঁর স্পর্শ পাবার জন্য মনটাকে উন্মুখ রাখতে হবে।

মা আরও বললেন, মানুষ অভাব রূপে প্রকাশিত বলেই সব সময় সে অভাবের চিন্তা করে। নিজের স্বরূপ বা স্বভাবের কথা ভাবে না। ভগবৎ ক্রিয়াই প্রকৃত ক্রিয়া; আর সব অক্রিয়া। ভগবানের চিন্তা করাই মানে নিজেকে স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত করা।

ভগবানকে ভালবাসতে পারলেই সব ভালবাসার সফলতা। তাঁকে জানা বা পাওয়া মানেই নিজেকে জানা বা পাওয়া। তিনি সর্বত্র আছেন। যেখান থেকে যে যেভাবে তাঁকে ডাকে সেই ভাবেই তাঁকে পায়।

একবার তীর্থভ্রমণকালে কোন এক জায়গায় একটি অপরিচিত লোক মাকে জিজ্ঞাসা করল, আপনি কোন্ জাতি? আপনার বাড়ি কোথায়?

মা হাজিউ হাদিতে জবাব দিলেন, ব্যবহারিক হিসেবে খরিতে গেলে এ-শরীর পূর্ববঙ্গের, জাতিতে ব্রাহ্মণ। কিন্তু এ-সব কৃত্রিম উপাধি। এই সব উপাধি বাদ দিয়ে দেখলে জানতে পারবে, এ-শরীর তোমাদের পরিবারভুক্ত। সর্ব ধর্মই এক। সকল ধারাই এক। আমরা সকলেই এক।

ঢাকার জৈনোদি হোসেন নামে একজন মৌলবী বড় ঈশ্বরভক্ত ছিলেন। মার দুজন ভক্ত এক বৃহস্পতিবার মৌলবীসাহেবকে সঙ্গে করে শাহবাগে নিয়ে এলেন। তাঁরা এসে দেখলেন, তখন নাট-মণ্ডপে কীর্তন আরম্ভ হয়েছে। মণ্ডপ থেকে কিছুদূরে তাঁরা একটি গাছের তলায় এমন ভাবে দাঁড়ালেন যাতে মণ্ডপ থেকে কেউ তাঁদের দেখতে না পায়।

প্রায় এক ঘণ্টা পর হঠাৎ দেখা গেল মা মন্ডুর গতিতে আপনার মনে সেইখানে এসেই উপস্থিত হলেন। এসে মৌলবীসাহেবের গা স্পর্শ করে একসঙ্গে হাঁটতে লাগলেন।

শাহবাগের এক কোণে এক ধর্মপ্রাণ মুসলমান ফকিরের কবর আছে। সেখানে অনেকে নামাজ পড়েন। মা সেইখানে গিয়ে থামলেন এবং নামাজের নিয়ম অনুযায়ী ওঠা-বসা করতে লাগলেন। নামাজের সময় যে যে মন্ত্রগুলি উচ্চারণ করা হয় সেগুলিও মা ঠিকমত বলে গেলেন। তাঁর সঙ্গে মৌলবীসাহেবও যোগ দিলেন।

কিছুক্ষণ পর তাঁরা আবার নাটমণ্ডপে ফিরে এলেন। তখনও কীর্তন চলছিল। দেখা গেল মৌলবীসাহেবও তখন কীর্তনে আপনা হতে যোগদান করলেন। সকলের সঙ্গে তিনিও হাততালি দিয়ে ঘুরতে লাগলেন।

প্রতি বৃহস্পতিবার সেই কবরে বাতাসা ভোগ দেবার ব্যবস্থা ছিল। যে লোকটির উপর এই কাজের ভার ছিল সে সেদিন আসেনি। মা তাই মৌলবীসাহেবকে সেখানে বাতাসা উৎসর্গ করতে বললেন। মৌলবীসাহেবও সঙ্গে সঙ্গে তাই করলেন। পরে তিনি সেই বাতাসা

মাকে খাওয়াতে চাইলেন।

মৌলবীসাহেব অত্যন্ত গোঁড়া মুসলমান ছিলেন। মাকে দেখবার আগে পৰ্বন্ত হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে তাঁর বিরূপতা ছিল। কিন্তু সেদিনকার সেই ঘটনার পর হতে সমস্ত ভুল ভেঙ্গে গেল এবং তার প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস ক্রমশ গভীর হয়ে উঠল।

আর একদিন একজন মুসলমান বেগম মাকে কবরে নামাজ পড়বার জন্য অনুরোধ করে বসলেন। মার নামাজ পড়া দেখে বেগম আশ্চর্য হয়ে গেলেন। বেগমটি শিক্ষিতা ছিলেন। তিনি তাঁদের ধর্মপুস্তক নিয়মিত পড়তেন। তিনি বললেন, তাঁর নামাজের পাঠগুলি শাস্ত্র অনুযায়ী নিখুঁত হচ্ছে।

মা তারপর বললেন, ওই কবরে যে ফকিরের সমাধি আছে তার সূক্ষ্ম শরীর আমি চার-পাঁচ বছর আগে মৈমনসিং বাজিতপুরে থাকাকালে দেখেছিলাম। ঢাকার শাহবাগে আসবার পরও তাঁর সঙ্গে এ-বাগানে আমার দেখা হয়েছিল। ফকিরসাহেব ছিলেন আরব দেশের লোক। তিনি খুব দীর্ঘকায় ছিলেন।

খোঁজ নিয়ে জানা গেল, মার কথাই ঠিক। মা জীবনে ফকির-সাহেবকে কখনো দেখেননি।

একবার মা বিক্রমপুরে রায়বাহাদুর যোগেশচন্দ্র ঘোষের বাড়ি গিয়েছিলেন। সেখানে হরিনাম সংকীর্তনের আয়োজন করা হয়েছিল। মার তেমনি ভাবাবেশ জাগল। কীর্তনসভা হতে প্রায় দুশো হাত দূরে একটি মুসলমান ছেলে হিন্দুদের ছেলের মতো কাপড় পরে গোপনে বসে ছিল।

হঠাৎ মা ভিড় ঠেলে ছেলেটির কাছে গিয়ে ‘আল্লা, আল্লাহু আকবর’ বলে চিৎকার করে উঠলেন। ছেলেটি মার কৃপা দেখে কেঁদে ফেলল। সেও মার সঙ্গে যোগ দিল। সে বলল, আল্লার নাম মার মুখ থেকে যেমন পরিকারভাবে শুনলাম, শত চেষ্টা করেও সেভাবে উচ্চারণ করতে পারব না।

আর-একটি বিশিষ্ট মুসলমান-পরিবারে মা হরিনাম প্রবর্তন করেছিলেন। হরিনাম করতে করতে ভাবে বিভোর হয়ে পড়তেন তাঁরা। ধর্ম সম্পর্কে সব গোঁড়ামী দূর হয়ে গিয়েছিল তাঁদের।

এ-প্রসঙ্গে মা একদিন বলেন, হিন্দু, মুসলমান ও অন্যান্য জাতি—সবাই তো এক। একজনকেই সবাই চায়। সবাই ডাকে। তাহলে নামাজ ও কীর্তনে প্রভেদ কোথায়?

এই ভাবে মা জগতের সকল ধর্মে-সকল বর্ণে ও জাতিতে, সকল আশ্রমে, সকল শিক্ষায় ও সর্বভাবে সমান শ্রদ্ধা ও অনুরাগ দেখিয়ে চলেছেন। এইভাবে মা সর্বং খন্দিদংত্রঙ্গ—

এই বিশ্বনিখিলের সব কিছুই ব্রহ্ম—এই মহাধর্ম নিজের জীবনে প্রতিটি কথায় ও কাজে প্রতিপন্ন করে চলেছেন।

সাধারণ মানবী দেহে অসাধারণ জৈবী শক্তি ধারণ করেও লীলাগয়ী মা আনন্দরূপেই যেন সব সময় সংস্থিত থাকতে ভালবাসেন। তিনি যেন সত্যিকারের সংসারী মা। মা যেমন তাঁর শিশুদের আবদার মেনে চলেন, নিজেকে তাদের মধ্যে একেবারে বিলিয়ে দেন, হাসিখুসিতে ফেটে পড়েন তাঁদের সঙ্গে, মা আনন্দগয়ী ও তাঁর অজস্র সন্তানদের সঙ্গে তেমনি ব্যবহার করেন।

ভক্তদের দিয়ে মা কত কৌতুক কত লীলা খেলা করেছেন কত সময়ে, তার আর শেষ নেই। একবার ভক্তদের ইচ্ছা হলো, মাকে বালক কৃষ্ণরূপে দেখবেন। আবার পরে কিশোর কৃষ্ণরূপও দেখবেন।

সকলে গিলে মাকে প্রথমে বালক কৃষ্ণরূপে স'জালেন পরে আবার তাঁকে কিশোর কৃষ্ণরূপে স'জানো হলো। একই মার মধ্যে কৃষ্ণের বাল্যভাব ও কিশোরভাব বড় সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছিল। সেদিন কৃষ্ণরূপী মার মুখে যে অলৌকিক অপ্রাকৃত হাসি ফুটে উঠেছিল তা কখনো কোন সাধারণ মানুষের মুখে দেখা যায় না।

মা যখন বেখানে থাকেন, তখন সেখানকার ভক্তদের আনন্দের সীমা থাকে না। তাঁদের মনে হয় তাঁরা সত্যি সত্যিই মার কোলের মধ্যে

আছে। আবার মা সেখান থেকে অন্ত্র চলে গেলে এক বিষাদঘন শূন্যতা খাঁ খাঁ করতে থাকে চারিদিক। নিরানন্দের অন্ধকার জমে ওঠে সকলের মনে।

আবার কখনো কখনো লীলাময়ী আনন্দময়ী মা রুদ্রমূর্তিও ধারণ করেন। তখন তাঁর আলুথালু তেজোময়ী মূর্তি দেখে ভীত হয়ে পড়ে ভক্তের দল। তখন তাঁর সামনে কথা বলার কারো সাহস থাকে না। এইভাবে মার সাধারণ মানব দেহের মধ্যে সাময়িক কার্যকলাপের মধ্যে বিভিন্ন দৈবভাবের বিকাশ দেখে ভক্তেরা কতবার আশ্চর্য হয়ে গেছেন।

এ-বিষয়ে মাকে একদিন প্রশ্ন করা হলে মা বলেন, সাধারণ অসাধারণ শুধু তো তাদের কাছে। আমি সকল অবস্থাতেই একভাবে আছি।

একটু চুপ করে থেকে আবার বললেন, সবই তো খেলা। তাদের খেলার সাধ আছে। তাই হাসি-তামাসাতে এই শরীরটাকে তোরা টেনে নিয়ে বাস। যদি এ-শরীর স্থির ধীর গম্ভীর হয়ে থাকত তাহলে তোরা যে দূরে দূরে থাকতিস। বেশ সুন্দর করে আনন্দের খেলা খেলতে শেখ। তাহলে খেলার ভিতর দিয়েই খেলার চরম স্বাদ পাবি।

মা সব সময় নিজেকে শরীর বলে অভিহিত করে থাকেন। কখন আমি বা আমার দেহ বলেন না। এর দ্বারা স্পর্শ বোঝা যায়, পরম বৈদান্তিকের মতো মা তার অনাত্ম মরদেহ হতে তাঁর নিত্য শুদ্ধ ও মুক্ত আত্মাকে পৃথক ভাবে দেখেন। মনে হয়, তিনি যেন সংসারের সব সূখ দুঃখ হাসিকান্নার সঙ্গেই জড়িয়ে রয়েছেন, সমস্ত জগৎটাই তাঁর সংসার, জগতের সব মানুষই তাঁর সন্তান; অথচ আসলে তিনি সব কিছু থেকে মুক্ত।

কোন এক বিশেষ জায়গার প্রতি কোন আসক্তি নেই মার। যখন যেখানেই যান সেখানেই সমান আনন্দ পান। গয়া গঙ্গা বারাণসী সব এক। এদিকে ভক্তেরা তাঁকে ছেড়ে থাকতে পারে না। আকুল হয়ে

ওঠে তাঁর বিচ্ছেদে।

মা একদিন সকলকে বুঝিয়ে বললেন, আমি দেখি সারা জগৎটাই একটা বাগান। সেই জগতজোড়া বাগানে জীবজন্তু গাছপালা পোকামাকড় নানা ভাবে খেলা করছে। আসলে সবাই এক। সকলের মধ্যেই সেই একেরই খেলা। তবু প্রত্যেকের মধ্যে আছে বিশিষ্টতা; তাই দেখে আমার আনন্দ হয়। তোরা সবাই মিলে সেই বাগানের ঐশ্বর্য বাড়িয়ে দিয়েছিস। আমি এখান-সেখান যাই তার মানে কি? তার মানে সেই বাগানেরই এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাই। এতে তোরা এত আকুল হস কেন?

একবার ভক্তেরা মাকে অনুরোধ করে বললেন, শাহবাগে একটি আশ্রম স্থাপন করতে হবে। মা তখন বললেন, জগৎভরাই তো আশ্রম। আবার নতুন করে আশ্রম করে কী হবে? তবু কিন্তু ভক্তেরা ছাড়লেন না মাকে। তাঁরা একটি স্থায়ী স্থান চান যেখানে মার চরণতলে সকলে হরিনাম সংকীর্তনে মিলিত হতে পারবেন।

অবশেষে মা মত দিলেন। তারপর মা হাসতে হাসতে বললেন, যদি এ-রকম কিছু করিস তো তবে ওই যে একখানি ভাঙা বাড়ি দেখছিস, ওইটাই উপযুক্ত জায়গা। ওটাই তোদের পুরোন বাড়ি।

এই বলে চুপ করে গেলেন। ভক্তেরাও মাকে আর কোন প্রশ্ন না করে তাঁর আদেশ মেনে নিলেন। সকলে সেই বাড়িখানি এবং তৎসংলগ্ন জায়গাটি উদ্ধারের চেষ্টা করতে লাগলেন।

দেখা গেল, বাড়িখানি একেবারে ভেঙ্গে গেছে। চারিদিক ইট পাথর আর জঙ্গলে ভরা। মাঝখানে একটি শিবমন্দির। সেখানে নানারকমের সাপ দেখা যেত।

অবশেষে বহু ভক্তের আন্ত চেষ্টায় জমির মালিকের কাছে জায়গাটি বন্দোবস্ত নিয়ে সেখানে আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হলো। এইটিকেই বলা হয় রমনার আশ্রম।

আশ্রম প্রতিষ্ঠার পরেও সেখানে সাপ দেখা যেত। মাকে একথা

জানানো হলো। মা তখন কোন কোন সোমবার সেই ভাঙা শিবমন্দিরে দুধ কলা রাখার ব্যবস্থা করলেন।

এক সোমবার সেখানে পাঁচ-সাতটি কলা ও কিছু দুধ একটি হাঁড়িতে করে রেখে দিলেন। সাতদিন পর রাত্রি প্রায় দশটার সময় মা নিজে গিয়ে দেখলেন, দুধ কলা তেমনি আছে। সাপ তো দূরের কথা একটি পিপড়েও তা স্পর্শ করেনি।

মা বললেন, আমি ওই দুধ খাব।

ভক্তদের অনেকে আপত্তি করতে লাগলেন। কারণ ওতে কোন সাপের বিষ গুলে যেতে পারে। মা কিন্তু কারো কথা শুনলেন না। মাত্র এক চুমুক খেয়ে দুধটি রেখে দিলেন। তখন উপস্থিত সকলে তার থেকে কিছু প্রসাদ নিল। বাকি দুধ সেখানে সেই হাঁড়িতেই রয়ে গেল।

পরদিন সকালে গিয়ে দেখা গেল এক ফোঁটা দুধও আর হাঁড়িতে পড়ে নেই। কে যেন সমস্ত দুধটুকু চেটে খেয়ে গেছে।

এই ঘটনায় ভক্তেরা আশ্চর্য হয়ে গেলেন। এতে বোঝা গেল, শাহবাগের আশেপাশের প্রাণীজগতের উপরেও মার অলৌকিক প্রভাব ছিল। তারাও মার অকৃত্রিম মমতা ও কৃপার প্রার্থী। তাই তারাও তাঁর প্রসাদের জন্য ব্যগ্র।

মা বলেছিলেন, আশ্রম মানেই হলো শুদ্ধ পবিত্র স্থান। সেখানে আসা মাত্রই জীবের ধর্মভাবের উদয় হয়। সকলেই চেষ্টা করবে যেন দিনরাত্রি এই আশ্রমের বায়ুমণ্ডল সাধন ভজন সংচিন্তা ও সমালোচনার দ্বারা বিশুদ্ধ থাকে।

মা জন্মান্তরে বিশ্বাস করতেন। একদিন জন্মান্তর বিষয়ে কথা হচ্ছিল। সকলেই জন্মান্তরের প্রকৃত তাৎপর্য কী তা মার কাছ থেকে জানতে চাইলেন।

মা বললেন, জন্মান্তর সত্য বই কি! চোখের উপর ছানি পড়লে মানুষের দৃষ্টিশক্তি আচ্ছন্ন হয়ে যায়। তাই ছানি কেটে দিলে আবার

সে দৃষ্টি ফিরে পায়। ভেগনি অবিচার দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে আছে আমাদের দৃষ্টি। ধ্যানযোগে বিশুদ্ধ জ্ঞান ও বুদ্ধির আলোকে দেখতে পারলে মন্ত্র ও দেবত্বের বিকাশ ঘটে। তখন পূর্বজন্মের সংস্কার চিন্তে ভেসে ওঠে।

মা আরও বললেন, তোদের দেখলে কখনো কখনো তোদের জন্ম-জন্মান্তরের ছবি আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

একবার মা কলকাতা গেলে একদিন একজন ভদ্রলোক তাঁর স্ত্রী আর তাঁদের সাত-আট বছরের একটি ছেলেকে নিয়ে মাকে দেখতে আসেন।

মা ছেলেটিকে দেখেই বললেন, ছেলেটি পূর্বজন্মে তাঁর ভাই ছিল। মার এক ভাই ছেলেবেলায় মারা যায়। মৃত্যুর আগে তার একটি হাত চোট লেগে বেঁকে যায়। দেখা গেল ছেলেটির একটি হাত ও বাঁকা।

উপনিষদের ঋষি বলেছেন, যন্তে রূপং কল্যাণতম তৎ তে পশ্যামি।

এইভাবে ঋষিরা নির্বিশেষ নিরাকার ব্রহ্মকে বিশেষরূপে দেখতে চেয়েছিলেন। দেখতে চেয়েছিলেন তাঁর কল্যাণতম রূপ।

আনন্দময়ী মাকে দেখলে মনে হয়, নির্বিশেষ নিরাকার ব্রহ্মস্বরূপ অজস্র জীবের কল্যাণের জন্য তাঁর মমতাময়ী মূর্তির রূপ পরিগ্রহ করেছেন। তা যদি না হবে কেন তবে যে কোন আর্ত অসহায় জীবের জন্ম এত তাঁর ব্যথা, এত অপরিসীম ব্যকুলতা। যে যেখান থেকেই আসুক না কেন, তিনি প্রত্যাখ্যান করতে পারেন না কারো কোন কাতর মিনতি।

একবার পক্ষাঘাতগ্রস্ত একটি বারো বছরের মেয়েকে সঙ্গে করে তার বাবা-মা মার কাছে এলেন। তাঁরা কিছুতেই ছাড়বে না। মেয়েটার একটা গতি করে দিতেই হবে।

মা তখন বসে বসে স্থপুরি কাটছিলেন। মা কতকগুলি স্থপুরির টুকরো মেয়েটির দিকে ছুড়ে দিয়ে, বললেন, এই নে ধর।

মেয়েটি অতি কষ্টে হাত বাড়িয়ে তা ধরল। পরে তারা বিদায়

নিল। মা তাঁদের আশ্বাস দিলেন।

সেইদিন বাড়ি গিয়ে বিকাল বেলায় মেয়েটি শুয়ে ছিল। হঠাৎ রাস্তায় একটি গাড়ির শব্দ শুনে মেয়েটি বিছানা থেকে লাফ দিয়ে উঠে গাড়ি দেখতে বেরিয়ে এল। যে একেবারে নড়তে পারত না, তার এইরকম আকস্মিক পরিবর্তন দেখে বাড়ির সকলে আশ্চর্য হয়ে গেল। সেই থেকে মেয়েটি ধীরে ধীরে ভাল হয়ে উঠতে লাগল।

অনেক সময় রোগীর অসুখ নিজের দেহে টেনে নিয়ে রোগীকে সুস্থ করে দিয়েছেন মা। একবার ভক্ত জ্যোতিষচন্দ্রের ছেলে দশ-বারো দিন যাবৎ কঠিন রক্তআমাশায় ভুগছিল। এক রাত্রি মা তাকে দেখতে এলেন। সেই দিন থেকেই তার আমাশয় ভাল হয়ে গেল।

পরদিন মা বারো ঘণ্টা রক্ত আমাশয়ে ভুগলেন।

একদিন মা ঢাকার মাঠে বেড়াতে বেড়াতে বললেন, রাস্তা দিয়ে যে-গাড়িখানা যাচ্ছে ওটাকে ডাক।

গাড়িখানি এলে মা তাতে উঠে বসলেন। গাড়োয়ান জিজ্ঞাসা করল, কোথায় যাবেন?

মা হেসে বললেন, তোমার বাড়ি।

গাড়োয়ানটি জাতিতে মুসলমান। সে প্রথমে মার কথার অর্থ বুঝতে পারল না। কিন্তু আর কোন কথা না বলে সে মাকে তার বাড়ি নিয়ে গেল।

তার বাড়ি গিয়ে দেখা গেল, সেখানে একটি বৃদ্ধ রোগী মরণাপন্ন অবস্থায় পড়ে রয়েছে। আর আত্মীয়-স্বজনেরা কান্নাকাটি করছে। সকলে রোগীর আশা ছেড়ে দিয়েছে।

মা গাড়ি থেকে নেমেই একজন ভক্তকে বললেন, কিছু মিষ্টি নিয়ে আয়।

মিষ্টি আনা হলে তিনি নিজের হাতে উপস্থিত সকলকে মিষ্টি বিতরণ করে চলে এলেন সেখান থেকে। পরে জানা গেল, সেইদিনই রোগীটি সেরে উঠেছে।

অনেক সময় মার কাছে কত কঠিন জ্বর ও পেটের অসুখের রোগী এসেছে। দীর্ঘদিন ডাক্তারী চিকিৎসা করিয়েও তাদের রোগ সারেনি। মা তাদের তাঁর জন্য তৈরি ভাত ডাল তরকারি খেতে বলেছেন। তাই খেয়েই রোগীর সব সেরে গেছে।

আবার অনেক সময় দেখা গেছে যাদের রোগ সারবার নয়, বিধিনির্দিষ্ট মৃত্যুর দিন এসেছে যাদের ঘনিষে, তারা মার আদেশ ভাগ্যচক্রে ঠিকমত পালন করতে পারেনি। প্রারব্ধকে সবাই খণ্ডন করতে পারে না।

মা বলতেন, অনেক সময় কার কী হবে তা আমি দেখতে পাই; কিন্তু সেকথা মুখে প্রকাশ করা যায় না।

এইভাবে প্রতিদিন চাকুরি, ব্যবসা, মেয়ের বিয়ে পুত্রলাভ ও ব্যথিমুক্তির এবং পরীক্ষা পাশের জন্ম কতজন যে মার কাছে এসে ভিড় জমায় তার ইয়ত্তা নেই। মা কিন্তু কারো প্রতি কখনো বিরক্ত হন না। হাসিমুখে গিষ্টি কথায় সকলকে তুষ্ট করেন। তাঁর অপরিসীম ধৈর্য ও অসাধারণ মানবপ্রীতি দেখে আশ্চর্য হয়ে যায় ভক্তের দল।

সত্যিই তিনি বিশ্বজননী। তিনি শুধু তাঁর ভক্ত সন্তানদের মা নন। তিনি একাধারে সকল জীবের মা। এ-ক্ষেত্রে কোন ভেদজ্ঞান নেই তাঁর। তাঁর বিশ্বব্যাপী অপার স্নেহ-মমতার মধ্যে নেই কোন তারতম্য। সারা বিশ্বের সকল আর্ত অসহায় জীবের জন্মই তাঁর প্রাণ কাঁদে। বলির জন্ম উৎসর্গীকৃত অসহায় ছাগশিশুকে কোলে তুলে নিয়ে তার মৃত্যুঘন্ত্রণাকে আপন সন্তার মধ্যে নিঃশেষে শোষণ করে নেন, নিজের হাতে বলি-হীন শক্তি-পূজা করে মানুষকে অহিংসার পথ দেখান, হিংস্র সাপকে ভালবেসে দুধ-কলা খাইয়ে তার হিংস্রতাকে ভুলিয়ে দেন, অপরিচিত গরিব মুসলমান বাড়িতে যেচে গিয়ে মুমূর্ষর জীবন দান করেন।

শুধুমাত্র তাঁর পরিচিত বা শরণার্থীরাই তাঁর কৃপা লাভ করে ধন্য হয় তা নয়। অনেক সময় দেখা গেছে সম্পূর্ণ অপরিচিত কোন ব্যক্তির

অস্থখের খবর পাবার সঙ্গে সঙ্গে চঞ্চল হয়ে উঠেছে মার মন। আবার এমনও অনেক সময় দেখা গেছে, কোন খবর না পেয়েও তাঁর মনে আপনা হতে কোন অজ্ঞাত অস্থখের কথা এসে পড়েছে আর সঙ্গে সঙ্গে তার জ্ঞান ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। কারো বিপদ বা অস্থখের কথা একবার মনে মনে বা চোখে দেখলেই তার একটা স্বেচ্ছা হয়ে যেত।

অনেকে আবার রোগশয্যায় স্বপ্নে মার দর্শন ও আশির্বাদ পেয়ে ধৃত হয়েছে।

মায়ের দেবোপম মহিমার কথা যতই দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে পড়তে থাকে, ততই দর্শনাধী ও স্মরণাধীরা ভিড় বাড়তে থাকে। বিভিন্ন জায়গায় ভক্তদের চেঁচায় ও আকুলতায় বাংলার বাইরেও বিভিন্ন জায়গায় আশ্রম গড়ে উঠতে থাকে। বিদ্বাচলে অষ্টভুজা পাহাড়ের উপর মায়ের একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। স্বামী অখণ্ডানন্দ ও তুরীয়ানন্দ এই আশ্রমের প্রতিষ্ঠা করেন। সেখানে সম্প্রতি অখণ্ড অগ্নিরক্ষার জ্ঞান বস্তুকুণ্ডের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বারানসীর ভাদাইনীতে প্রতিষ্ঠিত হয় শ্রীশ্রীআনন্দময়ী সঙ্ঘ।

কেউ বলে, মা, একবার মুখ তুলে চাও মা।

কেউ বলে, তোমার ওই রাঙা চরণে একটুখানি ঠাঁই দাও মা।

তারপর সবাই বলে, না, দীক্ষা দাও আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চল।

কোন সাধক হয়ত মার কাছ থেকে উচ্চতর অধ্যাত্মসাধনা শিখবার জ্ঞান বলে, তোমার গাঁটরি খোল মা।

মা কিন্তু আনুষ্ঠানিকভাবে কাউকে দীক্ষা দিতে চান না।

ঈক্ষু ধাতুর উত্তর অন প্রত্যয় করে হয়েছে ইক্ষণ। ঈক্ষণ মানে দেখা, দীক্ষা মানে সদগুরু দ্বারা শিষ্যের প্রতি তত্ত্বজ্ঞান বা মুক্তিলাভের জ্ঞান মল্লোপদেশে, শিক্ষা বা শক্তিসঞ্চারণ তত্ত্বসারে উল্লেখ আছে, মহাদেব

পার্বতীকে বলেছিলেন, অদীক্ষিত ব্যক্তির সাধনা সফল হয় না। তার জপ-তপ পূজা-অর্চনা পাষণে রোপিত বীজের মত নিষ্ফল হয়।

দীক্ষা মানেই কানে কানে মন্ত্রদীক্ষা নয়। মন্ত্রদীক্ষা ছাড়াও তিন রকমের দীক্ষা হতে পারে। যেমন, স্পর্শদীক্ষা, দৃষ্টিদীক্ষা ও স্বপ্নদীক্ষা।

দেওঘরে একজন উকিল বালানন্দ ব্রহ্মচারীর শিষ্য। তিনি ১৯৫৫ সনে মাকে দেখবার জন্য আগরপাড়ার আশ্রমে আসেন। সঙ্গে ছিলেন তাঁর স্ত্রী। মা তাঁদের দুজনকেই মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করেন। সঙ্গে সঙ্গে সেই উকিল ভদ্রলোকের অন্তরে ভাবান্তর হয়। সেই থেকে মার প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ভক্তি অটল হতে থাকে। তিনি পরে এঁরই একজন ভক্তে পরিণত হন।

মা একবার ভক্তদের বলেন, ভগবানের কৃপা তো সকলের উপর সমানভাবে রয়েছে। যখন কারো তা ঠিকমত উপলব্ধি করার সময় বা যোগ্যতা আসে তখনই সে তা বুঝতে পারে।

একবার মাকে জিজ্ঞাসা করা হলো, যিনি ভগবানকে দেখেছেন তিনি অপরকে দেখতে পারেন কিনা।

মা তার উত্তরে বলেন, যার দেখবার সময় হয় সেই দেখতে পায়। তবে যে তাঁকে দর্শন করেছে, সেই প্রথম পথ দেখাবার উপলক্ষ্য হতে পারে।

একবার হরিদ্বারে এক ব্রাহ্মণ মার স্মরণাপন্ন হন। তিনি জীবনে বহু জপ-তপ ও সাধনা করেছেন। কিন্তু মোক্ষলাভ হয়নি। তাই তিনি প্রাণত্যাগ করতে চান।

মা গম্ভীরভাবে বললেন, যদি কোন মানুষ কোন পবিত্র জায়গায় সৎভাবে ও সৎসঙ্গে থেকে নির্ভার সঙ্গে সাধনা করে গিয়েও তার ফল না পায়, তাহলে বুঝতে হবে, তার উদ্দেশ্যের মধ্যে একাগ্রতা বা পবিত্রতা নেই। মনে রাখতে হবে সৎপরিবেশ ও সৎসঙ্গের একটা প্রভাব আছে। তবে অবশ্য প্রারন্ধ-কর্মের প্রতিফল ভোগ করতেই হবে।

কলিযুগে সাধারণভাবে পাপ অনেক বেড়ে গেছে। পাপ তিন

রকমের—কায়িক, মানসিক ও বাচিক। কলিযুগে পাপের পরিমাণ বেড়ে যাওয়ায় মানসিক ও বাচিক পাপকে পাপ বলে ধরাই হয় না। কেবলমাত্র কায়িক পাপ অর্থাৎ দৈহিক কর্মের মধ্য দিয়ে যে পাপ করে তারই জন্ম তাকে শাস্তি পেতে হয়।

অবশেষে মা ব্রাহ্মণটিকে আশ্বাস দিয়ে বললেন, তবে আশা ছাড়লে চলবে না। সংকল্পে অটল থেকে সাধনা করে যেতে হবে। সিদ্ধির দিকে তাকালে চলবে না।

মার উপদেশবানী শুনে ব্রাহ্মণটি প্রচুর আত্মশক্তি লাভ করেছিলেন।

মাকে একদিন প্রশ্ন করা হয়, কেউ যদি নাস্তিক হয় এবং নাস্তিকতার মধ্যেও সে যদি নীতিবোধ মেনে চলে তাহলে তার নীতি কি আস্তিক ভক্তদের চেয়ে নীচস্তরের।

মা উত্তর করলেন, নৈতিক জীবন চিত্তশুদ্ধির জন্ম। ভগবানে বিশ্বাস না করেও একটা কোন উচ্চ শক্তি বা আদর্শকে বিশ্বাস করে গেলে কাজ হয়। তবে নৈতিক জীবন ক্রমশ মানুষকে ভগবৎ বিশ্বাসের দিকেই নিয়ে যায়।

আর একদিন মাকে বলা হয়, বিজ্ঞানের যুগে ঈশ্বরে বিশ্বাস করা কঠিন।

মা বললেন, বিজ্ঞানের মধ্য দিয়েই জ্ঞানের বুদ্ধি প্রকাশ পাবে। তাতে পরম সত্যের জিজ্ঞাসা জাগবে। দেবদেবী ও ভগবান বাদ দিয়ে যে সত্যতা তা একদেশীয় আংশিক, সমগ্র দৃষ্টি নয়। পূর্ণ-দৃষ্টি হলো বিজ্ঞানের দৃষ্টির সঙ্গে ঈশ্বর বিশ্বাসের দৃষ্টিকে যুক্ত করে দেখা।

১৯৬১ সালের ১লা এপ্রিল মা যখন পূজায় ছিলেন তখন একদিন একজন জার্মান মহিলা ও একজন সুইস বালিকা মাকে দর্শন করতে আসে! মার কাছে তখন রাজপুতানার মহারানী বসে ছিলেন।

কিছুক্ষণ বসে থাকার পর জার্মান মহিলাটি মাকে প্রশ্ন করল, মনের কি কোন সীমা আছে? যদি তা থাকে তবে কোথায় সে সীমা?

বিদেশীদের কথাগুলি সাধারণতঃ মাকে অনুবাদ করে শোনান হয়। অনেক সময় অনুবাদ করবার আগেই মা তাঁর অলৌকিক শক্তিবলে সঠিক উত্তর দিয়ে দেন। মা যখন ঢাকার শাহবাগে ছিলেন তখন একদিন এক ইতালীয় অধ্যাপক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আশ্রমে মাকে দর্শন করতে এসেছিলেন। তিনি এসে ইংরেজীতে একটি বিষয়ে প্রশ্ন করেন। কিন্তু মাকে তা অনুবাদ করে দেওয়ার আগেই মা সংস্কৃত ভাষায় প্রশ্নটির সঠিক উত্তর দিয়েছিলেন। অথচ মা শৈশবে অতি অল্প লেখাপড়া শিখেছিলেন।

সেদিন জার্মান মহিলার প্রশ্নের উত্তরে মা বললেন, মনের সীমা হচ্ছে আত্মার সন্ধান। এই মন যখন আত্মার বাইরে থাকে, তখন এখানে-সেখানে তা ঘুরে বেড়ায়। তাই মনকে ভিতরের দিকে ঘুরিয়ে আত্মার অনুসন্ধানে নিযুক্ত করতে হয়। আত্মাকে জানতে পারলেই মনের কাজ যাবে ফুরিয়ে।

এর পর সুইজারল্যান্ডের বালিকাটি মাকে প্রশ্ন করলেন, কেমন করে ধ্যানের মধ্যে মনকে নিবিষ্ট করতে হয়? ধ্যান করবার সময় মন কি কোন বিষয়বস্তুকে অবলম্বন করে থাকবে, না শূন্য থাকবে?

একথা শুনে রাজপুতনার মহারানীর মুখখানি খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তিনিও এ-প্রশ্নটি মাকে অনেকদিন থেকেই করবেন ভাবছিলেন। কিন্তু এতদিন করা হয়ে ওঠেনি। আজ তাঁর সেই প্রশ্নটি শুনে আরও বেশি খুশি হলেন।

মা উত্তর করলেন, দুভাবেই করা যায়। যারা কোন দেবদেবীর ভক্ত তারা কোন-না-কোন দেবতার মূর্তি কল্পনা করতে পারে ধ্যানের সময়। আবার মনকে শূন্য রেখেও কিংবা চুপচাপ থেকেও দেখা যেতে পারে। তবে এটা খুবই কঠিন কাজ। তাই এ-অবস্থার মানুষ অন্তর্নিহিত জ্যোতির ধ্যান করতে পারে। এই জ্যোতিতে অন্তরের মধ্যেই বাইরের যে কোন বস্তুকে দেখা যেতে পারে।

একদিন একজন ভক্ত তাঁর শরীর রক্ষা সম্বন্ধে মার কাছ থেকে কিছু

উপদেশ চায়। মা তখন বলেন, শরীরটাকে কর্মক্ষম রাখবার জন্ম যা কিছু করার দরকার অবশ্যই তা করবে, তবে মনকে নিবিষ্ট রাখবে একমাত্র ঈশ্বরচিন্তায়।

মনে রাখবে, এই ক্ষণভঙ্গুর অহং বা আমিত্বকে সেই নিত্য মহান আমিত্বে অর্পণ করার মধ্যেই আছে প্রকৃত কল্যাণ। একেই বলে পরমার্থ। এই পরমার্থ চিন্তায় মনকে স্থির রাখবার জন্ম সৎ কাজ, সৎ গ্রন্থপাঠ, সৎ সঙ্গ প্রভৃতির একান্ত প্রয়োজন। মনে রেখো, তুমিও যা আমিও তা। তিনি আছেন বলেই তো তুমি আমি সব।

একবার চট্টগ্রাম থেকে মা স্টীমারে কক্স বাজারে যাচ্ছিলেন। সঙ্গে ছিলেন পিতাজী ও ভক্ত জ্যোতিষচন্দ্র। স্টীমার নদী ছাড়িয়ে সমুদ্রের মুখে পড়তেই খুব ঝড় উঠল। জাহাজ ভয়ানক ভাবে ঢুলতে লাগল। বড় বড় ঢেউ জাহাজের উপর দিয়ে বয়ে যেতে লাগল। যাত্রীরা ভয়ে কান্নাকাটি শুরু করে দিয়েছে। এদিকে মা আনন্দে উল্লসিত হয়ে উঠলেন। উত্তাল সমুদ্রের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, দেখ, কেমন অবিরাম কীর্তন চলেছে। ভক্তি ও সাধনার দ্বারা যদি মানুষ উন্নত হতে চায় তবে এমনি করে অখণ্ডভাবে শ্রবণ, স্মরণ ও কীর্তন করতে হবে।

সরল প্রাণে সরলভাবে তাঁকে ডাকলে তিনি বাস্তবতার প্রার্থনা পূরণ করেন। মনে-প্রাণে খুব আকুতি থাকা চাই।

জীবন ও জগত, সমস্ত আবেগ অনুভূতি প্রভৃতি সবকিছুর মধ্যে ভগবানের অস্তিত্বকে অনুভব করতে হবে। তাঁর কল্যাণের স্পর্শ পাবার চেষ্টা করতে হবে। মানুষ যখন সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে আকুলভাবে কোন কিছু চায় সেই চাওয়ার মূলে আছেন ঈশ্বর।

মা বলেন, চাওয়া রূপে যদি প্রকট হন তবে পাওয়ারূপেও প্রকট হবেনই। চাওয়ার তীব্রতা থাকা চাই। ফাঁক থাকলে চলবে না। তুমি নিজে স্বয়ং-প্রকাশ আত্মা। চাওয়া পাওয়া তোমার মধ্যেই আছে।

সব সাধকেরই গুরু থাকে। গুরুনির্দিষ্ট পথে সাধনা করেই সব

সাধক সিদ্ধিলাভ করে থাকেন। কিন্তু মার গুরুকরণ হয়নি। তাঁর অধ্যাত্মসাধনার বিকাশ স্বতঃস্ফূর্ত এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ। এই সাধনার বিকাশের জন্য বাইরের কোন সাহায্যের দরকার হয়নি। ঈশ্বরভক্তি যেন তাঁর অন্তরের একটি সহজাত বৃত্তি।

মার দীক্ষা ও গুরুকরণ সম্বন্ধে একদিন প্রশ্ন করা হলে মা বললেন, শৈশবে বাবা-মা, সংসার জীবনে স্বামী এবং সকল অবস্থায় জগৎ পিতাই আমার গুরু।

লৌকিক জীবনে যেমন মা কন্যারূপে, স্ত্রীরূপে, মাতৃরূপে আদর্শস্থাপন করেছেন, ভারতের অধ্যাত্মজগতেও তেমনি সাধনার বিচিত্র পথ ও পদ্ধতিতে সিদ্ধিলাভ করে মা এক পরম বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছেন। তাঁর লৌকিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের সব কিছুই বিস্ময়কর। সাধারণ কার্যকারণ নিয়মের সূত্রে দিয়ে তা বিশ্লেষণ করা যায় না।

কেউ কেউ বলেন, মা সাক্ষাৎ ভগবতীর অবতার। ভক্তির উচ্ছ্বাসজনিত অতুষ্টি বলে একথাকে উড়িয়ে দিতে পারা যায় না। দেবী ভগবতীর অবতারের মধ্যেও আমরা পাই ত্রিবিধ জীবনের বিকাশ। গিরিরাজ কন্যা উমারূপে, হর বা ভোলানাথপত্নী পার্বতীরূপে এবং মূর্তিমতী আত্মশক্তি জগজ্জননীরূপে তিনি আবির্ভূত। মা আনন্দময়ীও এই তিনটি জীবনের প্রত্যেকটি স্তরে এক আশ্চর্য সার্থকতা ও পরিপূর্ণতার পরিচয় দেন। আদর্শ কন্যারূপে তিনি বাবা-মার কখনো অবাধ্য হননি। তাঁর শান্তশিষ্ট মধুর স্বভাবের জন্য ছেলেবেলায় সবাই তাঁকে ভালবাসত। স্ত্রীরূপেও তিনি আদর্শ। অনন্তশক্তির অধিকারিণী হয়েও তিনি স্বামীর প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা প্রকাশে কোনদিন ত্রুটি করেননি। তারপর জগজ্জননীরূপে অখিল বিশ্বের প্রতিটি জীবের প্রতি এক সর্বব্যাপী স্বতঃস্ফূর্ত মমতা ও করুণার জীবন্ত প্রতিমূর্তিরূপে ঘটে তাঁর পরম প্রকাশ।

ধর্মজীবনেও তাঁর সাধনার বিকাশ ঘটে বিচিত্র পথে। কখনো তিনি দ্বৈত, কখনো অদ্বৈত আকার, কখনো দ্বৈতাদ্বৈত মতের উপাসিকা।

কখনো তিনি বৈষ্ণব, কখনো শাক্ত, আবার কখনো বৈদান্তিক। কীর্তনের সময় তাঁর দিব্যোন্মাদ অবস্থা এবং অষ্টসাত্ত্বিক ভাববিকারের লক্ষণ দেখে পরিষ্কার বোঝা যায় তিনি বৈষ্ণবীয় রাগানুরাগ ভক্তিসাধনায় চরম সিদ্ধিলাভ করেছেন। শাহবাগের কালীপূজার সময় তাঁর ভক্তিনিষ্ঠা এবং অলৌকিক ভাবের বিকাশ দেখে মনে হত তিনি শুধু শক্তিমতের সার্থক উপাসিকা নন, তিনি নিজেই যেন তন্ত্রের শক্তি। আবার একদিকে তিনি পরম বৈদান্তিক। মর্ত চরাচরে সর্বভূতে সর্ব জীবে আনন্দময় ব্রহ্মস্বরূপের এমন অখণ্ড উপলব্ধি এবং সেই উপলব্ধির সহজ সরল প্রকাশ খুব কম বেদান্তসাধকের মধ্যেই পাওয়া যায়। বেদান্তের বিশিষ্ট অদ্বৈতমতটিকে জীবনের প্রতি পদে প্রতি মুহূর্তে মূর্ত করে চলেছেন যেন মা।

যিনি চাওয়া ও পাওয়ার মধ্যে কোন ভেদ দেখেন না, জীব ও জড়ের মধ্যে কোন পার্থক্য দেখেন না, ভাল ও মন্দের মধ্যে আনন্দরূপ একই অমৃতের কোন তারতম্য খুঁজে পান না, তাঁর মতো পরম বৈদান্তিক ক'জন আছেন?

কথিত আছে, বৈদান্তিক জ্ঞানমার্গের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করতে হলে আগে সাধন চতুষ্টয়ের অনুসরণ করতে হবে। বেদান্তের এই সাধন চতুষ্টয়ের প্রথম সাধন হলো, নিত্যানিত্য বস্তুবিবেক অর্থাৎ ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা এইরূপ জ্ঞান। দ্বিতীয় সাধন হলো, ইহামুত্রফল-ভোগবিরাগ অর্থাৎ ইহলোক ও পরলোকের সমস্ত সুখভোগকে তুচ্ছজ্ঞান করা। তৃতীয় সাধন হলো, সাধন শম, জম, উপরতি, তিতিক্ষা, শ্রদ্ধা ও সমাধান—এই ষটসম্পত্তির সাধনা। চতুর্থ সাধন হলো, মুমুক্শুতা অর্থাৎ অহংকার হতে দেহ পর্যন্ত শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, চিত্ত প্রভৃতি অবিছাজনিত সব বন্ধন ত্যাগ করার ইচ্ছা।

বেদান্তের এই সাধনচতুষ্টয় মার স্বভাবজাত। তা আলাদা করে শিখতে হয়নি, দৈনন্দিন জীবনের কথায় ও কাজে তার নিরন্তর পরিচয় দিয়ে চলেছেন।

বৈদিক যোগক্রিয়ারও সার্থক স্বচ্ছন্দ বিকাশ দেখা যায় মার জীবনে। তাই একদিক দিয়ে তিনি পরম যোগিনী। অষ্টাঙ্গ যোগসাধনার অষ্টসিদ্ধি তাঁর করতলগত। কিন্তু তাঁর অলৌকিক যোগবিভূতি প্রদর্শনে মা চির পরাঙ্গুখ। একমাত্র জীবকল্যাণ ছাড়া অন্য কোন কারণে কোন বিভূতিই তিনি দেখান না।

সমাধি বা মহাভাবের পর মা যখন শান্তভাবে ফিরে আসতেন তখন নানারকমের যোগক্রিয়া আপনা হতেই প্রকাশ পেত তাঁর মধ্যে। তাঁর দেহ থেকে এক অস্পষ্ট ধ্বনির গুঞ্জন শোনা যেত। পরে বেদমন্ত্ৰের মতো অনেক সংস্কৃত স্তোত্র তাঁর মুখ থেকে আপনা আপনি বেরিয়ে আসত। এই সব স্বতোৎসারিত সূক্তের অর্থ বড় বড় পণ্ডিতরাও বুঝতে পারতেন না।

একবার এমনি একটি স্তোত্র তাঁর মুখ হতে বেরিয়ে আসে। তাতে লং, যং, বং, তং, অং প্রভৃতি প্রচলিত চৌদ্দটি বীজই এক অপূর্ব অর্থ সমন্বয়ে প্রকাশিত হয়।

এই সব সূক্ত সম্বন্ধে কথা উঠতে মা একদিন বললেন যে, ভাবাবিষ্ট অবস্থায় এই সব ধ্বনি সমন্বিত শব্দ আপনা হতেই তাঁর মুখ থেকে বেরিয়ে আসে।

মা বললেন, শব্দই ব্রহ্ম; শব্দই জগতের আদি কারণ। নিত্য শব্দ বা সদ্বাণীর ক্রমবিকাশ বা বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে জাগতিক সৃষ্টিরও বিবর্তন বা বিকাশ সমান ধারায় চলেছে।

আসন, প্রাণায়াম, ধ্যান, ধারণা প্রভৃতি যোগ পদ্ধতিগুলি আপনা আপনিই দেখা দিত মার মধ্যে। দেহতত্ত্ব সম্বন্ধে আপনা-আপনি এক নিখুঁত জ্ঞান জন্মে তাঁর মধ্যে।

একদিন ভক্ত জ্যোতিষচন্দ্র ও নিরঞ্জন শাহবাগে মার কাছে গিয়ে দেখেন, মা ও পিতাজী বসে রয়েছেন। মার সামনে মাটির উপর কতকগুলি রেখাচিত্র আঁকা রয়েছে। পিতাজী বললেন, তোমাদের মা আজ ষট্ চক্র এঁকেছেন।

মা বললেন, আজ দুপুরবেলা হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ এখানে এসে সামনে বসে গেলাম। ব্রহ্মতালু হতে নাক বরাবর মেরুদণ্ডের শেষ পর্যন্ত নিজের হাতের আঙুল দিয়ে মাপতে লাগলাম, মূলাধার হতে উর্ধ্বদিকে সূক্ষ্ম হতে সূক্ষ্মতর অনেকগুলি গ্রন্থি রয়েছে। তাঁর মধ্যে ছয়টি প্রধান এবং সেইজন্যই এখানে আঁকা রয়েছে। আমি ইচ্ছা করে আঁকিনি। আমার হাত আপনা হতে ঘুরে গিয়ে এই ছবি আঁকা হয়েছে।

মনে রাখিস এই সব গ্রন্থিতে বা নাড়িগুচ্ছগুলি সংযোগক্ষেত্রে রূপরস, গন্ধ, স্পর্শ প্রভৃতি জনিত মানুষের বিভিন্ন মোহ ও জন্ম মৃত্যু : সংস্কার আবদ্ধ রয়েছে। প্রাণবায়ু এদের ভিতর দিয়ে কোথাও জোরে কোথাও আস্তে প্রবাহিত হয়ে মানুষের কর্ম ও ভাবের গতিকে নিয়ন্ত্রিত করে। যেমন পৃথিবীর উপর জল, জলের উপর তেজ, তেজের উপর বায়ু, এবং বায়ুর উপর ব্যোম বা আকাশ, তেমনি মানুষের শরীরেও এক-একটি করে পাঁচটি ভূত ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে।

অন্তর শুদ্ধির ফলে প্রাণবায়ু যখন প্রধান প্রধান নাড়ীকেন্দ্রগুলিকে আলোড়িত করে, তখন মূলাধারের বদ্ধশক্তি উন্মুখী হয়ে এক-একটি গ্রন্থি ভেদ করে উপরের দিকে উঠতে থাকে। তখন সাধকের জড়তা ও সংস্কার ক্ষীণ হতে থাকে এবং গ্রন্থিভেদের সঙ্গে সঙ্গে বাইরের জগতের রূপরস প্রভৃতির আসক্তি কমে যেতে থাকে। এই উন্মুখী শক্তি ক্রমেক্ষেপে পৌঁছলে অন্তর্নিহিত প্রাণবায়ুর গতি সর্বত্র সরল ও বিশুদ্ধ হয়। তখন সাধকের আত্মা স্থিতি, স্রষ্টা প্রভৃতি সম্পর্কে প্রশ্ন জাগে মনে। এইভাবে একে একে সব সংস্কার দূরীভূত হয় এবং ধ্যানের গতি ক্রমশঃ উচ্চ হতে উচ্চতঃ ভূমিতে উঠে যায়। সব শেষ স্তরে উপনীত হলে সাধক মহাভাবে লীন হয় বা সমাধি-ভূমিতে শান্তি লাভ করে।

মূলাধারে ঘুমিয়ে থাকা শক্তি সাধনার বলে জেগে উঠে যখন এক-একটি গ্রন্থি ভেদ করে উপরের দিকে উঠতে থাকে তখন সাধক নানা রকমের ধ্বনি শুনতে পায়। তখন তার মনে হয় শব্দ ঘণ্টাধ্বনির মতো

একটি শব্দতরঙ্গ বিশ্বব্যাপী এক মহাধ্বনির সমুদ্রে মিশে যাচ্ছে। তখন বাইরের জগতের কোন ভাব বা বস্তু তার চিন্তকে আর আকর্ষণ করতে পারে না।

মা কারো কাছে কোনদিন যোগক্রিয়া শেখেননি। অথচ সব কিছুই তাঁর আয়ত্তের মধ্যে। এ-বিষয়ে একদিন প্রশ্ন করা হলে মা বললেন, উপাসনা, পূজা, ধ্যান, কীর্তন প্রভৃতি নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতার সঙ্গে নিয়মিত করতে থাকলে আপনা হতেই চিন্তশুদ্ধি ও ভাবশুদ্ধি হয় এবং গ্রন্থিগুলি খুলে যায়। তাছাড়া জীব, কাম, ক্রোধ, প্রভৃতি রিপু ও সংস্কারগুলি হতে উদ্ধার পেতে পারে না।

একদিন মা সমবেত ভক্তদের সঙ্গে করে ঢাকার সিদ্ধেশ্বরীর আশ্রমে গেলেন। জায়গাটি বেশ নির্জন। মাঝখানে একটি চারকোণা বেদী ছিল। মা তার উপর গিয়ে পদ্মাসনে বসলেন। ভক্তেরা চারদিকে আপন আপন ভাবে বসে রইল।

সহসা মা শরীরটাকে সংকুচিত করতে করতে এমন সূক্ষ্ম করে তুললেন যে, সকলের মনে হতে লাগল, মার দেহটা যেন সেখানে আর নেই; শুধু তাঁর পরনের কাপড়খানি পড়ে আছে। অনেকক্ষণ সেইভাবে থাকার পর মা আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এলেন।

মা পরে বললেন, কাগজের ঘুড়ি যেমন একমাত্র স্রুতোর আশ্রয়ে ওড়ে, তেমনি যোগীরা শরীরে শ্বাসের ও সংস্কারের স্রুতো ধরে শূন্যে ওঠা, সূক্ষ্ম হওয়া, বড় হওয়া, অদৃশ্য হওয়া প্রভৃতি অনেক রকম খেলা খেলতে পারে।

শোনা গেছে কেউ কেউ স্বপ্নেও মার কাছ থেকে মন্ত্র এবং তার সঙ্গে ফুল পেয়েছেন। জেগে উঠেও সে ফুল দেখতে পেয়েছেন। অথচ সামনাসামনি কাউকে দীক্ষা দিতে দেখা যায়নি। আরও শোনা গেছে, মা বহুদূরে বাস করছেন, কিন্তু বহু ভক্ত নিজের বাড়িতে হঠাৎ মার প্রত্যক্ষ দর্শন পেয়ে চমকে উঠেছেন।

মা একবার উত্তর-পশ্চিম ভারতে বাস করছিলেন। সেই সময় তিনি সূক্ষ্ম শরীরে দু'দিন ঢাকায় এসে তার এক ভক্ত রোগীকে দেখে যান। পরে ঢাকায় ফিরে এসে মা তাঁকে বলেন, আমি দুদিন মাঝরাতে তোমার ঘরে এ দুয়ের দিয়ে এসে ঐ দুয়ের দিয়ে বেরিয়ে গেছি, তুমি রোগে খুব কাতর ছিলি।

মা তাঁর ভক্তদের বলেন, আমি তো তোদের সঙ্গেই আছি। তোরা দেখতে চাস না আমি করব কী? তোরা জেনে রাখ, তোরা কী করিস, নিকটে বা দূরে হোক যে কোন সময় একটি দৃষ্টি তোদের উপর সর্বদা জাগ্রত থাকে।

বর্তমানে মা বৃন্দাবনে বাস করছেন! কিন্তু যেখানেই থাকুন না তিনি, তাঁর অফুরন্ত করুণা ও মমতা সকল ভক্ত সন্তানের উপর সমান-ভাবে বর্ষিত হচ্ছে। কোন সাধকের মধ্যে একই সঙ্গে জ্ঞানযোগ, রাজ-যোগ, ভক্তিযোগ ও কর্মযোগের এমন অপূর্ব সমন্বয় এবং সার্থক বিকাশ কখনো দেখা যায় না। অথচ তাঁকে সাধিকা বলে মনে হয় না কখনো। শৈশব থেকেই যঁারা তাঁকে দেখে আসছেন, তাঁরা সকলেই বলেছেন, শিশুকাল থেকে তিনি কর্মে ও ভাবে একই ধারায় অবস্থান করছেন। কঠোর তপশ্চর্যা বলতে যা বোঝায় তা করতে কখনোই তাঁকে দেখা যায় নি।



শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

সেদিন ছিল ১২৯৫ সালের তিরিশে ভাদ্র। রাত পোহালেই শুরু হবে তালনবগীর ত্রত-উৎসব। কিন্তু রাত তখনো ভালভাবে পোহায়নি। অন্ধকারটা পাতলা হয়ে সবে যেতে শুরু করলেও শরতের সোনার আলো ফুটে ওঠেনি তখনো পূর্ব আকাশে। পদ্মার উত্তর তীরে ঘুমিয়ে থাকা হিমাইতপুর গাঁ তখনো জেগে ওঠেনি। কিন্তু মানুষরা কেউ জেগে না উঠলেও বাতাসের দোলা-লাগা গাছে গাছে পাখিরা জেগে উঠতে শুরু করেছে একে একে। তাদের ঘুমভাঙা চোখে ভোরের কুয়াশা-ভেজা আলোর হঠাৎ ঝলকানি লাগায় এক তীব্র কলরবে ফেটে পড়েছে তারা।

চারিদিকে পাখিদের এই কলরবের মাঝখানে গাঁয়ের চৌধুরীদের বাড়িতে পাঁচবার হলুধ্বনি শোনা গেল কুলনারীদের কণ্ঠে। পাড়ার সকলে বুঝতে পারল, চৌধুরীদের মেয়ে মনোমোহিনী নিশ্চয়ই পুত্র-সন্তান প্রসব করেছে। কোন বাড়িতে পুত্র সন্তান জন্মানো এমন কিছু আশ্চর্য ঘটনা নয়, তবু আশ্চর্য বলেই মনে হলো সবার। কারণ যে শিশু পুরো বারো মাস মাতৃগর্ভে থাকার পর ভূমিষ্ঠ হয় সে-শিশুর জন্ম একটা আশ্চর্য ঘটনা বৈকি।

পাড়ার ও গাঁয়ের মেয়েরা ছেলে দেখতে এসে আরও আশ্চর্য হলেন। প্রথমত, প্রসবকালে কোন যন্ত্রণা অনুভব করেননি প্রসূতি। দ্বিতীয়ত ছেলেটি অপরূপ রূপলাবণ্যসম্পন্ন, কিন্তু মাথায় একেবারে চুল নেই। তাছাড়া ভূমিষ্ঠ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সব মানবশিশু যে আদিম ও অসহায় কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে, সে ধরনের কোন কান্না নেই তার কণ্ঠে।

তবে কি সন্ন্যাসীর কথাই ঠিক ?

মনোমোহিনী যখন গর্ভবতী ছিলেন তখন অকস্মাৎ একদিন চৌধুরী-বাড়িতে এক আশ্চর্য সাধুর আবির্ভাব হল, এই সাধু দু'টি ভবিষ্যদ্বানী

করে বলেন, অচিরেই এই বাড়ির এক ছেলে মারা যাবে আর এমন একটি ছেলে জন্ম গ্রহণ করবে যে ধর্মজগতে আনবে এক বিপ্লব, মানুষের সব ধারণাকে করে দেবে ওলট-পালট।

অল্প কয় মাসের মধ্যে চৌধুরী-বাড়ির একমাত্র পুত্র মনোমোহিনীর একমাত্র ভাই যোগেন্দ্র পরলোক গমন করলেন। কিন্তু সাধুর দুটি ভবিষ্যদ্বানীর এইভাবে একটি প্রমাণিত হলেও অন্যটি সম্বন্ধে লোকের অবিশ্বাস তখনো যায়নি। সবাই ভাবল, এই সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের একটি সাধারণ মেয়ের গর্ভে কখনো কোন মহাপুরুষ জন্ম নিতে পারেন না। কিন্তু সেদিন যে-কথাটিকে কোন গুরুত্ব দেননি তাঁরা আত্ম সে কথাটির গুরুত্ব সম্বন্ধে নতুন করে না ভেবে পারলেন না। শিশুর মা মনোমোহিনী এবং বাবা শিবচন্দ্র চক্রবর্তী আর কিছু না হোন ধর্মপ্রাণ সরল প্রকৃতির লোক।

শিশুর নাম রাখা হলো অনুকূলচন্দ্র।

অন্নপ্রাশনের দিন শিশুর কাণ্ড দেখে আর-একবার আশ্চর্য হলো গাঁয়ের সকলে। শাস্ত্র ও প্রথামতে কুলপুরোহিত শিশুর হাতে টাকা দিলে শিশু তা গ্রহণ করল না। কিন্তু হাতে মাটি দিলে তা সে সহজেই গ্রহণ করল। তা দেখে উপস্থিত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতরা বললেন, ছেলে ত্যাগী হবে। তারপর শিশুর হাতে একটা টুকরো কাগজ দেবার সঙ্গে সঙ্গে তাও সে গ্রহণ করল। তখন পণ্ডিতরা বললেন, ছেলে বিদ্বান হবে। শিবচন্দ্র ছিলেন বারেন্দ্র-শ্রেণীর ব্রাহ্মণ।

শিবচন্দ্রের বাড়ি ছিল পাবনা জেলার অন্তর্গত গুয়াখাড়া গাঁয়ে। তাঁর ভাই গোবিন্দচন্দ্র পাবনা ফৌজদারী আদালতের হেডক্লার্ক ছিলেন। শিবচন্দ্র তাঁর বাসায় থেকে ঠিকাদারের কাজ করতেন। বিয়ের পর সেই বাসাতেই স্ত্রীকে নিয়ে আসেন। কিন্তু শ্বশুর ও একমাত্র শ্যালকের মৃত্যুর পর থেকে তাঁদের প্রায়ই হিমাইতপুরে থাকতে হত।

সামান্য অংকুরের মধ্যে যেমন থাকে বিরাট মহীরুহের সম্ভাবনা, তেমনি সব শিশুর মধ্যেই নিহিত থাকে তার ভবিষ্যত জীবনের

পরিণতির এক অস্পষ্ট আভাস। অনুকূলচন্দ্রের শৈশবজীবনের অজস্র ঘটনার মধ্যে ছড়িয়ে রয়েছে তাঁর ভবিষ্যৎ জীবনের মহত্তর পরিণতির এক অতিমানবিক ব্যঞ্জনা। অলৌকিকত্বের বহু লক্ষণ।

অজস্র ঘটনার মধ্যে কয়েকটি ঘটনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

খুব অল্প বয়সে অর্থাৎ অগ্ন্যন্ত ছেলেদের থেকে অনেক আগেই হাঁটতে ও চলাফেরা করতে শিখেছিলেন শিশু অনুকূলচন্দ্র। তখন তাঁর বয়স এক বছরের কিছু বেশী। মা একবার তাঁকে নিয়ে পাবনা জেলার অন্তর্গত হরিপুরের জমিদার উমেশচন্দ্র লাহিড়ীর বাড়ি বেড়াতে গিয়েছিলেন কিছুদিনের জন্ত। লাহিড়ী মশায় ছিলেন তাঁদের আত্মীয় এবং সেই সূত্রে বিশেষ হৃদয়তা ছিল তাঁদের সঙ্গে।

উমেশবাবুর বাড়িতে গোপাল দেবের বিগ্রহ মূর্তি ছিল। শিশু অনুকূলচন্দ্রকে সঙ্গে করে সকালে বিকালে মন্দিরে যেতেন উমেশবাবু। একদিন সকালে মন্দিরে গিয়ে শিশুকে দারোয়ানের কাছে রেখে পুজোয় বসেছেন চোখ বন্ধ করে এমন সময় একটি ভারী জিনিস পড়ার শব্দ হলো। সঙ্গে সঙ্গে চোখ খুলে উমেশবাবু দেখলেন, সিংহাসন থেকে গোপাল ঠাকুরের বিগ্রহ-মূর্তিকে ফেলে দিয়ে শিশু নিজেই সেখানে বসে হাসছেন।

এই দৃশ্য দেখে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন উমেশবাবু। কিন্তু বিন্দুমাত্র রাগও জমল না তাঁর মনে। তিনি শুধু ভাবলেন, কোন সাধারণ শিশুর পক্ষে এতখানি দুঃসাহস কখনই সম্ভব নয়। কোন দেবস্থানের গুরুগম্ভীর পরিবেশে গেলে সাধারণ শিশুর মধ্যে জাগে এক শ্রদ্ধাবিমিশ্রিত বিহ্বলতা ও একটা নিবিড় সংকোচ। তারা কখনই সাহস পাবে না এ ধরনের কাজ করতে। সুতরাং শিশু অনুকূলচন্দ্রের এই ক্ষুদ্র জীবনের মধ্যে যে এক মহান অলৌকিক জীবনের বিরাট সম্ভাবনা রয়েছে সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ রইল না উমেশবাবুর মনে। তিনি কাউকে কিছু না বলে শিশুকে অনেক আদর করে ভুলিয়ে অগ্ন্যন্ত সরিয়ে পুজো সারলেন।

দেখতে দেখতে চার বছরে পড়লেন শিশু অনুকূলচন্দ্র। এই সময় তাঁর একবার কঠিন অন্থ হয়! ডাক্তারি কবিরাজি অনেক করা সত্ত্বেও কিছুতেই সারতে চাইল না সে রোগ। এমন সময় হঠাৎ এক সন্ন্যাসীর আবির্ভাব হলো। তিনি দেখে বললেন, ভয় নেই, এ শিশু মরবে না; এ সাধারণ শিশু নয়।

সন্ন্যাসীর দেওয়া কতকগুলি টোটকা ওষুধেই ভালো হয়ে গেল অন্থ।

আর-একবার কোথা হতে এক সন্ন্যাসী এসে হাজির হলেন। তিনি রোজ কোথা থেকে ভাল ভাল খাবার এনে শিশুকে খাইয়ে তার উচ্ছিষ্ট নিজে প্রসাদস্বরূপ খেতেন। এতে সন্তানের অমঙ্গল আশঙ্কা করে মা রাগ করলেন। তিনি একদিন সন্ন্যাসীকে স্পষ্ট বললেন, এ কী করছেন? এতে আমার সন্তানের অকল্যাণ হবে যে।

সন্ন্যাসী তখন মাকে বুঝিয়ে বললেন, এ সামান্য বা সাধারণ ছেলে নয়। সাধারণ ছেলে হলে কখনো আমি এর উচ্ছিষ্ট খেতাম না।

তবু সব আশঙ্কা যেতে চায় না মার মন থেকে। তবে এ ছেলে যে সাধারণ ছেলে নয় মা নিজেই তার প্রমাণ পেয়ে গেলেন কিছুদিনের মধ্যে।

একদিন গাঁয়ের এক বাড়িতে একটি পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করে। মা বললেন, আমার সঙ্গে যাবি তো চল, একবার দেখে আসিগে।

শিশু অনুকূলচন্দ্র বললেন, যেতে হয় তুমি যাও, আমি যাব না। ও ছেলে মাত্র আঠারো দিন বাঁচবে।

পরে দেখা গেল সত্যি সত্যিই আঠারো দিনের দিন ছেলেটি মারা গেল।

আর-একবার খাঁটি বিষ হজম করে ফেলেন শিশু অনুকূলচন্দ্র।

বাড়ির কাছে এক কবিরাজ থাকতেন। তিনি নানা রকম ওষুধ তৈরি করে রোদে শুকোতে দিতেন। একদিন কতকগুলি বিষের বড়ি শুকোতে দিয়েছিলেন। নিজে কাছে বসে পাহারা দিচ্ছিলেন, পাছে

কোন ছেলেপুলে হাত দেয় এই ভয়ে। খাঁটি বিষ। এ-বড়ি কোন-রকমে একবার মুখে গেলে মৃত্যু অনিবার্য।

একবার কবিরাজ মশায় সেখান থেকে অল্প কিছুক্ষণের জন্য সরে যেতেই শিশু অনুকূলচন্দ্র সেখানে গিয়ে মুহূর্তের মধ্যে অনেকগুলি বিষের বড়ি একসঙ্গে খেয়ে ফেললেন। দেখতে পেয়ে কবিরাজ ছুটে এসে চোঁচামেচি শুরু করে দিলেন। আরও অনেকে এসে হা-হতাশ করতে লাগলেন। সকলেই ভাবল, একেই বলে ভবিষ্যৎ। শিশুর মৃত্যু অনিবার্য; যার যেভাবে মৃত্যু কপালে লেখা থাকে তা হতেই হবে। বিধির বিধান খণ্ডাবে কে? কিন্তু আশ্চর্য। সকলের সব জল্পনা-কল্পনা ও ভয়-ভাবনাকে ব্যর্থ প্রতিপন্ন করে সুস্থ স্বাভাবিক দেহে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন শিশু অনুকূলচন্দ্র। বিষক্রিয়ার লক্ষণই দেখা গেল না তাঁর দেহে।

সকলেই যখন হতাশ হয়ে চোঁচামিচি শুরু করে দিয়েছে শিশুর জন্য তখন মা মনোমোহিনী কিন্তু এক আশ্চর্য শৈশ্বর্য ও ধৈর্য সহকারে চুপ করে আছেন। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস এতে তাঁর সন্তানের কোন বিপদই হবে না। হুজুর মহরাজের কৃপাবলে যে দুর্লভ সন্তান তিনি লাভ করেছেন এবং যে সন্তান হতে একদিন পূর্ণানন্দ লাভ করবেন তিনি, সে-সন্তানকে তিনি কখনই অকালে হারাতে পারেন না।

তাছাড়া হারালেও হয়ত খুব একটা বিচলিত হয়ে পড়তেন না মনোমোহিনী। স্বপ্নে দৃষ্ট সদগুরুর কাছ থেকে দীক্ষা ও সত্যনাম প্রাপ্তির পর থেকে সুখে-দুঃখে অবিচলিত থাকার যে অতুলনীয় আত্ম-শক্তি তিনি লাভ করেছেন তার কাছে জাগতিক যে কোন আঘাতই তুচ্ছ। সেই স্বপ্নদর্শনের পরম দিন থেকে এক অটল অচল পাহাড়ের মতো হয়ে উঠেছে তাঁর চিত্ত। সংসারের কোন সুখ-দুঃখই কোন সংকোভ সৃষ্টি করতে পারে না সে চিন্তে। সেদিন হতে এক নিস্তরঙ্গ বিশাল সমুদ্রের মতো হয়ে উঠেছে যেন তাঁর হৃদয়। পার্থিব কোন লাভ-ক্ষতির কোন ঘটনা কোন বৃদ্ধদ সৃষ্টি করতে পারে না সে হৃদয়ে। এই

অসাধারণ আত্মশক্তির বলেই পরবর্তী কালে কয়েকটি পুত্রকন্যা হারিয়েও কোনদিন শোকে অভিভূত হয়ে পড়েননি মনোমোহিনী ।

বিয়ের আগেই বালিকা অবস্থায় মনোমোহিনীর স্বপ্নে গুরুদর্শন ও সত্যনাম প্রাপ্তির ঘটনাটি বড় অদ্ভুত । শৈশবকাল হতেই বড় ঠাকুর-ভক্তি ছিল মনোমোহিনীর । তাঁর ঠাকুরমা কৃপাময়ীর পিতলের তৈরি রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহমূর্তি ছিল । রোজ রাতে শোবার সময় দীক্ষামন্ত্র পাবার জন্য কাতর প্রার্থনা করতেন মনোমোহিনী সেই বিগ্রহের কাছে । একদিন গভীর রাতে তিনি যখন ঘুমিয়ে ছিলেন তখন এক উজ্জ্বল পুরুষমূর্তি স্বপ্নে আবিভূত হয়ে তাঁকে দীক্ষা দিতে চান । তারপর তিনি এক উচ্চতর অনাহুত নাদ বা ধনাত্মক এক বীজমন্ত্র দান করেন । বিয়ের পর শিবচন্দ্রের আত্মীয় ঈশ্বরচন্দ্র চক্রবর্তী মশায়ের উপাশ্রয় এক সুন্দর পটমূর্তি দেখে তাঁর স্বপ্নদৃষ্ট গুরুকে চিনতে পারেন মনোমোহিনী । সঙ্গে সঙ্গে এলাহাবাদে গুরুর কাছে চিঠি লেখেন । কিছুদিনের মধ্যে গুরুর উত্তর এবং সাধন-ভজনের প্রণালী শিক্ষার কাগজ আসে । এই সদগুরুরূপী পরমপিতার নিকট মনে মনে তাঁর মতো এক পুত্র কামনা করেছিলেন মনোমোহিনী ।

কৃপা করে গুরু তাঁর মনস্কামনা পূরণ করেছিলেন বলেই তিনি অনুকূলচন্দ্রের মতো সন্তান লাভ করেছেন । শুধু তাই নয়, গুরুর কাছ থেকে যে দীক্ষামন্ত্র ও সত্যনাম পেয়েছেন তা সন্তানের কাণে তার নিতান্ত শৈশব অবস্থাতেই দান করেছেন । যদিও সে নাম বা মন্ত্রের অর্থ তখন বুঝতে পারেননি শিশু অনুকূলচন্দ্র, তবুও মাঝে মাঝে তা আপনা হতেই মনে জাগত তাঁর । সঙ্গে সঙ্গে সেই নাম করা শুরু করে দিতেন । দুর্বোধ্য সে নামের রহস্যময় মাদকতায় দেখতে দেখতে আচ্ছন্ন হয়ে উঠত তাঁর সমস্ত প্রাণ মন ।

ভগবানের নাম দুই রকমের । এক হচ্ছে সত্যনাম বা বীজমন্ত্র এবং অপরটি হচ্ছে কল্লনামূলক নাম । সাধনকালে সাধকেরা এক অনাহুত নাদ শুনতে পান ; যে-শব্দ দ্বারা এই নাদকে সূচিত করা হয়,

সেই শব্দই হলো বীজমন্ত্র। এই বীজমন্ত্রকেই বলা হয় সত্যনাম। বাকি সব কল্পনা প্রসূত নাম। সত্যনাম এক এবং নিত্য; কল্পনামূলক নাম বিভিন্ন রকমের হতে পারে। প্রণব বা ওঙ্কারমন্ত্রকেও বীজমন্ত্র বলা হয়। প্রাচীনকালের ভারতীয় ঋষিরা এই বীজমন্ত্রের রহস্য জানতেন। সাধনায় সিদ্ধিলাভের সঙ্গে সঙ্গে অনাহত ওঙ্কারধ্বনি শুনতে পেতেন তাঁরা অন্তরে। যে নাদ অপেক্ষা উচ্চতর বা সূক্ষ্মতর নাদ কেউ কখনো শোনেননি তাই হচ্ছে আদি অনাহত নাদ। এই নাদের প্রকাশক শব্দই আদি বীজমন্ত্র বা আদি সত্যনাম। বৈদিক ঋষিগণ ওঙ্কারধ্বনিকেই আদি নাদ বলে মনে করতেন।

তারপর গঙ্গার বুকের উপর দিয়ে কত অজানা জলের ঢেউ বয়ে গেছে। তেমনি মনোমোহিনীর সংসারের উপর দিয়েও বয়ে গেছে কত অবাস্তিত ঘটনার ঢেউ, কত প্রতিকূল অবস্থার ঝড়। তবু তাঁর সাধনলব্ধ অর্জিত আত্মশক্তিবলে অটুটভাবে সমানে হাল ধরে থেকেছেন মনোমোহিনী। সুখে-দুঃখে বিপদে-সম্পদে এক ভাব।

এরই মধ্যে দিনে দিনে বেড়ে উঠেছেন শিশু অনুকূলচন্দ্র। শৈশব থেকে পদার্পণ করেছেন বাল্যে। পাঠাভ্যাস শুরু হয়ে গেছে অনেক আগেই। এবার বিদ্যালয় যাতায়াত করছেন। পড়াশুনোয় কোন বিরাগ ছিল না, কোন অভক্তি বা অশ্রদ্ধা ছিল না বিদ্যালয়ের গুরুদেব প্রতি। তবু তাঁর প্রায়ই মনে হত, তাঁর আসল শিক্ষা ও দীক্ষাগুরু হচ্ছেন তাঁর প্রকৃত শিক্ষায়তন হচ্ছে তাঁর বাড়ি।

যখন যেখানেই থাকেন, যেখানেই যান কেবল মার কথা মনে পড়ে। আর মনে পড়ে সেই সত্যনামের কথা। কিছু কিছু নাম করতে এক দিব্যজ্যোতি দর্শন করেন ললাটমধ্যে। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় শ্বেদ ও কম্পন। মনে হয় তিনি মুর্ছিত হয়ে পড়ে যাবেন। ক্রয়ুগল মধ্যস্থিত সেই জ্যোতির অলৌকিক আলোকছটায় অন্তরের মধ্যেই দেখতে পান সমগ্র বর্হিবিশ্ব। বাইরের চোখ দু'টি সহসা ম্লান ও আচ্ছন্ন হয়ে যায়

আর সঙ্গে সঙ্গে এক আশ্চর্য দৃষ্টিশক্তিতে দীপ্যমান হয়ে ওঠে যেন তাঁর অন্তরের চোখ।

ঈশ্বরভক্তি জোর করে আনতে হয় না। এটি যেন এক সহজাত অন্তরভক্তি বালক অনুকূলচন্দ্রের। তাঁর ভক্তি যেন সাধ্য ভক্তি, সাধন ভক্তি নয়। সাধনা করে কষ্ট করে চেফা করে অন্তরে উৎপন্ন করতে হয় না এ-ভক্তিকে। মাতৃগর্ভে ভ্রূণ অবস্থাতেই যেন এ-ভক্তি শিক্ষা করে ফেলেছেন তিনি।

মার দেহের রক্তমাংসের সংযোজনেই শুধু দেহটি গড়ে ওঠেনি বালক অনুকূলচন্দ্রের, তাঁর সমগ্র আত্মসত্তাটিও যেন গড়ে উঠেছে মার মহীয়সী মনের অমূল্য ধাতুর উপাদানে। মাতৃগর্ভে থাকাকালেই কে যেন সেই আশ্চর্য সত্যনামের নামাবলী এঁকে দিয়েছে তাঁর কাঁচা গাত্রচর্মে। তাঁর প্রতিটি রক্তকণিকায় ও অস্থিমজ্জার প্রতিটি অণু পরমাণুতে মিশিয়ে দিয়েছে কে যেন সেই নামের সুরভি। সেই মহা বীজমন্ত্রের অনাহত ধ্বনিম্পন্দনের সুরে কে যেন আগে হতেই সেধে রেখেছে তাঁর মস্তিষ্কের প্রতিটি স্নায়ুতন্ত্রীকে।

নাম করতে করতে সিদ্ধপ্রায় সাধকেরা এক রকমের নাদ শুনতে পান! এই নাদ বিভিন্ন রকমের হতে পারে। নাম করতে করতে এক তাল-মান-লয়যুক্ত এক সূক্ষ্ম মধুর সঙ্গীত শুনতে পেতেন বালক অনুকূলচন্দ্র। কিন্তু এই সঙ্গীতের সুর তাঁর নামের ছন্দপতন ঘটাতে বলে তিনি অগ্ন্যত্র সরে যেতেন। কিন্তু যেখানেই যেতেন সেইখানেই শুনতে পেতেন এই সঙ্গীত।

মনে হত সুরের মধু ঝরে পড়ছে যেন চারিদিকে। মধুস্রাবী এক সুরের প্লাবনে সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ভাসছে। জগতের সব বস্তু বিধৃত রয়েছে সেই সুরের ঐকতানে। এই ঐকতানের জগ্নাই সব কিছুর মধ্যে এক অপূর্ব সঙ্গীত খুঁজে পেতেন অনুকূলচন্দ্র। কোথাও যেন কোন বিরোধ বা অসঙ্গতি নেই।

কারো কোন দুঃখ দেখলেই সে দুঃখ সঙ্গে সঙ্গে অন্তরে এসে বাজত

তাঁর। কেউ কাঁদলে এক অজানা বেদনায় টনটনিয়ে উঠত তাঁর স্নায়ুগুলো। কোন ভিখারী দেখলেই ছুটে গিয়ে হাতের কাছে যা পেতেন তা দিয়ে দিতেন। এক নিবিড়তম সংবেদনশীলতার সূক্ষ্মতম স্বরগ্রামে কে যেন তাঁর হৃদয়তন্ত্রীটিকে বেঁধে দিয়েছে। পৃথিবীর সব মানুষের আনন্দ বেদনার প্রতিটি সুর তাতে আপনা থেকে বেজে ওঠে। চেনা অচেনা বা আপন পর বলে যেন তাঁর কেউ নেই। মনে হত সব মানুষ যেন তাঁর কত যুগের চেনা কত আত্মীয়। সুন্দর অসুন্দর প্রকৃতি জগতের সব বস্তুই তাঁর কাছে সমান প্রিয়।

নাম করতে করতে যে জ্যোতির্দর্শন করতেন মাঝে মাঝে তার তীব্রতা সহ্য করতে পারতেন না বালক অনুকূলচন্দ্র। একদিন তিনি বিছালয়ের পথে যেতে যেতে নাম করবার সময় এই ধরনের জ্যোতি দর্শন করে মূর্ছিত হয়ে পড়েন। পথের ধারে কাদা ছিল সেই কাদায় তাঁর দেহ অনেকক্ষণ নিশ্চল হয়ে পড়ে থাকে। তারপর দুধ বিক্রী করতে গিয়ে একজম রমণী তাঁকে এইভাবে পড়ে থাকতে দেখে কোলে করে বাড়িতে নিয়ে আসে।

অনেকে বলল, এ হচ্ছে হিষ্টিরিয়া রোগ। ওকে স্কুলে যেতে দেয়া উচিত নয়। এ ব্যারাম সারবার নয়।

আবার অনেকে বললে, ব্যারাম নয়। এ হচ্ছে ব্যারামের ভাগ। অনেক ছেলে স্কুল যাবার ভয়ে এইরকম করে রোগের ভাগ করে।

এইভাবে যার যা মনে আসে তাই মন্তব্য করতে লাগল। কিন্তু মামনোমোহিনী চুপ করে রইলেন। আসল ব্যাপারটি তিনিই একমাত্র জানেন। কিন্তু একথা অণু কাউকে জানানো চলে না।

দিনে দিনে যত বেড়ে উঠতে লাগলেন অনুকূলচন্দ্র বয়স ও দেহের থেকে দিক ততই দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগল তাঁর ফুলের মত সুন্দর ও কোমল আত্মার সুরভিত মহিমা। যত দিন যেতে থাকে ততই বড় সূক্ষ্ম বড় সংবেদনশীল হয়ে উঠতে থাকে তাঁর মনটি। সে-মনটিকে কখনো নিজের মধ্যে কিছু তই ধরে রেখে দিতে পারেন না। কখনো

নিজের স্বার্থের কথা সে মন ভাবতে চায় না। কেবল পরের জন্য আত্মহারা হয়ে ছুটে চলে।

একদিন পথের ধারে, এক ভিখারী পয়সা চাইল। তাঁর জলখাবারের সামান্য কিছু পয়সা ছিল, তিনি তাই দিয়ে দিলেন। আর একদিন এক ভিখারী এক টুকরো কাপড় চাইল পরবার জন্য। সঙ্গে সঙ্গে তিনি নিজের পরনের কাপড়টি খুলে দিয়ে উলঙ্গ অবস্থায় বাড়ি ফিরে গেলেন।

একদিন বিকালের দিকে বিদ্যালয় থেকে ফিরবার সময় ভীষণ ঝড়বৃষ্টি নামল। ঝড়জলের সঙ্গে শিলারূপি। সেই ভয়ানক ঝড়বৃষ্টি মাথায় করে ছেলেরা পথে বেরোতে সাহস করল না। কিন্তু কী মনে হলো, অনুকূলচন্দ্র দাঁড়িয়ে এক মুহূর্তও অপেক্ষা করলেন না। লেখার নোটটি মাথায় দিয়ে সমস্ত ঝড়বৃষ্টি অগ্রাহ করে পথে বেরিয়ে পড়লেন।

যেতে যেতে সহসা পথের ধারে কার ক্ষীণ আর্ত কণ্ঠের অস্পষ্ট শব্দ শুনে চমকে উঠলেন অনুকূলচন্দ্র। এগিয়ে গিয়ে দেখলেন এক অন্ধ বৃদ্ধ মুসলমান পথের ধারের নালায় জল কাদার মধ্যে পড়ে গেছে। তার মুখটি শুধু বেরিয়ে আছে। ক্রমাগত ঝড়জল ও শিলারূপির আঘাতে এমনি সে জর্জরিত হয়ে পড়েছে যে তার কোন কথা বলার সামর্থ্য নেই। কোনরকমে সে ক্ষীণকণ্ঠে শুধু ‘আল্লা’ ‘আল্লা’ বলে চিৎকার করছে।

অনুকূলচন্দ্র তার কাছে এগিয়ে গিয়ে শান্ত গধুর ও সহানুভূতিশীল কণ্ঠে বললেন, তোমার কোন ভয় নেই, আমি এসেছি।

বৃদ্ধ কাতরকণ্ঠে বলল, কে বাবা তুমি? তুমি কি আমার আল্লা?

বালক অনুকূলচন্দ্র যুঁহু হেসে তেমনি শান্তকণ্ঠে বললেন, আমি আল্লা নই, তোমাদের মতোই মানুষ।

এই বলে দুহাত দিয়ে বৃদ্ধকে জড়িয়ে ধরে সেখান থেকে তুলে কাছাকাছি একটি বাড়িতে নিয়ে গেলেন। তারপর আগুনে কিছুক্ষণ ধরে তাকে সেক দিয়ে ঠাণ্ডা দেহটাকে গরম করে তুলে ক্রমে তাকে সুস্থ করে ফেললেন।

বন্ধকে স্বস্থ করে তখুনি পথে বেরিয়ে পড়লেন অনুকূলচন্দ্র। তখনো বাড়রূপ্তি থামেনি। কিছুদূর গিয়ে একটি ঘন বাঁশবনের মধ্যে দাঁড়ালেন। ভাবলেন, কিছুক্ষণ অপেক্ষা করবেন। এমন সময় কোথা হতে একটি বাজপাখি এসে তাঁর কাঁধের উপর শান্তভাবে বসল। নিরাশ্রয় পাখিটি বাড়জলে অর্ধমৃত হয়ে পড়েছে।

অনড় অচলভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন অনুকূলচন্দ্র। ঠিক যেন জড়বস্তু। পাখিটি যেন কোনরূপ সম্ভ্রান্ত হয়ে চলে না যায়। ক্রমে এক অপরিসীম করুণায় বিগলিত হয়ে উঠল তাঁর অন্তর। সমস্ত ভেদজ্ঞান ভুলে গিয়ে তিনি একাত্ম হয়ে উঠলেন পাখিটির সঙ্গে। তখনকার মতো পাখিটির সুখদুঃখ এবং সুবিধা অসুবিধাই হয়ে উঠল তাঁর একমাত্র লক্ষ্যের বিষয়। পাখিটিও হয়ত বুঝতে পেরেছিল তাঁর মনের কথা। তার ভালবাসার মধুর স্পর্শ পেয়েছিল বলেই হয়ত এমন নিশ্চিন্ত নির্ভরতার সঙ্গে এতক্ষণ ধরে বসে থাকল তাঁর দেহের উপর।

এ এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা। অন্তরে আজ প্রথম উপলব্ধি করলেন বালক অনুকূলচন্দ্র, ভালবাসার এক বৈদ্যুতিক শক্তি আছে; তার এক অদ্ভুত ব্যাপ্তিগুণ আছে। আপন অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে তিনি বুঝলেন, আমরা যখন কাউকে অন্তরের সঙ্গে ভালবাসি তখন সেই ভালবাসার অনুভূতি আমাদের অন্তরের মধ্যেই আবদ্ধ থাকে না, আমাদের অন্তর উপচিয়ে সে অনুভূতি আমাদের ভালবাসার বস্তুকে স্পর্শ করে প্রাবিত করে। সে বস্তু মানুষই হোক বা কোন নিকৃষ্ট জীবই হোক তাতে কিছু আসে যায় না।

অনুকূলচন্দ্রের বয়স তখন বার বা চৌদ্দ। তখন তাঁরা থাকতেন আমিরাবাদে। তাঁর পিতা শিবচন্দ্র ঢাকা জেলার অন্তর্গত আমিরাবাদের কাছারিতে কার্ষাধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত ছিলেন। এই সময় তাঁর গৃহ-শিক্ষকের চরিত্র দোষ হয়। অনুকূলচন্দ্র লক্ষ্য করতেন, এই শিক্ষক প্রায়ই বারান্সনা বাড়ি যান।

এই ঘটনাতে মনে বড় দুঃখ পেলেন অনুকূলচন্দ্র। যে-শিক্ষককে

অন্তরের সঙ্গে শ্রদ্ধা করেন তাঁর এই চারিত্রিক অধঃপতনে বড় ব্যথিত, মর্মান্বিত হয়ে পড়লেন। প্রতিজ্ঞা করলেন তিনি যেমন করেই হোক এই দুষ্কর্ম হতে প্রতিনিবৃত্ত করবেন তার শিক্ষককে। কিন্তু কেমন করে তা সম্ভব হবে তা বুঝে উঠতে পারলেন না।

সহসা তাঁর মার একটি কথা মনে পড়ল। একদিন কথায় কথায় মা বলেছিলেন সত্যনামের শক্তি বড় অদ্ভুত। এর দ্বারা অসাধ্য সাধন করা যায়। এই নামের মহিমা আমরা জানি না। তাই আমাদের এত কষ্ট।

একদিন সন্ধ্যা থেকে কড়া নজর রাখলেন অনুকূলচন্দ্র। তাঁর শিক্ষক কখন বেশাবাড়ি যান তা লক্ষ্য করতে লাগলেন এবং তাঁর যাবার সময় হতেই মনে-প্রাণে সত্যনাম জপ করতে লাগলেন। আর মাঝে মাঝে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতে লাগলেন কাতরভাবে, হে ভগবান, ওঁকে ক্ষমতি দাও। নিজের অন্তরে নিজেই যেন বুঝতে পারেন।

শিক্ষক মশায় বারান্সনাবাড়ি যাবার জন্ত রওনা হতেই অনুকূলচন্দ্র তাঁর অলক্ষ্যে তাঁর পিছু নিলেন। কায়মনোবাক্যে সত্যনাম জপ ও ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করতে করতে সম্ভ্রপণে এগিয়ে যেতে লাগলেন। অবশেষে আশ্চর্য হয়ে দেখলেন সত্যিই ঈশ্বর তাঁর প্রার্থনা পূরণ করেছেন। শিক্ষক মশায় যে-বারান্সনার বাড়িতেই যান, সেই বাড়িরই দরজা বন্ধ দেখেন। লজ্জায় ডাকাডাকি করতেও পারেন না! এমন তো কখনো হয় না। অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে গেলেন শিক্ষক মশায় ধিক্কার এল তাঁর মনে হীনকাজের জন্ত। তিনি সেখান থেকে দ্রুত বাড়ির দিকে চলে গেলেন। পরে তাঁর স্বভাবের পরিবর্তন হয়।

১৩১৩ সালের ২৮শে শ্রাবণ অনুকূলচন্দ্র ধোপাদহ গ্রামনিবাসী রামগোপাল ভট্টাচার্য মশায়ের কন্যা ষোড়শীবালার সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। তখন তাঁর বয়স মাত্র সতের এবং পাবনা উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে দশম শ্রেণীতে পড়েন।

এর পর কিছু দিন ঢাকা ও নৈহাটি বিদ্যালয়ে পড়ে ডাক্তারি পড়ার জন্য তিনি কলকাতায় গিয়ে গ্রাশনাল মেডিকেল স্কুলে ভর্তি হন।

তখন তাঁর চলেছে কৈশোর ও যৌবনের সন্ধিক্ষণ। মানুষের জীবনে এই সময়টি বড় তাৎপর্যপূর্ণ। এই সময় মানুষের সব ইন্দ্রিয়গুলি এক তীব্র ভোগলিপ্সায় সজাগ হয়ে ওঠে অস্বাভাবিকভাবে। সামান্য প্রলোভনেই প্রলুব্ধ হয়ে সহজেই বিপথে নিয়ে চলে মানুষকে। তবে এই সময় মানুষ খুব আবেগপ্রবণ থাকে বলে তার মনকে যদি কোন-রকমে একবার কোন আদর্শে উদ্বুদ্ধ করতে পারা যায়, তাহলে সে-মন সমস্ত শক্তি দিয়ে সে আদর্শের অনুসরণ করে চলে।

গাঁ হতে কলকাতায় এসে অনুকূলচন্দ্র দেখলেন, চারিদিকে শুধু কুসঙ্গ আর ভোগের অজস্র উপকরণ। বৈধ অবৈধ বিচার না করে ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত কত যুবক-সন্তান আগোদ-প্রমোদের পানে উন্মত্তের মতো ছুটে চলেছে। তাঁর চোখের সামনে তাঁর কত সহপাঠী উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করছে।

অনুকূলচন্দ্রের মন কিন্তু এসব কোন দিকে ধাবিত হলো না। সংঘমের সাধনা যেন অনেক আগেই শিক্ষা হয়ে গেছে। আপন আত্মার মধ্যে এক অমূল্য সম্পদও এক পরমানন্দের উৎস অনেক আগেই খুঁজে পেয়েছেন, সুতরাং বাইরের কোন বস্তুর মধ্যে জীবনের কোন আনন্দ হয় না। কোন সস্তা আগোদ-প্রমোদের দিকে মন তাঁর আপনা হতেই যেতে চায় না।

পড়াশুনোর সময় ছাড়া তিনি নাম জপ করে অবসর সময় যাপন কাটাতেন। কলেজ থেকে এসে বিকাল থেকে সারা সন্ধ্যাবেলা তিনি গঙ্গার ধারে একটি নির্জন জায়গায় একা একা ধ্যানমগ্ন অবস্থায় নিম্পন্দ হয়ে বসে থাকতেন। কখনো গঙ্গার দিকে কখনো আকাশের দিকে চেয়ে থাকতেন। আবার কখনো কোনদিকেই তাকাতেন না; চোখ দুটি বন্ধ করে আপন অন্তরের মধ্যে ডুবে যেতেন।

তাঁর এই ভাবের অর্থ সাধারণ মানুষে বুঝতে পারত না। তাঁর

অন্যান্য সহপাঠীরা ভাবত, অনুকূলচন্দ্র তাদের ঘৃণা করে এবং তাই এমন করে নিজেকে পৃথক করে সরিয়ে রাখে। তারা তাই কয়েকজন মিলে এই ঘৃণার প্রতিশোধ নেবার চেষ্টা করতে লাগল। অনুকূলচন্দ্রের চরিত্রের কিভাবে অবনতি ঘটানো যায় তার জন্য তারা মতলব আঁটতে লাগল।

একদিন তারা সকলে মিলে কাছাকাছি একটি বেশা পল্লীতে গিয়ে দু' তিনজন সুন্দরী বেশা যুবতীকে টাকা দিয়ে এ-ব্যাপারে নিযুক্ত করল। বলল, অনুকূলচন্দ্রকে এখানে কোনরকমে নিয়ে এলেই তারা যেন ছলাকলার দ্বারা তার মন ভোলাবার চেষ্টা করে। তখন সে আপনা থেকেই রোজ আসবে।

অন্য দিনকার মত সেদিন বিকালেও অনুকূলচন্দ্র একা একা গঙ্গার ধারে বেড়াচ্ছিলেন। সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় হয়নি তখনো। নদীর ধার ঘেঁষে একটি জায়গায় বসে ছিলেন অনুকূলচন্দ্র। বসে ছিলেন সামনের দিকে চেয়ে। কিন্তু প্রত্যক্ষ কোন কিছুই দেখছিলেন না। গোধূলির ধূসর আকাশ, নদীর প্রবহমান জলধারা, ওপারের জনপদ— কিছুই না। সমাগত সন্ধ্যার অন্ধকার যতই ঘন হয়ে উঠছিল ততই তাঁর ধ্যানস্তিমিত চোখের সামনে উজ্জ্বল হয়ে উঠছিল এক দিব্যজ্যোতি। সেই জ্যোতির ছটায় সমগ্র জগতের স্বরূপটি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলেন যেন তিনি। নদীজলধারার অশান্ত কলতানের মধ্যে তিনি শুনতে পাচ্ছিলেন এক মহা ঐকতান। যে সুস্বপ্ন সুরতান বিশ্ব-জগতের গভীরতম কন্দরে গোপনে নিহিত থেকে জগতের সব বস্তুস্বরূপের মধ্যে নিগূঢ় নিবিড় এক সঙ্গতি রক্ষা করে চলেছে সেই তানটিকে প্রায়ই ধরতে চেষ্টা করেন অনুকূলচন্দ্র। সেই সুরটিকে প্রায়ই শুনতে চান আপন অন্তরের গভীরে।

সেই সুরটিকে সাধারণ মানুষ শুনতে পায় না বলেই মানুষে মানুষে এত বিরোধ। জগতে এত বৈষম্য, অনুকূলচন্দ্র স্পষ্ট বুঝতে পারলেন দীর্ঘদিন সত্যনাম জপের ফলেই ঐ সুর ঐ তান শোনা সম্ভব হয়েছে

তাঁর পক্ষে। কিন্তু শুধু নিজে শুনলেই হবে না। তাহলে সমাজের জগতের কি কল্যাণ সাধিত হবে তাতে? তিনি কি সত্যি পাঁচজন মোক্ষকামী স্বার্থপর সাধকের মতো শুধু নিজের মুক্তির কথাই ভেবে যাবেন সারা জীবন?

নিজে নিজেই উত্তর দেন, কখনই না। মনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে ওঠেন অনুকূলচন্দ্র। এক সত্যনাথের সার্থক প্রচারের দ্বারা অজস্র মানুষকে উদ্ধার করতে হবে। তা না হলে বুখাই তাঁর সত্যনাম জপ।

সহসা একসঙ্গে অনেকগুলি মানুষের স্পর্শে চমক ভাঙল তাঁর। দেখলেন তাঁর কলেজের একদল সহপাঠী একটি বিশেষ জায়গায় যাবার জন্য অনুরোধ করছে তাঁকে। অনুকূলচন্দ্র স্পষ্ট তাঁকে জানিয়ে দিলেন, এবার এখান থেকে সোজা বাসায় চলে যাবেন তিনি, অথ কোথাও যাবেন না। আমোদ-আহ্লাদ হাসিখুশি কিছুই ভাল লাগছে না তাঁর। কিন্তু তাঁর কোন কথাই শুনবে না তারা। তাঁকে তারা সে জায়গায় নিয়ে যাবেই। অবশেষে তারা তাঁকে জোর করে কাঁধের উপর চাপিয়ে একটি বাড়িতে নিয়ে গেল। বাড়িটির দোতলার নিয়ে গিয়ে একটি সাজানো ভাল ঘরে বসাল। কিন্তু তিনি বসলেন না। দাঁড়িয়ে রইলেন।

সঙ্গে সঙ্গে অনুকূলচন্দ্র দেখলেন, দামী সাজ পোশাক পরে দু-তিন জন রূপসী-বারবনিতা তাঁর প্রতি মন্দির কটাক্ষ হেনে বিশেষ অঙ্গভঙ্গী করে এগিয়ে আসছে। মুহূর্তে তাঁর বন্ধুদের চক্রান্তের কথাটি বুঝতে পারলেন। কিন্তু কাউকে কোন কটু কথা বললেন না। কারো উপর রাগ করলেন না।

কাঠের পুতুলের মতো কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে একমনে সত্যনাম জপ করলেন। তারপর বারবনিতার। তাঁর কাছে এসে স্পর্শ করতে চাইলে তিনি উদার ক্ষমাশীল দৃষ্টিতে তাদের দিকে চেয়ে বললেন, মা একি তোর লীলা! এক সময়ে জননীরূপে জঠরে ধারণ করে স্তম্ভপান

করিয়ে লালনপালন করে আজ আবার বারাজ্জনা বেশে সন্তানের সম্মুখে উপস্থিত !

এইভাবে বারবণিতার মধ্যে তিনি জগজ্জননীর রূপকে প্রত্যক্ষ করলেন। বুঝলেন স্বরূপতঃ এরা এক জগজ্জননীর অংশ। এদের আত্মা মোহ ও অবিচার দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে আছে বলেই এরা এই সব করছে।

অনুকূলচন্দ্রের কথা শুনে এবং তাঁর চোখ মুখের ভাব থেকে অদ্ভুত এক ভাবান্তর এল বারবণিতাদের মনে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ লজ্জায় পালিয়ে গেল। কারো কারো মনে সত্যি সত্যিই মাতৃভাব জাগল এবং এতদিনের পাপকর্মের জন্য এক তীব্র অনুশোচনায় ফেটে পড়ল তাদের অন্তরাত্মা। কাঁদতে কাঁদতে লুকিয়ে পড়ল তারা অনুকূলচন্দ্রের পায়ে। যে যুবকগুলি চক্রান্ত করে এই হীন কাজে তাদের লিপ্ত করেছিল তাদের অপমান করে তাড়িয়ে দিল।

মেয়েদের মধ্যে যে প্রধান বারবণিতা অর্থাৎ সেই বাড়ির মালিক, সে অনুতপ্ত হৃদয়ে বার বার ক্ষমা চাইল অনুকূলচন্দ্রের কাছে। কুশাসন আনিয়ে বসতে দিল। কিন্তু তিনি আর বসলেন না। তখন সেই প্রধান বারবণিতাটি বলল, বাবা, আজ হতে আমি আপনার ধর্ম-মা আর আপনি আমার ধর্ম ছেলে। আমি প্রতিজ্ঞা করছি, আজ হতে এই বেশাবৃত্তি চিরদিনের মত ত্যাগ করলাম। আমার সব টাকা পয়সা ধনসম্পত্তি গ্রহণ করে আমায় উদ্ধার করুন।

অনুকূলচন্দ্র মনে মনে প্রীত হয়ে বললেন, আমি তোমার কোন সম্পত্তিই গ্রহণ করব না। তুমি তোমার সম্পত্তি গরীব-দুঃখীদের দান করে সৎপথ অবলম্বন কর।

সেদিনকার অভিজ্ঞতায় অনুকূলচন্দ্র নূতন করে উপলব্ধি করলেন, সব মানুষেরই আত্মা এক এবং নিত্যশুদ্ধ। বাইরের বিবিধ প্রভাবে ও প্রলোভনে মানুষ সাময়িকভাবে পাপকর্মে জড়িয়ে পড়লেও উপযুক্ত সংসঙ্গ পেলে আবার ভাল হয়ে উঠতে পারে সে মানুষ।

ডাক্তারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে বাড়ি ফিরে এলেন অনুকূলচন্দ্র। এবার ডাক্তারী ব্যবসায় শুরু করতে হবে। স্বপ্নদিনের মধ্যেই এ বিষয়ে তাঁর দক্ষতা প্রমাণিত হয়ে গেল। টাকা পয়সাও আসতে লাগল। কিন্তু সেদিকে তাঁর কোন খেয়াল নেই। রোগী দেখতে গিয়ে টাকা চান না কারো কাছে। ওষুধ দিয়েও দাম চান না। সাধ্য মতো খুশি মত যে যা দিয়ে যায় তাই তিনি সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করেন। গরীব দুঃখীদের প্রতি তাঁর দয়া দাক্ষিণ্যের অন্ত নেই তাঁর। গরীব রোগী পেলেই শুধু বিনা পয়সাতে তার চিকিৎসা করতেন না, তার পথ্যের খরচ পর্যন্ত যোগাতেন যতদিন না সে রোগী ভাল হয়।

সবাই ধন্য ধন্য করতে লাগল। বলাবলি করতে লাগল, অনুকূল ডাক্তার যেন গরীবের মা-বাপ। কেউ কেউ বলল, এত দয়া মায়া দেখাতে গেলে ডাক্তারি চলবে কী করে।

অনুকূলচন্দ্র বললেন, না চলে না চলুক। তবু আমি মানুষের দুঃখ দেখে চুপ করে থাকতে পারব না।

আসলে যেন এটা ডাক্তারি ব্যবসা নয়। ডাক্তারি ব্যবসার নামে আর্ত মানুষের সেবা করাই যেন আসল উদ্দেশ্য অনুকূলচন্দ্রের।

অনুকূলচন্দ্র তখন পূর্ণ ষোঁবনে পড়েছেন। এবার মা মনোমোহিনী তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র অনুকূলচন্দ্রের পূর্ণ দীক্ষা ও প্রণালীবদ্ধ সাধনার প্রতি সচেতন হয়ে উঠলেন। তাঁর মনে পড়ল, অনুকূলচন্দ্র যখন নিতান্ত শিশু ছিলেন, যখন ভাল করে কথা বলতে শেখেননি তখন তিনি তাঁর কানে স্বপ্নযোগে প্রাপ্ত দীক্ষামন্ত্র দান করেছিলেন। তিনি নিজে বালিকা অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণের নিকট বহু দিন ধরে কাতরভাবে প্রার্থনা করে এই মন্ত্র স্বপ্নযোগে পেয়েছিলেন।

সে মন্ত্রের মর্ম তখন বুঝতে পারেননি শিশু অনুকূলচন্দ্র। না বুঝেই শুধু সত্যনামের কয়েকটি কথা মুখস্থ করে ফেলেছিলেন। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই নাম জপ করার ইচ্ছাও তাঁর বেড়ে যায়। কিন্তু এখন সেই নামের প্রকৃত মর্ম ও মহিমা উপলব্ধি করা দরকার।

কোন এক ভাল দিন দেখে মা আবার দীক্ষা দিলেন অনুকূলচন্দ্রকে। যে বীজ বপনের জন্য চিত্তভূমি বহুদিন হতে প্রস্তুত হয়ে ছিল, আজ সেই মহামন্ত্র বীজ উগ্ৰ হলো। সে দিন কিন্তু মা বা স্বয়ং অনুকূলচন্দ্র কেউ ভাবতে পারেননি, এই মন্ত্রবীজ, ক্রমে অগণিত ও শাখা প্রশাখায় পল্লবিত হয়ে অদূর ভবিষ্যতে এমন এক বিরাট মহীরুহে পরিণত হবে যার ছায়াশীতল বিশাল কোলে অজস্র ত্রিতাপজ্বালা জর্জরিত মানুষ পরম শান্তি লাভ করবে।

সেই দীক্ষাপ্রাপ্তির ক্ষণটি এক স্মরণীয় ঘটনা হয়ে আছে অনুকূল চন্দ্রের জীবনে। দীক্ষামন্ত্র নতুন করে কর্ণকুহরের ভিতর দিয়ে মর্মে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে এক আশ্চর্য শিহরণ খেলে গেল তাঁর সর্বাত্মে। মনে হলো, এক তীব্র জ্যোতিপুঞ্জ তাঁর বিহ্বল বিবশ শরীরাত্যন্তরে অনুপ্রবিষ্ট হলো।

এই দীক্ষাগ্রহণের সঙ্গে আর একটি আশ্চর্য ঘটনা জড়িয়ে আছে। এই দীক্ষা মা তাঁকে দান করলেও আসলে পশ্চিমের এক মহা সিদ্ধ-পুরুষের নির্দেশ অনুসারেই দীক্ষা দান করেন। এই মহাপুরুষকে কখনো দেখেননি অনুকূলচন্দ্র। দীক্ষাপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মনে হলো এক তীব্র জ্যোতিপুঞ্জের সঙ্গে একজন মহাপুরুষ তাঁর মধ্যে প্রবেশ করলেন। পরে তাঁর ছবি দেখে চিনতে পারলেন, ইনিই সেই মহাপুরুষ।

কিছুদিন পর খবর এলো, দীক্ষাপ্রাপ্তির মুহূর্তটিতেই সেই মহাপুরুষ মরদেহ ত্যাগ করেন।

দীক্ষা গ্রহণের পর এক বিরাট পরিবর্তন এল অনুকূলচন্দ্রের জীবনে। চিকিৎসা কাজে আর কোন মতেই মন বসাতে পারলেন না। শুধু ডাক্তারি নয়। কোন কাজই করতে পারেন না। কেবলি নামের কথা মনে পড়ে আর সঙ্গে সঙ্গে গৌরাজ মহাপ্রভুর মত শ্বেদ-কম্পন প্রভৃতি অষ্ট সাত্ত্বিক ভাববিকার দেখা দেয় দেহে। ঠিক যেন দিব্যোন্মাদের মত অবস্থা, সংসারে মন নেই। কারো প্রতি কোন আসক্তি নেই।

তঁার এই ভাবান্তর দেখে নানা জনে নানা কথা বলতে লাগল। কারণ সাধারণ মানুষ বা সাধকের মধ্যে এ ভাব দেখা যায় না। কেউ কেউ বলল, গোপনে হয়ত মদ খেতে শুরু করেছে। কিন্তু কিসে কী হচ্ছে সে-কথা একমাত্র মা মনোমোহিনী ছাড়া আর কেউ জানেন না।

ডাক্তারি করতে আর ইচ্ছা নেই। তিনি ডাক্তারি ছাড়তে চান। কিন্তু লোকে তাঁকে ছাড়তে চায় না। রোগীর পর রোগী আসতে থাকে। তারা তাদের প্রিয় অনুকূল ডাক্তারকে না দেখিয়ে ছাড়বে না। দুই একজন রোগীদের নিষেধ করতে থাকে, যে ডাক্তার ভাবে বিভোর হয়ে থাকে সব সময়, কী ওষুধ দিতে কী দিয়ে দেবে তাকে না দেখানোই ভাল।

রোগীদের বিশ্বাস তবু একটুও টলে না। তাদের কথা, মরি মরব বাঁচি বাঁচব, তবু ওঁকে ছাড়ব না।

একদিন সত্যি সত্যিই এক রোগীকে ভুল ওষুধ দিয়ে দিলেন। শুধু ভুল ওষুধ নয়। সাংঘাতিক বিষমাত্রার এক পুরিয়া। রোগীর বাড়ির লোক ওষুধ নিয়ে চলে যাবার অনেকক্ষণ পর তঁার মনে পড়ল, তিনি কী ওষুধ দিয়েছেন। ওষুধ দেবার সময় তিনি নামজপে বিভোর হয়ে ছিলেন।

কথাটা তিনি চেপে রাখলেন না। উপস্থিত সবাইকে তিনি বললেন। শুনে সবাই বলল, আর সময় নেই, এতক্ষণ রোগীকে সে ওষুধ খাওয়ানো হয়ে গেছে। লোকটা নির্ধাৎ মারা যাবে।

অনুকূলচন্দ্র কিন্তু এতটুকু বিচলিত হলেন না। ধীর শান্তকণ্ঠে বললেন, পরমপিতা নিশ্চয়ই রক্ষা করবেন। তিনি যদি রক্ষা করেন তাহলে কিছুতেই কিছু হবে না।

এই সব কথাবার্তা হচ্ছে, এমন সময় রোগীর বাড়ি হতে খবর এল রোগীকে সে ওষুধ খাওয়ানো হয়নি। ওষুধ অসাবধানে পড়ে গেছে হাত থেকে।

সকলে আশ্চর্য হয়ে গেল। অনুকূলচন্দ্র স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন।

তারপর থেকেই চিকিৎসায় বিশেষ পারদর্শিতা দেখাতে লাগলেন অনুকূলচন্দ্র। যেন এক অলৌকিক শক্তিবলে রোগ নিরাময় করছেন রোগীদের। রোগ যত কঠিনই হোক না কেন, যেন তাঁর কাছে কিছুই নয়। শান্ত ধীর মাথায় ব্যবস্থাপত্র লিখে দেন। যা ওষুধ দেন তাই অব্যর্থ কাজ করে।

কিন্তু মানুষের দৈহিক রোগ সারানোর কাজ আর একেবারেই ভাল লাগল না অনুকূলচন্দ্রের। তাঁর কেবলি মনে হতে লাগল না, দেশের বেশীর ভাগ মানুষ এক দূরারোগ্য ব্যাধির দ্বারা আক্রান্ত ও আচ্ছন্ন হয়ে আছে। স্তবরাং সেই ব্যাধিকে নিরাময় করে আত্মাকে উদ্ধার করাই প্রকৃত কাজের মত কাজ। এই ব্যাধি সারাবার একমাত্র উপায় নামগানে উদ্ধৃদ্ধ করে তোলা।

এই সময় প্রায় সর্বদাই তিনি এক দিব্যভাবে বিভোর হয়ে থাকতেন। খেতে খেতেই কখনো নামগান গেয়ে বসতেন। অনেক সময় খেতে খেতে তন্ময় হয়ে কী ভাবতেন। তারপর গায়ে হাত দিয়ে কেউ ঠেলা দিতেই তাঁর হুঁস হত।

এই সময় সর্বজীবে ও সর্ববস্তুতে ব্রহ্মজ্ঞান হতে লাগল তাঁর। তাঁর মনে হতে লাগল, এই জগতে সব কিছুই ব্রহ্মময়। সব কিছুই সমান। ভেদ বলে কোন জিনিস নেই কোন কিছুতে। তাঁর সংবেদন ও অনুভূতিশক্তি ক্রমশঃ ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হতে লাগল দিনে দিনে। কারো কোন দুঃখ চোখে দেখতে পারল না। বড় ব্যথা লাগে প্রাণে। তাঁর সামনে কেউ কখনো কোন মানুষ বা পশু পাখির দেহে আঘাত করলে তিনি অতিশয় দুঃখ অনুভব করতেন। নিজের দেহে অনুরূপ আঘাত বোধ করতেন তিনি। সমবেদনায় এমনভাবে বিগলিত হয়ে উঠত তাঁর সমগ্র অন্তর যে তিনি আকুল হয়ে কাঁদতে থাকতেন। অনেক সময় অনেকেই তাঁকে কাঁদতে দেখেছে। এমন কি তাঁর সামনে

কোন গাছ কাটলে বা গাছের পাতা ছিঁড়লেও অত্যন্ত ব্যথা পেতেন।
ঐসবের ফলে গাছের গায়ে যে পরিমাণ যত্নগা হয় তিনিও সেই পরিমাণ
যত্নগা নিজের দেহে অনুভব করতেন।

পরের দুঃখে বা আঘাতে শুধু দুঃখ বা সমবেদনা অনুভব করলেই
হবে না। সেই সেই দুঃখের আগুল প্রতিকার করতে হবে। কেউ
কাউকে ষাতে দুঃখ না দেয়। কেউ কাউকে ষাতে আঘাত না করে তাঁর
ব্যবস্থা করতে হবে। এজন্তু চাই আমাদের মানুষদের চরিত্রের
পরিবর্তন সাধন। অনুকূলচন্দ্র দেখলেন, তাঁর গাঁয়ের বেশীর ভাগ
যুবকই দুঃচরিত্র। তারা মদ খায়। পরস্পর প্রতি লোভ করে, তাদের
সতীত্ব হানির চেষ্টা করে। ঈশ্বরে কোন ভক্তি বা বিশ্বাস নেই
তাদের।

তাদের কথা ভেবে ভেবে অতিশয় চিন্তিত হয়ে পড়তেন তিনি।
তিনি ভেবে ঠিক করলেন, তাদের কাজে সরাসরি বাধা দিয়ে উপদেশ
দিলে চলবে না। অরণ্যে রোদনের মতই তার ফল ব্যর্থ হতে বাধ্য।
উপযুক্ত ক্ষেত্র না হলে সেখানে কাজ সফল হতে পারে না। তার
চেয়ে আগে তাদের সঙ্গে মিশে তাদের আপন করে নিতে হবে।

পাপী বলে তাদের কিছুমাত্র ঘৃণা না করে সমস্ত আত্মাভিমান ত্যাগ
করে গাঁয়ের যুবকদের সঙ্গে সহজ ভাবে মিশতে লাগলেন অনুকূলচন্দ্র।
অল্পদিনের মধ্যেই তারা তাদের আপন জন বলে ভাবতে লাগল
তাঁকে। যদিও তিনি তাদের কোন কাজে নিজেকে কোনরূপে জড়িয়ে
ফেলতেন না কখনো। মাঝে মাঝে সময় বুঝে কিছু কিছু নীতি
উপদেশ দান করে সংশোধনের চেষ্টা করতেন তাদের।

একদিন অন্ধকার রাত্রিতে একদল যুবক অবৈধ প্রণয়ে আসক্ত
হয়ে অভিসারে যাচ্ছিল। ব্যাপারটি বুঝতে পেরে অনুকূলচন্দ্রও
তাদের সঙ্গ নিলেন। তাঁর আসল উদ্দেশ্য তারা তখনো বুঝতে
পারেনি। অবশেষে গন্তব্য স্থানের কাছাকাছি এসে সকলকে হঠাৎ
থামিয়ে তিনি বললেন, তোমরা একবার দাঁড়াও। আমার একটা বক্তব্য

আছে ; দয়া করে শোন । আমরা ঘোর অন্ধকার রাত্রিতে মাঠ ও জঙ্গলের পথ দিয়ে এসেছি আবার সেই পথ দিয়েই যেতে হবে । এতে আমাদের কত বিপদ হতে পারে । কোন লোকে আক্রমণ করতে পারে, সাপেও কামড়াতে পারে, তাছাড়া মশার কামড় তো আছেই । মনে হচ্ছে, আমরা যেন আমাদের জীবনের মায়া ত্যাগ করেই এ-কাজে প্রবৃত্ত হয়েছি । মানুষ সাধারণতঃ জীবনের মায়া ত্যাগ করে শত দুঃখ কষ্ট স্বীকার করে কোন মহান কাজেই ব্রতী হয় । কিন্তু আমরা যে-কাজে বার হয়েছি তার কথা একবার ভেবে দেখেছ কি ? এই কাজ কি এতই বড় যে এর কাছে জীবনের মায়া ও মান মর্যাদা সব তুচ্ছ ? আমার তো মনে হয়, অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে যে-কাজ আমরা করতে এসেছি তা অত্যন্ত হীন পাপকাজ । আর একটা কথা ভেবে দেখ, আজ যারা পরদ্বী হরণ করতে এসেছে তাদের বাড়িতেও দ্বীলোক আছেন । কোন দুর্ভ লোক যদি সুযোগ বুঝে সেই দ্বীলোকদের সতীত্ব হরণ করতে যায়, তাহলে তাঁদের কীরকম অবস্থা হবে, তাঁরা কেমন করে লোকসমাজে মুখ দেখাবেন ?

অনুকূলচন্দ্রের এই আন্তরিকতাপূর্ণ কথাগুলি তাদের মর্ম স্পর্শ করল । নিজের ভুল বুঝতে পেরে অনুতপ্ত হলো তারা । সঙ্গে সঙ্গে তারা বুঝতে পারল অনুকূলচন্দ্রের মহান উদ্দেশ্যের কথা । আসলে তিনি তাদের এই হীন কাজের শরিক হয়ে তাদের সঙ্গে আসেননি । তিনি এসেছেন এই হীন কাজ হতে তাদের প্রতিনিবৃত্ত করে তাদের উদ্ধার করতে । তাদের একে একে মনে পড়ল, এর আগেও তিনি তাদের সঙ্গে মিশে তাদের কত অমূল্য উপদেশ দিয়েছেন । তাঁরা বুঝতে পারেন, আসলে অনুকূলচন্দ্র ছাইচাপা এক আগুন । সাধারণ মানুষের ছদ্মরূপধারী এক মহাপুরুষ পাপীতাপীদের উদ্ধারের জন্ত অনবরত চেষ্টা করে বেড়াচ্ছেন ।

কিন্তু অনুকূলচন্দ্র দেখলেন শুধু, লোকের সঙ্গে মিশে এবং দুটো নীতি উপদেশ দিয়ে বিশেষ কোন ফল হবে না । তাতে দু-চারটে

লোকের চরিত্রের সংশোধন হতে পারে, কিন্তু সমাজের সাধারণ জনগণের কোন বৃহত্তর কল্যাণ হবে না। তাই হরিনামের ব্যাপক প্রচারের জন্য তিনি এবার মনে-প্রাণে খাটতে লাগলেন। আশপাশ গাঁয়ে যেখানেই কীর্তন হয় সেখানেই তিনি ছুটে গিয়ে তাতে যোগ দেন। দিব্যভাবে বিভোর হয়ে উন্নত নৃত্য শুরু করে দেন। অনেক সময় গৌরাঙ্গদেবের মত স্বেদ, কম্পন প্রভৃতি সাত্ত্বিক ভাব-বিকারও দেখা দেয় তাঁর দেহে। তাঁর ভাববিহ্বল অবস্থা দেখে কীর্তনের উদ্যোক্তারা আশ্চর্য হয়ে যান। উৎসাহিত হন বিশেষভাবে। তাঁদের দেখে এখানে সেখানে আরও কীর্তনের দল গড়ে ওঠে।

অনুকূলচন্দ্রের কিন্তু কোন বাহুবিচার নেই। যেখানেই কীর্তন সেখানেই শ্রীহরি। নামের মধ্যেই আছেন নামী। নামের থেকে নামী কখনো পৃথক থাকতে পারেন না। তাই যেখানেই কীর্তন সেখানেই গিয়ে যোগ দেন তিনি। তাঁর সঙ্গে অনেক যুবকও যোগদান করতে লাগল। কীর্তনকালে তাঁর ভাববিকার দেখে অনেকেই বুঝতে পারেন, তিনি একজন সাধারণ ভক্ত নন; তিনি অলৌকিক অতিমানবিক শক্তির অধিকারী। তাই এবার থেকে তাঁর কথা অকাট্য বলে শ্রদ্ধার সঙ্গে অনেকেই মেনে চলতে লাগল।

অনুকূলচন্দ্র একদিন কীর্তনের ছোট ছোট দলগুলিকে একটি বিরাট দলে পরিণত করলেন। কেউ বাধা দিল না তাঁর কাজে। বরং আনন্দের সঙ্গে মেনে নিল তাঁর এই ব্যবস্থা। এইভাবে শুধু তাঁর নিজের গাঁয়ে নয়, চারিপাশের গাঁগুলিতেও কীর্তনের দল গড়ে উঠল। রোজ সন্ধ্যা হতে না-হতেই হরিনাম সংকীর্তনের ধ্বনিতে আকাশ বাতাস মুখরিত হয়ে উঠতে লাগল।

চারিদিকে শুধু হরিনাম আর হরিনাম। হরিনামের কোন স্থান-কাল নেই। বাঘ বাজনার কোন প্রয়োজন নেই। শুধু অন্তরের ভক্তি হলেই যথেষ্ট। তাই দেখা যেতে লাগল যখন-তখন যেখানে-সেখানে যে-সে হরিনাম গাইছে। বাড়ির মেয়েরা কাজ করতে করতে

গাইছে হরিনাম, চাষীরা মাঠে চাষ করতে করতে গাইছে হরিনাম, জেলেরা নদীতে মাছ ধরতে ধরতে করছে হরিনাম। অনুকূলচন্দ্রের আনন্দ আর ধরে না। এতদিনে তাঁর স্বপ্ন তাঁর সাধনা সার্থক হতে চলেছে।

একদিন বিহারীলাল হালদার নামে একটি লোক তার একজন আত্মীয়ের সঙ্গে নৌকায় করে মাছ ধরতে গিয়েছে। আপন মনে হরিনাম করছিল বিহারী। কীর্তন করতে করতে ভাবে বিভোর হয়ে নৌকো হতে নদীর জলে পড়ে গেল। তার সঙ্গী মনে করল, ভণ্ডামি করে জলে ডুব দিয়েছে বিহারী। তাই সে নিশ্চিন্তে তামাক খেতে লাগল। কিন্তু অনেকক্ষণ কেটে গেলেও বিহারী উঠল না দেখে সে তখন একটি বাঁশ দিয়ে খোঁজ করে জলের ভিতর থেকে অতি কষ্টে তুলল বিহারীকে।

বাহুজ্ঞান ফিরে পেয়ে বিহারী তার সঙ্গীকে বলল, তুমি আমার গোটা শরীর কাপড় ভিজিয়ে দিলে কেন?

তার সঙ্গী তখন সব কথা বললে বিশ্বাসে অবাক হয়ে গেল বিহারী। এ-কথা শুনে সবাই আশ্চর্য হয়ে গেল। সবাই বুঝতে পারল, এ শুধু নামকীর্তনের মহিমা এবং অলৌকিক শক্তিবলেই সম্ভব।

ঠাকুর, আমাদের দিকে মুখ তুলে একবার চাও। আমাদের সব-রকমের পাপ-তাপ থেকে উদ্ধার কর। আমাদের পথ বলে দাও।

প্রতিদিন অজস্র ভক্ত দলে দলে ছুটে আসতে লাগল ঠাকুরের কাছে। অনুকূলচন্দ্রকে এবার থেকে ঠাকুর বলে ডাকতে লাগল সবাই। আর নিজেকে চেপে বা ঢেকে রাখতে পারলেন না তিনি। তাঁর মহান আত্মার অলৌকিক সুরভি আপনা হতেই ছড়িয়ে পড়তে লাগল দিকে দিকে, দূর দূরান্তে। অবশেষে দীক্ষাগুরুরূপে অবতীর্ণ হতে হলো তাঁকে অজস্র মুমুক্শু ভক্তের সামনে।

দেখতে দেখতে সৎসঙ্গ নামে এক বিরাট ধর্মপ্রতিষ্ঠান গড়ে উঠল

পথের ধারে, ঠাকুরের বসতবাড়িকে কেন্দ্র করে। পাবনায় ঠাকুরের পৈত্রিক বাড়ির দুশো হাত দূরে গড়ে উঠল অনেকগুলো ঘর। ঠাকুরের শোবার ঘরের পাশেই হলো তাঁর প্রধান ভক্তের টিনের ঘর। তারপর পাঠাগার, ভক্তঅতিথি অভ্যাগতদের থাকবার ঘর, হোমিওপ্যাথি ও এ্যালোপ্যাথি ঔষধালয়, একটি মন্দির আর তার দুপাশে দুটি ঘর। ঘরগুলির সামনে মনোরম বাগান। ইহাই সংসঙ্গ অনেকে বলত আশ্রম। রোজ শত শত লোক এসে আহার বিশ্রাম পেত। সেখানে সব সময় সাধন ভজন ও আধ্যাত্মিক আলোচনা চলত ভক্ত ও শিষ্যদের মধ্যে সেখানে তপোবন নামে একটি আদর্শ বিদ্যালয়ও স্থাপিত হয়।

এই সময় অনেক জায়গায় বহু নরনারী ধাঁরা কখনো ঠাকুরকে দর্শন করেননি বা তাঁর নামধামের কথা শোনেননি তাঁরাও স্বপ্নযোগে ঠাকুরের দর্শন পান এবং তাঁর প্রচারিত সাধন-প্রণালীর নির্দেশ পান। এই স্বপ্ন দর্শনের পর তাঁরা ছুটে এসে ঠাকুরের চরণে আশ্রয় নিয়েছেন। কেউ কেউ আবার নিজ ইচ্ছামূর্তি ধ্যান করবার সময় সেই ইচ্ছামূর্তির জায়গায় একটি মানুষের মূর্তি দেখতে পান। পরে খোঁজ করে ঠাকুরের ছবি দেখতে বা চিনতে পারেন ইনিই সেই আশ্চর্য মহাপুরুষ। তারপর তাঁর সাক্ষাৎ দর্শন লাভ করে ধন্য হন তাঁরা।

যেসব ভক্ত দূর-দূরান্ত থেকে ঠাকুরের দর্শনলাভের জন্য আকুল-ভাবে প্রার্থনা করেন, ঠাকুর তাঁদের স্বশরীরে দর্শন দান করেন।

একদিন নদীয়া জেলার অন্তর্গত আমলাবাড়ি গাঁয়ের ললিতমোহন বসু অন্ধকার রাত্রিতে অণু একটি গাঁ হতে একা বাড়ি ফিরছিলেন। বিশাল প্রান্তরের মধ্য দিয়ে অন্ধকারে পথ চলতে চলতে নানারকমের ভয় হতে লাগল তাঁর। ভীত হয়ে ঠাকুরকে স্মরণ করতেই তিনি দেখলেন ঠাকুর সশরীরে তাঁর সামনে উপস্থিত হয়ে তাঁকে বললেন, চল ভয় কি, আমি তোমার সঙ্গে তোমার বাড়ি পর্যন্ত যাচ্ছি।

পাক্ষা এক মাইল দুজনে কথা বলতে বলতে যাবার পর

ললিতমোহনবাবু বাড়ি পৌঁছতেই ঠাকুর অন্তর্হিত হয়ে পড়লেন।
বিস্ময়ে আনন্দে কেমন যেন বিহ্বল ও বিমূঢ় হয়ে পড়লেন ললিতবাবু।

কুষ্ঠিয়ার অন্তর্গত কমলাপুর গাঁয়ের গিরীন্দ্রভূষণ বিশ্বাস একদিন
তঁার দোতলার ঘরে দরজা বন্ধ করে প্রার্থনা করতে করতে ঠাকুরের
দর্শন লাভের জগ্ন আকুলভাবে কঁাদতে লাগলেন। তিন-চার ঘণ্টা
এইভাবে কঁাদবার পর ঠাকুর সশরীরে আবির্ভূত হলেন তঁার সামনে।
তার সঙ্গে কিছু কথা বললেন। তারপর সহসা অন্তর্হিত হলেন।
গিরীনবাবুর একজন আত্মীয়াও একদিন দিনের বেলায় ঘরের মধ্যে
ঠাকুরের দর্শন লাভ করেন। ঠাকুর তঁকে সত্যনাম গ্রহণ করতে
বলেন।

একমাত্র ব্যাপ্তিরূপ যোগবিভূতি বলেই সিদ্ধ সাধকেরা যুগপৎ
বহুস্থানে অবস্থান করতে পারেন। ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রও একই সঙ্গে
বিভিন্ন স্থানে স্থূলদেহে অবস্থান করে শিষ্যদের বিপদ ও বিপথ হতে
উদ্ধার করতেন।

১৯২২ সালের মে মাস। মৈমনসিং জেলার অন্তর্গত মুক্তাগাছার
উচ্চ-ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান-শিক্ষক সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত একদিন
তঁার ঘরে হারমোনিয়াম বাজিয়ে কবি জয়দেব রচিত ‘রতিসুখসারে
গতমভিসারে’ গানটি গাইতে শুরু করেছেন। এমন সময় তিনি দেখলেন
ঠাকুরের মূর্তিটিকে তিনি যেন পদদলিত করে অপমানিত করছেন।
চমকে উঠে গান থামিয়ে ব্যাপারটা ভাবতে লাগলেন সুরেনবাবু।
গান থামানোর সঙ্গে সঙ্গে মূর্তিটি অন্তর্হিত হয়ে পড়েছে কোথায়। তিনি
তখন ভাবলেন, তিনি তো ঠাকুরকে স্বপ্নেও কোনদিন অশ্রদ্ধা করেননি;
তঁার প্রতি শ্রদ্ধাভক্তির অভাব হয়নি কখনো। তবে কেন তিনি এই
দৃশ্য দেখলেন, তা কিছুতেই বুঝে উঠতে পারলেন না। তবে কি কোন
অপরাধ করেছেন তিনি?

এইরকম ভাবতে ভাবতে আবার হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান শুরু
করতেই আবার ঠাকুরের মূর্তি সেই অবস্থায় দেখতে পেলেন। সঙ্গে

সঙ্গে গান বাজনা থামিয়ে দিতেই মূর্তিটিও অদৃশ্য হয়ে গেল। এবারও ভেবে কিছু খুঁজে পেলেন না। তখন মনের ভুল ভেবে আবার গান বাজনা শুরু করতেই আবার সেই মূর্তি দেখলেন। এই নিয়ে তিনবার হলো। তখন সুরেনবাবু ভাবলেন, নিশ্চয় এই গান গাওয়াতে ঠাকুরের কোন আপত্তি আছে। তিনি কাতরকণ্ঠে ঠাকুরের উদ্দেশে বললেন, হে ঠাকুর, আমি তো তোমায় গভীরভাবে শ্রদ্ধা করি।

সঙ্গে সঙ্গে কোথা হতে এক অলৌকিক কণ্ঠের উত্তর শোনা গেল, হ্যাঁ কর।

সুরেনবাবু তখন বললেন, তবে কোন্ পাপে আমার এই শাস্তি ?

কিন্তু আর কোন উত্তর পেলেন না। তখন সুরেনবাবু বুঝলেন, এই গানটি করা তাঁর পক্ষে উচিত নয়। কারণ তিনি বিপন্নিক। এই আদিসাত্ত্বিক গান মনের মধ্যে বিকার সৃষ্টি করতে পারে।

তখন ঠাকুর ছিলেন হিমাইতপুরে। কিছুদিনের মধ্যে সুরেনবাবু হিমাইতপুরে গিয়ে ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা ঠাকুর, জয়দেবের গান গাওয়া আমার পক্ষে কি অনুচিত ?

ঠাকুর তখন বললেন, না করাই ভাল। ওই গান সব অবস্থার জন্য নয়। এমন গান গাওয়া উচিত যাতে কোন আদিসের গন্ধ নেই, অথচ ঈশ্বর বিরহের উচ্চভাব আছে।

এই ঘটনার কথাটি লিখতে গিয়ে সুরেনবাবু মন্তব্য করেছিলেন, বিপথে গেলে যিনি বহুদূর হতে আমাদের সাবধান করেন, কিছুতেই ভ্রমসংকুল পথে যেতে দেন না, তাঁকে আমি কী বলব ? এমন করুণাময় পুরুষকে শ্রীগুরু, প্রাণের বন্ধু, না অন্তর্যামী ভগবান, না আমার সর্গস্ব, কী বলব ?

১৩২৭ সালে চন্দন সিং নামে একজন পাঞ্জাবী শিখ ঠাকুরের কাছে সত্যনাম গ্রহণ করে প্রণালীমতে সাধনা করতে শেখে। একদিন জ্যোৎস্না রাতে সে প্রস্রাব করতে বসে সহসা দেখতে পায়, ঠাকুর তার সামনে দাঁড়িয়ে। অত্যন্ত ব্যস্ত ও লজ্জিত হয়ে সঙ্গে সঙ্গে প্রস্রাব

বন্ধ করে অগ্ন জায়গায় চলে যায়। কিন্তু যেখানে যায় যেদিকেই দৃষ্টিপাত করে সেইখানেই ঠাকুরকে দেখতে পায়। পদ্মানদীর জলে ও বালুচরে, গাছে ও লতাপাতায়, আকাশে, মাটিতে, বনে-জঙ্গলে সর্বত্রই ঠাকুর যেন সশরীরে উপস্থিত।

উন্নত ধরনের বহু ভক্তসাধক ঠাকুরের কাছে আকুল হয়ে সরল প্রাণে যারা ছুটে আসেন তাঁরা ঠাকুরের দেহে আপন আপন অভীষ্ট দেবতার মূর্তি দর্শন করে আশ্চর্য হন। শাক্তগণ তাঁর মধ্যে কালীমূর্তি দেখেন। বৈষ্ণবগণ দেখেন শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীগৌরান্ধমূর্তি। সন্ত ভক্তগণ পূর্ণ মস্তস্ত্রের চিহ্ন খুঁজে পান তার মধ্যে। এইজন্য অনেক ভক্ত বলতে থাকেন, হে ঠাকুর, একাধারে তুমি সব এবং সর্বাভীত।

এই সময় ঠাকুরের অনেক আশ্চর্যজনক অন্তর্যামীত্বের পরিচয় পাওয়া যায়।

একদিন সতীশচন্দ্র গোস্বামী নামে এক পরম ভক্ত অগ্ন একজন ভক্তের কাছে বললেন, কোন এক জায়গায় তিনি পরম নিষ্ঠার সঙ্গে আকুল প্রাণে ঠাকুরকে ভোগ নিবেদন করে দেখেছেন, ঠাকুর দূর থেকে তা জানতে পেরেছেন এবং স্থূলদেহে সেইখানে উপস্থিত হয়ে সেই নিবেদিত ভোগ গ্রহণ করেছেন।

তখন অগ্ন ভক্তটি বললেন, ঠাকুর যে অন্তর্যামী তার পরিচয় আমি পেয়েছি। তবে এইভাবে ঠাকুরকে দেখতে আমার বড় ইচ্ছা হচ্ছে। আপনি একদিন ভোগ নিবেদন করে ঠাকুরকে আকর্ষণ করে এখানে এনে ভোজন করিয়ে দেখিয়ে আমাদের ধন্য করুন।

গোস্বামী প্রভু বললেন, আমাকে যদি কীর্তনে পাগল করে দিতে পারেন আর সেই অবস্থায় আমাকে দিয়ে ভোগ নিবেদন করিয়ে নিতে পারেন তাহলেই তা হতে পারে।

একদিন তাই হলো। সন্ধ্যা হতেই কীর্তন চলতে লাগল আর সেই কীর্তনে একেবারে মেতে উঠলেন গোস্বামীপ্রভু। ভোগ নিবেদন করা হলো। তারপর প্রায় দু' ঘণ্টা কেটে গেল। তবু ঠাকুর

এলেন না। নিবেদিত ভোগও গ্রহণ করলেন না। তখন অত্যাগত ভক্তরা অধৈর্য হয়ে বললেন, প্রভু, আপনার ঠাকুরও এলেন না, নিবেদিত ভোগও নিলেন না, এ দিকে আমাদের ক্ষিদে পেয়েছে। আমাদের প্রসাদ দিন।

গোস্বামীপ্রভু তখন বললেন, ঠাকুর যদি না আসেন বা এই ভোগ গ্রহণ না করেন তাহলেও অবিশ্বাস করতে পারব না। বুঝাব, নিশ্চয়ই আমার এই নিবেদনের মধ্যে কোন না কোন ত্রুটি আছে। তবে যাই হোক, এই ভোগের অগ্রভাগ কিছুটা রেখে দিচ্ছি, বাকি আপনারা প্রসাদ হিসেবে গ্রহণ করবেন। আমার একান্ত বিশ্বাস তিনি আসবেন এবং এই ভোগ গ্রহণ করবেন।

তাই করা হলো। ভোগের কিছুটা রেখে দিয়ে বাকি প্রসাদ ভোজন করতে দেয়া হলো। সকলের প্রসাদ খাওয়া শেষ হয়েছে, এমন সময় হঠাৎ কিশোরীমোহন ও আরও দু' তিনজন ভক্ত সঙ্গে করে ঠাকুর স্বয়ং এসে উপস্থিত হলেন এবং সেই নিবেদিত ভোগ গ্রহণ করে সকলকে বিস্মিত প্রীত ও কৃতার্থ করলেন।

তখন মাঘ মাস। রাত্রির প্রায় শেষ। পদ্মা ও গড়াই দুটি নদী পার হয়ে দশ মাইল পথ পায়ে হেঁটে গোস্বামীপ্রভুর এই কুষ্টিয়ার বাড়িতে ঠাকুরের হঠাৎ আসার কোন সম্ভাবনাই ছিল না। এইজন্য সকলেই আশ্চর্য হয়ে গেল। পরে ভক্তদের কাছে জানা গেল, সন্ধ্যা থেকে ঠাকুর সংসঙ্গ-বাড়িতে সকলের সঙ্গে আলোচনা করছিলেন। ক্রমে সাতটা বাজল। এমন সময় হঠাৎ ঠাকুর বললেন, চল, একবার কুষ্টিয়া যাই।

এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই সকলকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। শীতকালের রাতে সাধারণতঃ নদীর ঘাটে খেয়া নৌকা পাওয়া যায় না। কিন্তু সেদিন তাঁরা নদীর ঘাটে এসে দেখলেন, তাঁদের জন্যই খেয়া নৌকা অপেক্ষা করছে। নদী পার হয়ে ঠাকুর এত দ্রুত হাঁটতে লাগলেন যে, অত্যাগত সঙ্গীরা তাঁর কিছুতেই নাগাল নিতে পারছে না। অবশেষে

সঙ্গীগণ উর্ধ্বাশ্বাসে দৌড়তে লাগল। কিন্তু দৌড়েও তাঁকে ধরতে পারল না। জ্যেৎম্না রাত। ঠাকুর তাদের থেকে এত দূরে ছিলেন অথচ আশ্চর্য তারা তাঁকে ঠিক দেখতে পাচ্ছিল। মাঝে মাঝে শুনতে পাচ্ছিল, তিনি ‘আয় আয়’ বলে ডাকছেন।

ডাক্তার অনন্তনাথ রায়ের আত্মহত্যাকালেও অন্তর্যামীত্বের পরিচয় পাওয়া যায় ঠাকুরের। অনন্তনাথ অগ্র মানের অগ্র মতের ভক্ত ছিলেন। কিন্তু সাধক হিসাবে তিনি ছিলেন খুব নিষ্ঠাবান। তাছাড়া ইষ্টদর্শনলাভের বাসনা ছিল তাঁর বড় প্রবল। এই বাসনা দিনে দিনে বাড়তে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে বাড়তে থাকে সাধন-ভজনের কঠোরতা।

ক্রমে ঘর ছেড়ে মঠের মাঝে একটি কুঁড়ে ঘর করে তার মধ্যে এক টানা পাঁচ-ছয় দিন ধরে নিজেকে অবরুদ্ধ রেখে সাধনা করতেন। এই সময়ের মধ্যে নাওয়া খাওয়া কিছুই করতেন না। তারপর একদিন বেড়িয়ে কিছু খেয়ে আবার গিয়ে ঢুকতেন সেই ঘরে।

এইভাবে কিছুকাল সাধনা করার পরও যখন ইষ্টদর্শন হলো না, তখন বড় হতাশ হয়ে পড়লেন অনন্তনাথ। একসময় জীবন ত্যাগের কথাও ভাবলেন। ভাবলেন, এত কঠোর সাধনা করেও যখন কোন ফল হলো না তখন এজীবন রেখে আর লাভ কী? এই ভেবে সেই ঘরটিতে গলায় দড়ি নিয়ে আত্মহত্যার কথা ভাবলেন। কিন্তু সেখানে দড়ি না পেয়ে একটি কাপড়কেই দড়ির মতো করে বাঁশের খুঁটিতে বেঁধে গলায় ফাঁস লাগাবার চেষ্টা করতে লাগলেন। একে জনহীন মাঠ তারপর কুঁড়ের দরজাটি বন্ধ করে দিয়েছেন। সুতরাং তাঁর আত্মহত্যার কাছে কোন দিক হতে কোন বাধা আসবার সম্ভাবনা নেই। তাছাড়া অনন্তনাথ এ বিষয়ে বন্ধপরিকর দৃঢ়সংকল্প। ভগবানের সাক্ষাৎ দর্শন ছাড়া কিছুতেই তিনি প্রতিনিবৃত্ত হবেন না।

এমন সময় হঠাৎ কে যেন দরজাটি ঠেলল। পাতার কুঁড়ের অশঙ্ক দরজা একটি পায়ের আঘাতেই ভেঙ্গে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুর প্রবেশ করলেন। অনন্তনাথের প্রাণত্যাগ করা হোল না। তিনি

কাপড়খানা লুকাবার চেষ্টা করলেন ; কিন্তু পারলেন না । ঠাকুর কাপড়খানাসহ তাঁকে সৎসঙ্গ-বাড়িতে নিয়ে এলেন । পরে অনন্তনাথকে সত্যনাম প্রদান করা হলো । সদগুরু ও সত্যনাম ছাড়া ভগবানের সন্ধান পাওয়া সম্ভব নয় ।

শুধু মানুষ নয়, পশুর দুঃখেও সমানভাবে প্রাণ কাঁদে তাঁর । তাদের প্রাণ বাঁচাবার জন্যও তিনি সমানভাবে চেষ্টা করেন । ঠাকুর কখনই ছাগ-বলি সহ্য করতে পারেন না একবার হিমাইতপুরের সৎসঙ্গ-বাড়ির কাছে শ্মশানভূমিতে এক তান্ত্রিক রাত্রিবেলায় ছাগবলি সহকারে কালীপূজার ব্যবস্থা করে । ছাগশিশুটি চিৎকার করছিল । ঠাকুর তা শুনতে পাওয়ায় তাঁর দুঃখ আরও বেড়ে গেল । ঠাকুর তখন সন্ন্যাসীর কাছে নিজে গিয়ে অনেক অনুন্নয় করলেন । অনেক যুক্তি দেখালেন । কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না । সন্ন্যাসী ভ্রুকুটি করে অত্যন্ত রাগের সঙ্গে বলল, তুমি এখান থেকে চলে যাও ।

তখন ঠাকুরের একজন ভক্ত অনুকূল ব্রহ্মচারী মশায় সন্ন্যাসীকে বললেন, মহাশয়, আজ ছাগের পরিবর্তে আমাকে বলি দেয়া হোক । যদি বলি দিতে হয়, তাহলে নরবলিই তো শ্রেষ্ঠবলি । আমার কেউ নেই, আমার পরমারাধ্য ঠাকুর প্রাণে এত ব্যথা পেলেন, আমি স্বেচ্ছায় আত্মবলি দেব । আপনার যদি কোনরূপ ভয় হয় তাহলে খড়গখানা আমায় দিন ; আমি নিজের হাতেই নিজেকে বলি দেব !

সন্ন্যাসী তাতেও রাজী হলেন না তখন । শ্রীশ্রীজননী এসে ঠাকুরের হাত ধরে সরিয়ে নিয়ে গেলেন । মায়ের আজ্ঞা পালনের জন্য সেখানে থেকে চলে গেলেন বটে, কিন্তু ছাগশিশুটির জন্য তিনি অসহ্য যন্ত্রণা অনুভব করতে লাগলেন । একজায়গায় চুপ করে বসে বা দাঁড়িয়ে থাকতে পারলেন না । ঠাকুরের এই অবস্থা দেখে তার ভক্ত নফরচন্দ্র ঘোষ আর চুপ করে থাকতে পারলেন না । একাই শ্মশানভূমির দিকে এগিয়ে গেলেন ।

এদিকে সেই সন্ন্যাসী এবং আরও প্রায় পঞ্চাশ-ষাট জন লোক ছাগ-

শিশুটিকে ঘিরে পাহারা দিচ্ছে। কিন্তু তাদের সবাইকে অগ্রাহ্য করে নফরচন্দ্র 'জয়গুরু' বলে চিৎকার করে তাদের মাঝখানে বাঁপিয়ে পড়লেন এবং অনায়াসে ছাগশিশুটিকে কোলে করে লাফ দিয়ে চলে এলেন। কী অসীম অলৌকিক শক্তি ভর করেছিল নফরচন্দ্রের দেহে, তিনি তা নিজেই তখন বুঝতে পারেননি। তবে একটা জিনিস স্পষ্ট বুঝতে পারলেন, এ শুধু ঠাকুরের কৃপা আর সত্যনামের মহিমার ফলে সম্ভব হয়েছে।

ঠাকুরের এই ধরনের লীলা এবং মহিমার প্রত্যক্ষ পরিচয় পেয়ে ভক্তরা তাঁকে পুরুষোত্তম বা অবতার বলে মানতে লাগল। ঠাকুর কিন্তু কখনই চাইতেন না যে ভক্তরা তাঁর উপর অবতারত্ব আরোপ করুক। তিনি বলতেন, তোমরা যে পরমপিতার সন্তান আমিও সেই পরমপিতার সন্তান। আমি কাহারও গুরু নহি কেহ আমারও শিষ্য নহে। আমি যা জানি বন্ধুভাবে তাই লোককে বলে থাকি। আমাকে গুরু, ভগবান বা অবতার বললে আমার মনে দুঃখ হয়। আমাকে ভাই, দাদা বা বন্ধু বললে আমি খুশি হই।

সাধারণ অবস্থায় তাঁর অলৌকিকত্ব অস্বীকার করলেও মহাভাব অবস্থায় ভক্তদের প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে অনেক সময় আত্মপ্রকাশ করে ফেলেছেন ঠাকুর। শ্রীগৌরাঙ্গদেব একমাত্র ভাবাবিষ্ট অবস্থা ছাড়া নিজের ভগবৎ সত্তার কথা স্বীকার করেননি। দিব্যভাবের আবেশে বিভোর হয়ে অনেক সময় বলতেন, মুই সেই। একমাত্র সেই অবস্থাতেই তিনি পদস্থাপন করতে পেরেছিলেন শচীমাতার মস্তকে। সমাধির পর যে মহাভাব অবস্থা হয়, সেই মহাভাব অবস্থাতেই অনেক সময় ধরা পড়ে গেছেন ঠাকুর ভক্তদের কাছে।

ঠাকুর মহাভাব অবস্থায় ভাববাণীদ্বারা, আধ্যাত্মিক উচ্চতম তত্ত্ব-লাভের সহজ সরল উপায়গুলির জগতের মঙ্গলের জন্য পুণ্যপুঁথিতে প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর লিখিত অমূল্য উপদেশ সত্যানুসরণ নামে প্রকাশিত। ভক্তদের সঙ্গে তাঁর কথোপকথনগুলিকে বলা হয়

অমিয়বাণী । তাছাড়া তাঁর হাবভাব চালচলন আচারব্যবহার এবং সমস্ত জীব-জন্তু, বৃক্ষলতা ও মানুষের প্রতি তাঁর আচরণ দ্বারাও অনেক আদর্শ শিক্ষা পাওয়া যায় ।

পুণ্যপুঁথির সব উপদেশগুলি ভাব অবস্থার বাণী । মনে হয় পরমাত্মা স্বয়ং ভগবান যেন জীব জগতের উদ্ধারের জন্য এই সব অমূল্য ভাবনাগুলি ব্যক্ত করেছেন । সমাধি অবস্থায় সাধকের চিত্তবৃত্তি স্থির হয় । এই অবস্থায় কোন চিন্তা থাকে না, সুখ-দুঃখ বোধ থাকে না । সমাধির চরমে মানুষের সকল বিশেষত্ব বা ব্যক্তিত্ব লুপ্ত নয় । এই অবস্থায় ঠাকুর প্রথম দিনে বলেন, কীর্তনের একটা শক্তি আছে, জোর করে মনকে উচ্ছেদ নিয়ে যায় । তাই মহাপ্রভুর কীর্তন প্রচার । কীর্তন কর । কীর্তন বড় ভাল জিনিস । জ্ঞানের সঙ্গে ভক্তি থাকাই ভাল । পরমাত্মাকে জিজ্ঞাসা কর, সেও বলে ভক্তিমিশ্রিত জ্ঞান শিক্ষা দিলে নষ্ট হয় না ।...খোঁজ করো অন্তরে তুমি কে ? বাঁধা মা-বাবায় সুখ নেই, মা-বাবা যখন জগৎজোড়া, যখন আমিই পরমাত্মা তখন কত সুখ ।... গুরুর দেওয়া জিনিস দিনে দুই একবার করে করলে তাতে কিছু হয় না । চব্বিশ ঘণ্টা ভাবতে হয় । নিয়ম বেঁধে করতে হয় । মন তৈরি হয় । কিন্তু কীর্তনে মন একবারে তৈরি হয় ।

দ্বিতীয় দিনের ভাববাণীতে বলেছেন, সংসারী সন্ন্যাসী চাই—জঙ্গলের সন্ন্যাসী চাই না—নিতাই চাই ।... ভক্তির থেকে জ্ঞান আরও দরকার, তাতে নষ্ট হয় না । জ্ঞানের সাথে ভক্তি থাকাই ভাল ।

তৃতীয় দিনের ভাববাণীতে বলেছেন, খুব নাম কর । বিভোর হয়ে নাম কর । কলির লয় অতি নিকট । তোদের সব নিয়ে আমি, 'মহা আমি ।...পাপীকে সান্ত্বনা কর, আশ্রয় দে । Spit on and Spurn the sin not the man—the sinner. নাম ও প্রেম সকলকেই জয় করতে পারে । প্রেম জগতের সকল পদার্থই লাভ করতে পারে... প্রেমই স্বর্গ, স্বর্গই প্রেম । প্রত্যেক বস্তুকেই ভালবাস এবং আমার নিকট এস, আমি তোমাকে সকল বস্তু প্রদান করব ।

থাকবি সংসারে মন রাখবি ভগবানে ।... ভগবানের পিছনে ছোট।
শান্তি তোমার পিছনে ছুটবে ।... মন গড়াই যা কষ্ট, তারপর সব
সোজা, কীর্তনে মন গড়ে দেয় ।...প্রত্যেক ধর্মেই ঈশ্বরের ধারণা প্রায়
এক ।

তঁার নামে সব হয়—ধর্ম, অর্থ, কাম । কীর্তনে পাগল হ'লে মন
ভাল হয় । মন ভাল হলে শরীর ভাল হয় । তোরা কামিনীও ছাড়িস
না, কাঞ্চনও ছাড়িস না । সমস্ত দিন মত্ত হয়ে সংসারের কাজ কর,
সন্ধ্যাবেলা ছুটে আয়, পাগল হয়ে কয়েক ঘণ্টা মাত্র কীর্তন কর । একটু
বিশ্বাস, দেখ আমার কত শক্তি । দেখ, আমি মায়ার আবরণ ছিঁড়ে
দিতে পারি কিনা । মহা মহা পাপ আমি মুছে দেব । নামের শক্তি ?
নাম করতে করতে প্রণবে চড়া যায় । নামের উপর উঠলে নাম করতেই
কুলকুণ্ডলিনী জাগরিত হয় ।

সকলকে ভালবাসবি । এই কীর্তনেই তোদের ভালবাসা বিশ্বকে
ছেয়ে ফেলবে ।

তুই কে ? সচ্চিদানন্দ পরম পুরুষ । তোর আবার সংসার, তোর
আবার স্বর্গ ! তুই যা ইচ্ছা করবি তাই হবে । তোদের জগতে ভয়
কী ! একমাত্র নাম । তোদের সকলের আত্মা 'আমি' বিচ্ছিন্ন ।
আমি সকলের পরম ব্রহ্ম, আমার সকল ইচ্ছা তোদের ভিতরে ঢুকিয়ে
দিয়েছি ।

পাপের ভাগী কে রে ? পাপের জন্ত আমি দায়ী—বুকভরা প্রেম
নিয়ে চলে আয় । পাপীকে বুকে তুলে নে ।

যা করবি এই মনটা দিয়ে, মনটাকে ঠিক করতে পারলেই হলো ।
সবাইকে জানতে হয় এক হিসেবে, সব ভগবান, সবার প্রাণ এক হওয়া
চাই । প্রাণে প্রাণে জানা চাই ঈশ্বরকে । মেয়েগুলিকে দেখা চাই মায়ের
মত ! বাজারে দাঁড়িয়ে আছে তাকেও, ঘরে যে আছে তাকেও । প্রেম
ভিন্ন আর রক্ষা নেই । শুধু ভালবাসলেই সব গোলমাল কেটে যায় ।
বেশী যুক্তিতর্কের মধ্যে যাসনে । বিশ্বাসটাকে সবল করে ফেল আর

ভালবাস। সব উচু ভেঙ্গে সমান হয়ে যাবে।

মহাভাব অবস্থার এই রকমের বহু বাণী আছে ঠাকুরের। এমনি একদিনের বাণীতে ঠাকুর একটি অদ্ভুত কথা বলে ফেলেন। এতে তাঁর অলৌকিক পরমপুরুষত্ব প্রকাশ হয়ে পড়ে। তিনি বলেন, আদিত্যে একা, ইচ্ছায় বহু, শেষে একা—তাই কঙ্কি। প্রথমে ছিলাম নির্বিকার। কিছু ছিল না, তারপর হলাম বিকার। আবার ইচ্ছা নির্বিকার হতে—তাই অবতার কঙ্কি। আমার আমিগুলি কুড়িয়ে আবার পূর্ণত্ব-প্রাপ্তি। তোদের জন্ম কত ভাগ হয়েছি, মহাভাগ হয়েছি কেবল কুড়িয়ে নিতে। আয় ছুটে আয়, সবায় আমায় কুড়িয়ে নিবি।

তাণ্ডব-নৃত্য কর দেখি। অণুগুলি থর থর করে নাচিয়ে তোল, গাছপালা জড় চেতন যে যেখানে আছে সব কাঁপিয়ে তোল, শক্তি সঞ্চার হলে সব ছুটে আসবে। ভিতরে মহাশক্তি বাইরে বিনয় নম্রতা। সেই জন্ম অধীনতা দিয়ে ঢাকা; আমার মতো এমনি শিক্ষা করে সকলকে বশ করে নিবি।

এ-এক অদ্ভুত সাধনপ্রণালী। মাথা মুড়িয়ে কোপীন বা গেরুয়া পরবার দরকার নেই। আচার-নিয়ম-সংযমের অবস্থা বাহ্যিক নেই। গায়, কুম্ভক বা আসন প্রাণায়ামের কঠোরতা নেই। সংসার বা আত্মীয়-স্বজন ত্যাগের কোন কথা নেই।

শুধু সদাচার সদালাপ, আর সংসঙ্গ। সংসারে থেকে নির্লিপ্ত ও অনাসক্তভাবে কাজ করে যেতে হবে। আমিষ ভোজন ও উগ্রদ্রব্য খাওয়া চলবে না। তামাক ছাড়া অথ সব মাদকদ্রব্য বর্জন করতে হবে। মনের বৃত্তি যাতে উচ্চ হয় এরূপ কর্ম করতে হবে। রাজনৈতিক দলাদলির কথা চিন্তা বা তাতে যোগদান করা চলবে না। কারণ তাতে অহংকার, ঘেঁষা, স্বার্থচরিতার্থতা প্রভৃতি কতকগুলি নিন্দনীয় ভাব মনে জাগে। সত্যচিন্তা ও প্রেমভাব মনে আসতে পারে না।

সাধ্য মতো আলোচনার দ্বারা বুঝে সব উপদেশ গ্রহণ করতে

হবে। কামিনীকাঞ্চন হতে যতদূর সম্ভব দূরে থাকতে হবে। কর্ম না করে কুচিন্তা ত্যাগের চেষ্টা করা অনুচিত। কুচিন্তার তরঙ্গ উঠতে দেখলেই এমন কাজ করতে হবে যাতে সে চিন্তা মনে স্থান না পায়। অন্তরে ঈশ্বর আছেন এই কথা ভেবে মনকে সাহসী ও অকপট রাখবার চেষ্টা করতে হবে। যতদূর সম্ভব মনকে নিরভিমান, নিঃস্বার্থ, নিরহঙ্কার, ভক্তি ও প্রেমভাবাপন্ন করে তুলতে হবে।

দিনে দিনে সংসঙ্গীর সংখ্যা যেমন বাড়তে লাগল, তেমনি সত্যনামের মহিমাও ছড়িয়ে পড়তে লাগল দূর-দূরান্তে। এই নামের প্রভাবে কত ব্যাধ সাধু হলো, কত ছুরারোগ্য ব্যাধি আরোগ্য হলো, কত মুমূর্ষু মানুষ বেঁচে গেল তার আর ইয়ত্তা নেই।

একবার শ্রামনগরের শ্রীশচন্দ্র নন্দীর স্ত্রীর পেটের ভিতর টিউমার হয়। ডাক্তারগণ বললেন, এ ছুরারোগ্য রোগ। একদিন হঠাৎ ঘটনাক্রমে তাঁর ছোট মেয়ের পায়ের আঘাত লেগে সেই টিউমারটি পেটের ভিতরেই ফেটে যায়। তখন রোগটি আরও ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে। তিনি মরণাপন্ন হয়ে ওঠেন। বড় বড় ডাক্তাররা বললেন, বাঁচবার কোন আশা নেই। অনেকে বললেন, সেই রাতেই মৃত্যু নিশ্চিত। তখন শ্রীশবাবু শেষ চেষ্টা স্বরূপ ঠাকুরের কাছে সকরণ প্রার্থনার সঙ্গে সঙ্গে যথাসাধ্য সত্যনাম করতে লাগলেন। সেই রাত্রি থেকে রোগী সুস্থ হয়ে যেতে শুরু করলেন এবং অল্পকালের মধ্যেই সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠলেন।

আর একবার শ্রীশবাবু হাঁপানিতে বড় কষ্ট পাচ্ছিলেন। একদিন কুষ্টিয়ার বাড়িতে হরিশচন্দ্র রায় উকিল মশায়ের বাড়িতে ঠাকুর এসেছেন। সেখানে ভক্তপ্রবর হোমিওপ্যাথি ডাক্তার সতীশচন্দ্র জোয়ারদার মশায়ও ছিলেন। সতীশচন্দ্র মশায়কে দেখে ঠাকুর বললেন, আপনারা থাকতে শ্রীশদা এমন করে এতদিন ধরে ভুগছেন, আপনারা সারিয়ে দিচ্ছেন না।

সতীশবাবু বললেন, তিনি তো আমাদের কিছু বলেন নি।

ঠাকুর তখন বললেন, না জানালেও আপনাদের উচিত সারিয়ে দেওয়া। এখনি ওকে সারিয়ে দিন।

সতীশবাবু ভাবলেন, ঠাকুর তাঁকে হোমিওপ্যাথি ওষুধ দেবার কথা বলছেন। তাই তিনি বললেন, আমার সঙ্গে তো কোন ওষুধ নেই। বাড়ি থেকে ওষুধ এনে দিই।

ঠাকুর তখন বললেন, যা হোক একটা দিয়ে এখনি সারিয়ে দিন।

সতীশবাবু বললেন, তা কী করে হয়। এ যে বড় কঠিন রোগ। এত শীঘ্র সারবার রোগ তো এ নয়। এর উপর এখানে ওষুধ নেই।

ঠাকুর আবার বললেন, যা হোক একটা ওষুধ দিয়ে সারিয়ে দিন।

এবার সতীশবাবু ঠাকুরের কথার গভীর তাৎপর্যটি বুঝতে পারলেন। তখন তিনি কোথায় হোমিওপ্যাথি ওষুধ পাওয়া যায় খোঁজ করতে লাগলেন। স্থানীয় উকিল প্রসন্নবাবুর মাঝে মাঝে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করতেন। তাঁর একটি ওষুধের ছোট বাস্ক ছিল। সতীশবাবু দেখলেন, শ্রীশবাবুর রোগের উপযুক্ত কোন ওষুধ সে বাস্কে নেই। তবু তিনি ঠাকুরকে স্মরণ করে নাম করতে করতে অল্প একটি ওষুধ শ্রীশবাবুকে খেতে দিলেন এবং শ্রীশবাবুও নাম করতে করতে তাই খেয়ে নিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই শ্রীশবাবু বললেন, আমার রোগ সেরে গেছে।

ঠাকুর খুশি হয়ে বললেন, বাঃ কী সুন্দর চিকিৎসা।

রাতুলপাড়ার শ্রীকান্ত সরকার মশায় একবার ভয়ানক অসুখে পড়েন। বড় বড় এ্যালোপ্যাথি ও হোমিওপ্যাথি ডাক্তাররা যথাসাধ্য চিকিৎসা করেও কিছু করতে পারলেন না। অবশেষে একে একে তারা জবাব দিলেন। একদিন গভীর রাত্রে তাঁর প্রাণবিয়োগ ঘটল। কিন্তু রাত্রিকালে শবদাহ উচিত নয় বলে সকলে অপেক্ষা করতে লাগলেন। এমন সময় অনেকে বলাবলি করতে লাগলেন, সত্যনামে অনেক মরা মানুষ বেঁচে গেছে; সুতরাং এক্ষেত্রেও একবার চেষ্টা করে

দেখা দরকার। এই বলে তাঁরা প্রাণপণে সত্যনাম করতে লাগলেন মৃতের কানের কাছে এবং তার মুখে চরণামৃত ঢেলে দিলেন। রাত্রি ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীকান্ত সরকার আবার বেঁচে উঠলেন।

নদীয়া জেলার অন্তর্গত বরইচারা গাঁয়ে জানকীনাথ হালদার নামে এক জেলে ছিল। জাল নিয়ে মাছ ধরাই ছিল তার জাতীয় ব্যবসা। জানকীনাথ একবার নিউমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হয়ে মরণাপন্ন হয়ে পড়ে। সেই গাঁয়ে রামচরণ জোয়ারদার নামে ঠাকুরের এক ভক্ত ছিলেন। তাঁর চেষ্টায় এবং ঠাকুরের অনুমতিক্রমে রামকৃষ্ণ নামে একজন ভক্ত সত্যনাম দ্বারা রোগীকে আরোগ্য করবার জন্য আসেন। কিন্তু তিনি এসে দেখলেন, রোগী মৃত। তখন রামকৃষ্ণ প্রামাণিক মশায় মৃতের মুখে চরণামৃত ঢেলে দিয়ে প্রণালীবদ্ধভাবে সত্যনাম শোনাতে লাগলেন। এইভাবে ক্রমাগত আট ঘণ্টা নাম করার ফলে রোগীর জ্ঞান ফিরে এল। তখন রোগীকে সত্যনাম দীক্ষা দান করা হলো এবং সে নিজেই নাম করতে লাগল। চব্বিশ ঘণ্টা পর সে একেবারে আরোগ্য লাভ করল। সেরে ওঠার পর হতে জানকীনাথ নিয়মিত নাম করত। আমিষ খাওয়া একেবারে ছেড়ে দিল। সত্যনামের ফলে সর্বভূতে তার গভীর প্রেমবোধ জাগল। তার ফলে জলে মাছ ধরা পড়লেই বসে বসে কাঁদত। মাছটাকে ছেড়ে দিয়ে তবে শান্তি পেত। কোন জীবের কষ্ট দেখতে পারত না। সে তখন মাছ ধরার ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে ভাগ্যের দোকান করল।

ডাক্তার ক্ষীরোদেধর জোয়ারদার একবার নৌকোয় করে ঠাকুরবাড়ি যাচ্ছিলেন। গড়াই নদী যেখানে পদ্মানদীতে পড়েছে সেই মোহনার মুখে নৌকো পৌঁছতেই আকাশ ঘিরে মেঘ জমে উঠল। সন্ধ্যা হয়ে গেছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই ঝড় শুরু হলো। মাঝিরা দুই লগি পুঁতে নোঙ্গর করে কোনরকমে নৌকোটাকে আটকে রাখল। কিন্তু হঠাৎ ঝড়ের বেগ আরও প্রবল হওয়াতে নৌকাটি ঘুরতে ঘুরতে অকূলে ভেসে চলতে লাগল।

রাত্রি তখন যেমন গভীর তেমনি অন্ধকার। তার উপর ঝড় আর
বৃষ্টি। অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় না। চারিদিকে শুধু উতাল উদ্দাম
পদ্মার কালো ঢেউ। ডাক্তার ক্ষীরোদেশ্বরবাবু তখন ঠাকুরকে স্মরণ
করে সত্যনাম করতে লাগলেন। এমনি করে বহুক্ষণ নাম করার পর
হঠাৎ মাঝিরা মাটি পেয়ে চিৎকার করে উঠল। দেখা গেল নৌকো
আপনা হতেই কূলে এসে লেগেছে। সামনে লোকালয়, আলো জ্বলছে।
আরোহীরা তখন আনন্দে লাফ দিয়ে নৌকো থেকে নেমে পড়ল।
ডাক্তারবাবু আশ্চর্য হয়ে দেখলেন, কখন রাত্রি ভোর হয়ে এসেছে আর
তাদের নৌকো ঐন্দ্রজালিকভাবে ঠাকুরের সৎসঙ্গবাড়ির ঘাটে এসে
উঠেছে। ঠাকুর ঘরের ভিতর থেকে মধুর স্নেহশীল কণ্ঠে ডাকলেন,
ডাকলেন, আয় ক্ষীরোদ, আয়।

নামের গুণে শুধু মরা মানুষ নয়, মরা গাছও বেঁচে ওঠে। নামের
গুণে শুষ্ক তরু মুঞ্জরে—একথা অনেকে শুধু কানেই শুনেছে, চোখে কেউ
দেখেনি। এবার তা চোখে দেখে সবাই আশ্চর্য হয়ে গেল।

সৎসঙ্গ বাড়িতে টবে বসান কতকগুলি গোলাপগাছ ছিল। তার
মধ্যে একটি গাছ মরে যায়। শিকড় পর্যন্ত কেটে দেখা গেল, শুকিয়ে
গেছে। নাম করতে করতে গাছটিতে নিয়মিত জল দিতে দিতে কিছু-
পর দেখা গেল গাছটি অঙ্কুরিত হয়ে উঠেছে। সকলেই আশ্চর্য হয়ে
গেল তা দেখে। কারণ অল্প গাছ মরার পর বাঁচলেও বাঁচতে পারে।
কিন্তু গোলাপগাছ মরার পর মূল পর্যন্ত শুকিয়ে গিয়েও পরে বেঁচে
উঠেছে, এমন কথা কেউ কখনো শোনেনি।

জয়নগর মজিলপুরের জমিদার অজিতকৃষ্ণ বসু মশায় ভয়ানক
শূলবেদনায় আক্রান্ত হন। তাঁর কাতর প্রার্থনায় ঠাকুর একবার তাঁর
বাড়ি যান। বহু ডাক্তার দেখিয়ে বহু খরচ করে চিকিৎসা করিয়েও
কোন ফল হয়নি। ঠাকুরকে দর্শন করার সঙ্গে সঙ্গে অজিতকৃষ্ণবাবু
বললেন, ঠাকুর, তোমাকে আমি আমার রোগের কথা বলতে চাই না।
রোগ আমার থাকে থাকুক। রোগ সারাবার প্রার্থনা আমার নেই।

আমি চাই তোমাকে । তুমি আমায় দয়া কর । তুমি আমার পরকালের কাজ করে দাও ।

বস্তু মশায়ের প্রার্থনার কথা শুনে সবাই অবাক হয়ে গেল । এমন দুঃসহ রোগ-যন্ত্রণার মধ্যে এমন নিষ্কাম প্রার্থনা কেউ কখনো শোনেনি । সেইদিনই বস্তু মশায় সত্যনাম ও সাধনপ্রণালী গ্রহণ করলেন । ক্রমে তাঁর শূলবেদনা একেবারে সেরে গেল ।

এই জগতের প্রতিটি মানুষকেই ত্রিতাপ জ্বালা থেকে ভুগতে হয় । আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক—এই তিনরকমের জ্বালা থেকে কোন মানুষই পরিত্রাণ পেতে পারে না । কিন্তু সত্যনামের গুণে এই সব জ্বালা দূর হয়ে যায় । এই নামের ফলে একদিকে যেমন দেহগত জ্বালা যন্ত্রণা আধিভৌতিক জ্বালা, বিপদ-আপদ অভাব-অনটন প্রভৃতি আধিদৈবিক জ্বালা দূর হয়, তেমনি অন্যদিকে আত্মার উন্নতি এবং ইচ্ছাভের ফলে আধ্যাত্মিক শান্তিও লাভ করা যায় ।

আসলে ওষুধে রোগ সারে না । প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই একটি আরোগ্যকারী শক্তি আছে । কোন উপায়ে সেই সূপ্ত আরোগ্যকারী শক্তিকে জাগাতে পারলেই রোগ সারে । নামের দ্বারা সহজেই এই শক্তিকে জাগানো যায় ।

বিশ্বাসের সঙ্গে কোন উদ্দেশ্যে ভগবানের নাম করলেই আমাদের মন অন্তর্মুখী হয় । মর্মস্থান উত্তেজিত হলে একটা প্রবাহ খেলে যায় এবং সেই প্রবাহের ফলে শরীরের ও মনের কার্যকারিতা বেড়ে যায় ।

রোগীকে বিশ্বাস ও নিষ্ঠার সঙ্গে সত্যনাম করাতে পারলে আরোগ্য লাভ হয় ।

কিন্তু রোগী যখন মৃত বা সংজ্ঞাহীন, যখন তার নিজের নাম করবার ক্ষমতা থাকে না তখন অন্য একজনকে রোগীর দেহকে স্পর্শ করে নাম

করতে হবে। এই নামকারী ব্যক্তিকে উচ্চতম শক্তিমান নাম জপে নামময় হতে হবে। ফলে তার শরীরে যে কম্পন হবে, বৈদ্যুতিক শক্তিপ্রবাহের মত সেই কম্পন রোগীর দেহের মধ্যেও সঞ্চারিত হবে। সঙ্গে সঙ্গে তার নামময় ভাবের ইচ্ছাশক্তিও ক্রিয়াশীল হয়ে উঠবে।

মানুষের উত্তমোত্তম অর্থাৎ দেহ পজিটিভ পোলার কাজ করে আর তার হাত-পায়ের আঙুলগুলি নেগেটিভ পোলার কাজ করে। এইসব আঙুলগুলিতে অন্তর্বাহী ও বহির্বাহী স্রাব আছে। তার মধ্য দিয়ে চৈতন্য শক্তিপ্রবাহ বাহিত হয়ে থাকে। এইজন্য যে নাম করবে তার হাত রোগীর দেহে সংস্থাপিত থাকতে হবে। নামের কম্পন রোগীর ঘর, সেই ঘরের বাতাস, অণু-পরমাণু ও ইথারকে স্পন্দিত করে তোলে।

এইভাবে দেখা যায় সত্যনামের গুণে রোগ নিরাময়ের ঘটনা কোন অলৌকিক নয়। এ ঘটনা শুধু মানুষের সহজ বিশ্বাসের উপর নির্ভরশীল নয়, এর একটি বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে। যে যা ভাবে তার সেই ভাবকম্পন তার অঙ্গসংশ্লিষ্ট সব বস্তুতেই সঞ্চারিত হয়ে থাকে। শোনা গেছে, সাধু পিটারের গামছা স্পর্শ করে অনেক রোগী আরোগ্য হত। কোন সাধুপুরুষ যখন নামময় হয়ে থাকেন মনেপ্রাণে তখন তাঁর স্পর্শমাত্র যে কোন বস্তুই নামকম্পনময় হয়ে ওঠে।

যদি মৃত্যুর সময় অথবা তার কিছু পরেই মৃত ব্যক্তির উপর সত্যনামের শক্তিপ্রয়োগ করা হয় তাহলে তার মস্তিষ্কের মধ্যে সুপ্ত বা নিষ্ক্রিয় চৈতন্যশক্তি ধীরে ধীরে উত্তেজিত হয়ে ওঠে এবং সঙ্গে সঙ্গে সব যন্ত্রগুলি একসঙ্গে সক্রিয় হয়ে ওঠে। এইভাবে সব যন্ত্রগুলি কার্যকরী হয়ে ওঠার ফলে আমাদের সব আনন্দ ও মোহ দূর হয়ে যায়। আমাদের দেহ মন ভাল হয়।

রোগ যদি সাধারণ বা সামান্য হয় তাহলে সাধারণ নাম জপেই তা সেরে যেতে পারে। কিন্তু বেশী হলে বেশী মাত্রার নামকম্পনের দরকার

হয়। যেমন ওঁ মন্ত্রের কম্পনের একটা মাত্রা আছে। এই ওঁ মন্ত্র জপ করলে নামকারীর দেহে যে মাত্রার কম্পন থাকে সেই মাত্রার কম্পনই আশপাশের বায়ুমণ্ডলে ও শ্রোতার দেহে সঞ্চারিত হয়। ভাবাত্মক বা বর্ণাত্মক নাম দ্বারা স্থূল কম্পন হয় আর ধ্যানাত্মক নাম, অনাহত নাদ বা বীজমন্ত্রের দ্বারা সূক্ষ্ম কম্পন হয়। আবার যে বীজ-মন্ত্র যত সূক্ষ্ম তা মানুষের তত সূক্ষ্মদেশ বা মর্মস্থান পর্যন্ত কম্পিত করে তুলতে পারে।

বিশ্বাসে ও নাম-জপে অনেক রোগ সেরে যায় বটে, কিন্তু সেই বিশ্বাসের সঙ্গে যদি সত্যনাম জপ করা হয় তাহলে অনেক দুরারোগ্য রোগ সেয়ে যায় এবং মৃত বা মুমূর্ষু লোকের জীবনলাভ হয়। নাম প্রয়োগের আরও কতকগুলি গুহ্য প্রক্রিয়া আছে। সেগুলি একমাত্র সদগুরুই বলে দিতে পারেন।

সদগুরু সব সময় নামগয় হয়ে থাকাতে তাঁর দর্শন ও স্পর্শনের ফলে লোকের চরিত্রের উন্নতি হয়। তাঁর মধ্যে যে নামকম্পনের শক্তিপ্রবাহ বইতে থাকে তা ভক্তের সঙ্গে সঙ্গে সঞ্চারিত হয়।

নরনারীর জীবনে কাম একটি প্রবলতম রিপু। অনেক সাধক ও মহাপুরুষের জীবনে দেখা যায়, এই কামরিপু দমন করতে তাঁদের যথেষ্ট বেগ পেতে বা কষ্ট স্বীকার করতে হয়েছিল। অনেক সময় ওষুধ ও মুষ্টিযোগ ব্যবহার করেও ভাল ফল পাওয়া যায়নি। বেশীমাত্রায় ইন্দ্রিয় বিগ্রহ করতে গিয়ে অনেক সময় শারীরিক বিকৃতি ঘটাতে হয়েছে।

কিন্তু কামরিপু দমন করবার সবচেয়ে সহজ ও শ্রেষ্ঠ উপায় হলো সদগুরুর দর্শন, স্পর্শন ও সত্যনাম। ঠাকুরের কৃপায় ও সত্যনাম মাহাত্ম্যে তাঁর অনেক ভক্ত কোন কঠোরতা না করেও শুধু নামজপ সাধনা আর তাঁর দর্শন স্পর্শন দ্বারা কাম দমনে সফল হয়েছেন।

একদিন ঠাকুর বলেছিলেন, কাম দমন করবার চেষ্টা করলেই কাম দমন করা যায় না। দমনের কথা বেশী করে চিন্তা করতে গেলে

কামভাব আরও বেড়ে যায়। এ-বিষয়ে একেবারে চিন্তা না করে রীতিমত সত্যনাম করলে খুব শীঘ্র ফল পাওয়া যায়। তবে কোন কুচিন্তা বা কুপ্রবৃত্তিকে মনে স্থান দিলে চলবে না। মনে কোন কুচিন্তার তরঙ্গ উঠলেই এমন কোন কাজ করতে হবে যাতে দেহ ও মন দুটিই বিশেষভাবে নিযুক্ত থাকে। চিন্তাকে বিরুদ্ধ কোন সংচিন্তার দ্বারাই দূর করতে হয়। সত্যনাম ও সদগুরুর জীবনাদর্শের কথা ভাবতে হয়।

তাছাড়া স্থপিতত্ত্ব, গণিতবিদ্যা, রসায়নশাস্ত্র প্রভৃতি আলোচনায় কাম রিপু অবদমিত হয়। কাম দমনের জন্য মাছ মাংস পেঁয়াজ প্রভৃতি আগমিষ ও উগ্রদ্রব্য বর্জন করা দরকার।

কোন এক ডাক্তার ভদ্রলোক ও তাঁর স্ত্রী ঠাকুরের কাছে দীক্ষা নিয়ে নিয়মিত সত্যনাম করার ফলে তাঁদের মন থেকে কামপ্রবৃত্তি একে একে চলে যায়। তাঁরা লক্ষ্য করলেন, একসঙ্গে শোয়া বসা সবেও মনের মধ্যে কোন কামভাব জাগে না। আবার নাম বন্ধ করলেই কামপ্রবৃত্তি প্রবল হয়ে ওঠে। ঠাকুরকে একথা একদিন জানানো হলে তিনি বললেন, একেই বলে নামের মাহাত্ম্য।

ভদ্রলোক আবার সত্যনামে মন দিলেন।

একদিন ভদ্রলোক কুষ্ঠিয়ায় একটি পুকুরের পাশ দিয়ে রোগী দেখতে যাচ্ছেন। এমন সময় দেখলেন সেই পুকুরে একটি পরমাসুন্দরী যুবতী একা একা স্নান করছে। তার পীনোন্নত বক্ষস্থল অনাবৃত ছিল। কিন্তু সেইদিকে ভদ্রলোকের দৃষ্টি পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর অজ্ঞাতসারেই নাভিমূল হতে 'মা' শব্দটি উঠে এসে মুখ থেকে বেরিয়ে পড়ল।

আর একদিন ওই ভদ্রলোক গড়াই নদী থেকে স্নান করে আসবার সময় একটি বাড়ির ছাদের উপর এক সুন্দর যুবতী নারী দেখতে পান। তার অনাবৃত বক্ষস্থলের স্তনযুগলের উপর হঠাৎ দৃষ্টি পড়তেই এক আশ্চর্য শ্রদ্ধাপূর্ণ ভাব জাগে তাঁর মনে। তিনি মনে মনে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে বলতে থাকেন, হে ভগবান! কী অদ্ভুত তোমার লীলা। কী

সুন্দর তোমার সৃষ্টি। এই স্তনযুগল রক্তমাংসের তৈরি ; এর মধ্যে গ্রন্থি ও দুগ্ধনালীটি কত সুন্দরভাবে সাজানো। একই বস্তু পুরুষের হাতের স্পর্শে কামভাব জাগায়, কিন্তু সন্তানের হাতের স্পর্শমাত্র স্নেহরসের উদ্বেক করে। সন্তান জন্ম গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে এর শির-উপশিরায় প্রবাহিত সমস্ত রক্ত অমৃতময় দুধে পরিণত হয়। কী চমৎকার এই নির্মাণকৌশল। হে দয়াময় ! যে-তুমি এই সুন্দর অপূর্ব সৃষ্টির স্রষ্টা তুমি না জানি কত সুন্দর !

কিন্তু আগে কখনো কোন যুবতী নারীর স্তনযুগল দেখে এই প্রশংসাপূর্ণ ভাব জাগেনি এই ডাক্তার ভদ্রলোকের। তিনি তাই ভাবলেন, এ নিশ্চয় সত্যনাম গ্রহণের ফল।

ঠাকুর নিজেও প্রথম জীবনে এক দুঃস্বপ্ন দুর্বীর প্রলোভনের কবল থেকে সত্যনামের সাহায্যেই উদ্ধার পান। স্বভাবতঃই তাঁর নীতিবোধ ভক্তিবাদ ও ধর্মাদর্শ ছোট থেকে প্রবল থাকার জন্য কোন কামভাব মনে কখনো স্থান পেত না তাঁর। তবু যৌবনের শুরু থেকেই কামরিপু দমনের একটা সচেতন প্রয়াস মনের মধ্যে দানা বেঁধে উঠতে থাকে দিনে দিনে। সেজন্য তাঁর নীতিচেতনা প্রহরায় থাকত সব সময়। জাগরণে মানুষের নীতিচেতনা সজাগ থাকে এবং যুগের সময় তা নিশ্চেষ্ট হয়ে ঝিমিয়ে পড়ে। তাই একদিন ঠাকুর যখন ঘুমিয়ে ছিলেন তাঁর প্রথম যৌবনে এই দুঃস্বপ্ন কামরিপু স্বপ্নের বেশে তাঁর নীতিচেতনার প্রহরা এড়িয়ে তাঁর মনের মধ্যে ঢুকে পড়ে তাঁকে প্রলুব্ধ করবার চেষ্টা করে।

ঠাকুর যেন স্পষ্ট দেখলেন, একটি পরমাসুন্দরী ষোড়শী যুবতী বিভিন্ন ছলনা ও ভাবভঙ্গীর দ্বারা তাঁকে প্রলুব্ধ করবার চেষ্টা করছে। ঠাকুরের নীতিচেতনা তখনো একেবারে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েনি। তাই তিনি সেই প্রলোভনকে কাটিয়ে উঠবার চেষ্টা করতে লাগলেন। তিনি সেই মেয়েটিকে মা বলে সম্বোধন করলেন। তবুও নিবৃত্ত হলো না সে। মেয়েটি তখন গায়ের কাপড় খুলে ঠাকুরকে আলিঙ্গন করবার জন্য এগিয়ে

এল। ক্রমশ শিথিল হয়ে আসতে লাগল ঠাকুরের নীতিচেতনা।

এমন সময় মা এসে নাম করতে লাগলেন। মার কথায় একমনে সত্যনাম শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে মুহূর্তে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল মেয়েটি।

সত্যনামের প্রভাবে কামদমনের এই সব ঘটনা এমন কিছু অলৌকিক বা অবিশ্বাস্য কথা নয়। এর পিছনেও আছে বৈজ্ঞানিক যুক্তি।

মানুষ যা কিছু চিন্তা করে ভাবে তার একটি করে দাগ বা রেখা পড়ে যায় তার মস্তিষ্ককোষে। এই মস্তিষ্কের প্রধান কেন্দ্র হলো পিনিয়েল গ্রন্থি। এই কেন্দ্রটিকেই তৃতীয় চক্ষু বা প্রজ্ঞানেন্দ্র বলা হয়। এইখানে মনঃসংযোগ করে সত্যনাম জপ করলে সমগ্র মস্তিষ্ককোষ সহজেই স্পন্দিত ও উত্তেজিত হয়ে ওঠে। অন্য স্থানে নাম জপ করলে তত কম্পন হয় না। এই কম্পনের ফলে একটি প্রবাহ জাগে মস্তিষ্ককোষে। আগে থেকে যেসব চিন্তা বা ভাবের দাগ বা রেখা ছিল মস্তিষ্ককোষে এই প্রবাহের আঘাতে সেগুলি উপরে ভেসে ওঠে একে একে। নামজপ বা ধ্যানকালে এইভাবে ছোট বড় ভালমন্দ সব ভাবগুলিই মনের উপর ভাসতে থাকে। সাধকরা তখন মন্দভাবগুলিকে সহজেই মন থেকে একেবারে সরিয়ে ফেলতে পারেন।

সৎসঙ্গ-বাড়িতে পুরুষ ও স্ত্রীভক্তগণ পরস্পরে সহজভাবে মেলামেশা করতেন ও কথাবার্তা ও আলাপ আলোচনা করতেন। অথচ কারো মনে কখনো কোন কামভাব জাগত না। কী করে এই অসম্ভব সম্ভব হয় এ-বিষয়ে প্রশ্ন জাগে কোন কোন শিক্ষিত ভক্তের মনে।

ঠাকুর যেন সত্যি সত্যিই অন্তর্যামী। ভক্তদের মনের কথা সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারতেন। ঠাকুর একদিন এই ধরনের একজন শিক্ষিত ভক্তকে বললেন, বেড়াতে যাবেন?

ভক্তটি সঙ্গে সঙ্গে উত্তর করলেন, যাব।

তখন ঠাকুর তাঁকে নিয়ে কাছাকাছি একটি বস্তীতে গেলেন। একটি

বাড়ির সামনে গিয়ে ডাকতেই ভিতর থেকে জনকতক যুবক-যুবতী বেরিয়ে ঠাকুরকে ও তাঁর সঙ্গে ভক্তটিকে প্রণাম করল। ঠাকুরকে কাছে পেয়ে আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠল তারা। মনে হলো যেন ভগবানকে পেয়েছে। তারা সবাই একবাক্যে বার বার বলতে লাগল, আজ দয়াময় দয়া করে আমাদের বাড়িতে এসে শ্রীচরণ দর্শন দিয়েছেন। আজ আমরা ধন্য হলাম।

বলতে বলতে ভক্তিভাবে বিভোর হয়ে উঠল তারা। এই ভাব-বিস্মল অবস্থায় তারা ঠাকুরকে কাঁধে নিয়ে নাচতে লাগল অনেকে। সঙ্গে সঙ্গে ফুটন্ত ফুলের মালা গাঁথে ঠাকুরের ও তাঁর সঙ্গে ভক্তটির গলায় পরিয়ে দিল।

শুধু ঠাকুরকে নয়, ঠাকুরের ভক্তটিকেও কোলে করে নাচতে লাগল তারা। বললে, দয়াময়ের ভক্তকে পেয়েছি, আজ আমাদের কী সৌভাগ্য। নিজেরা কোলে করার পর যুবতী মেয়েদের কোলের উপর সেই ভক্তকে বসাতে লাগল। বলতে লাগল, ঠাকুরের ভক্তকে নিয়ে ধন্য হয়ে যা।

যুবতী মেয়েরাও পুরুষ ভক্তদের মত পরম আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠল। তারাও ধন্যবোধ করতে লাগল নিজেদের।

ঠাকুরের সঙ্গে ভক্তটি এই অভূতপূর্ব দৃশ্য দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন। তিনি কী বলবেন, কী করবেন কিছুই খুঁজে পেলেন না। পূর্ণযুবতী মেয়েদের অঙ্গস্পর্শেও কোনরূপ বিকার জাগল না মনে। নরনারীর স্বাভাবিক ভেদজ্ঞান লুপ্ত হয়ে গিয়ে এক ভ্রাতৃত্বাবে ভরে উঠল সমস্ত মন। মনে হলো, এখানে নারী পুরুষ বলে কেউ নেই, এখানে যারা আছে সবাই সেই পরম পিতার সন্তান। এবার আর কোন সংশয় রইল না তাঁর মনে।

সেইখানে একজন শান্ত-সাধক দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি ভক্ত নারীপুরুষদের এই পবিত্র মিলন দেখে ভাবে বিভোর হয়ে উঠলেন। নারীজাতির প্রতি এক পবিত্র মাতৃভাব জাগল তার মনে। তিনি

যুবতী নারীদের কাছে ছুটে গিয়ে বলতে লাগলেন, আমাকে কোলে নে মা। কোলে নে। আমি তোর অবোধ সন্তান।

তখন একজন যুবতী নারী এসে তাঁকে সত্যিসত্যিই কোলে নিলেন।

সেখান থেকে ঠাকুর তাঁর সঙ্গের ভক্তকে নিয়ে অথ এক পল্লীতে যাবার জন্ত রওনা হলেন। পথে ঠাকুর বললেন, ধিক্ আমার ব্রাহ্মণত্বে। এরাই ব্রাহ্মণ। এরা একদিন ছিল বুন্দো বাগদী। শূয়োর মেরে খেত। আজ এরা সবাই নিরামিষভোজী ভক্ত। এরাই প্রকৃত ভক্ত, প্রকৃত ব্রাহ্মণ।

তখন ভক্তটি ভাবতে লাগলেন, কী অদ্ভুত এই রূপান্তর। একদিন যারা ছিল মনে-প্রাণে ঘোর তামসিক, আজ তারা কাম, ক্রোধ প্রভৃতি ষড়রিপুকে অবদমিত করে হয়ে উঠেছে পুরোপুরি সাত্ত্বিক। তাছাড়া আশ্চর্যের বিষয় এই যে, অনেক সময় ব্যক্তিগতভাবে অনেক মানুষেরই সঙ্গের সংস্পর্শে ভাবান্তর হয়। কিন্তু সমষ্টিগত ভাবে একটি গোটা সম্প্রদায়ের একই সঙ্গে এমন আশ্চর্য আত্মিক উন্নতির ঘটনা সচরাচর দেখা যায় না।

অধিকাংশ সাধকই কামভাব দমনের জন্ত তাঁর ভক্তদের কামিনীর কাছ থেকে দূরে থাকতে বলেন। কিন্তু সত্যনাম এমনই জিনিস যে পূর্ণ যুবতীর অঙ্গ স্পর্শেও কোন কামভাব জাগবে না।

ভক্তদের প্রতি দয়ার অন্ত নেই ঠাকুরের। তাদের দেহমনের সুখ-দুঃখ সাধনকালের সুবিধা-অসুবিধার প্রতি সব সময় সজাগ দৃষ্টি তাঁর। একদিন একজন ভক্ত এসে ঠাকুরকে বললেন, ধ্যান করবার সময় প্রায়ই রক্ত দেখেন।

ঠাকুর তখন বললেন, পূর্বজন্মে আপনি বোধ হয় অনেক নরহত্যা করেছিলেন, তাই এমন হয়।

তার পর থেকে ঠাকুরের কৃপায় ভক্ত আর ঐরূপ রক্ত দেখতেন না।

কেউ এসে কোন দুঃখের কথা বললেই সঙ্গে সঙ্গে বিচলিত হয়ে উঠতেন ঠাকুর। অনেক সময় অনেকে এসে রোগের কথা বলে। তাদের দুরারোগ্য রোগ অনেক সময় ঠাকুরকে সারিয়ে দিতে হয়। পরে তার জন্ম নিজেকে ভুগতে হয়।

ঠাকুর অন্তর্ধামীর মতো ভক্তদের মুখ দেখে বা দূর থেকে মনের কথা বলে দিতে পারেন। একদিন তাঁর এই অন্তর্ধামীর সম্পর্কে ভক্তরা প্রশ্ন করলে তিনি বললেন, এমন একটা কিছু আছে, তাতে যখন আমি যুক্ত হই, তখন আমি সব জান্তা। বিশ্বের সব কিছু জানতে বুঝতে ও দেখতে পারি। নৈলে অন্য সময় নয়। আমি আপনাদের সঙ্গে যুক্ত হলেই আপনাদের অন্তরস্থ ভাবের কথা জানতে পারি। এটা আদিকারণচাক্ষুর্ষ্য যোগে হয়। আপনা থেকেই হয়। চেষ্টা করে হয় না।

কিন্তু ঠাকুর অন্তর্ধামীই হোন বা লোকোত্তর মহাপুরুষই হোন, তিনি একজন মহান মানবপ্রেমিক। আত্মগত মোক্ষলাভের জন্ম তিনি সাধনা করেননি কখনো। তাঁর সাধনার একমাত্র লক্ষ্য, এক আদর্শ মানবসমাজ গড়ে তোলা। শিক্ষা ও দীক্ষায় জ্ঞানে ও কর্মে, গুণে ও গরিমায় এই মানবসমাজ হবে সব দিক দিয়ে মহীয়ান। তিনি জানেন, শুধু ভক্তির দ্বারা কোন মানবসমাজ সর্বাঙ্গীন উন্নতি লাভ করতে পারে না। ভক্তির সঙ্গে চাই জ্ঞান। ধর্মের সঙ্গে চাই বিজ্ঞানের সমন্বয়। এ যুগের বৈজ্ঞানিক শিক্ষার সঙ্গে চাই প্রাচীন ভারতের মুনিঋষিদের শিক্ষাদর্শের সুষম সংমিশ্রণ।

ঠাকুর এক সময় বলেছেন, লোকের পেটে দুটো ভাতের বোঁগাড় না করতে পারলে, কৃষকের উন্নতি না করতে পারলে, হাজার চেষ্টায়ও দেশের উন্নতি বা ধর্মের উন্নতি হতে পারে না। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্ম আদর্শ তপোবন বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ঠাকুর তারপর তপোবনের শাখাস্বরূপ বিশ্ববিজ্ঞানকেন্দ্র নামে একটি আদর্শ গবেষণাগার স্থাপন করেন। এখানে দেশের মানুষের দুঃখকষ্ট লাঘব এবং সম্পদ বৃদ্ধির জন্ম

বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি আবিষ্কারের চেষ্টা করা হয় ঠাকুরের আদেশ এবং উপদেশ অনুসারে। এখানে প্রথমতঃ বায়ুমণ্ডল থেকে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করবার জন্ত গবেষণা করা হয়। সেই বিদ্যুৎযন্ত্রযোগে রান্না, আলোজ্বালা, কলকারখানা চালানো প্রভৃতি কাজে সবচেয়ে কম খরচে ব্যবহার করা যেতে পারে। তারপর মেঘ সঞ্চয়কারী বা কৃত্রিম মেঘ সৃষ্টিকারী যন্ত্রের আবিষ্কারেরও চেষ্টা করা হয়। ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ। কিন্তু উপযুক্ত বৃষ্টির অভাবে ঠিকমত ফসল না হওয়ার জন্ত চাষীদের দুর্দশার অন্ত নেই। এই যন্ত্র আবিষ্কৃত হলে আবশ্যিকমত মেঘসৃষ্টি করে তাই দিয়ে বর্ষণ ঘটিয়ে চাষের যথেষ্ট সুবিধা হবে। প্রয়োজনীয় গাছপালা ও শস্যের ফলন যাতে অনেক বাড়ে এবং তার বৃদ্ধি যাতে আরও সতেজ হয় তার জন্ত একটি বিশেষ গবেষণাগার তৈরি করা হয়। অকালমৃত্যু প্রতিরোধের উপায় উদ্ভাবনের যন্ত্র আবিষ্কারেরও চেষ্টা চলে।

একমাত্র ভক্ত ও শিষ্যদের অক্লান্ত চেষ্টা আর অকুণ্ঠ সহযোগিতা সম্বল করেই এই মহান পরিকল্পনা গ্রহণ করেন ঠাকুর। সরকারের কাছে সাহায্যের জন্ত দ্বারস্থ না হয়ে জনকল্যাণের এক মহান আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে একাই এই কাজে বাঁপিয়ে পড়েন তিনি। এইভাবে ভক্তির সঙ্গে জ্ঞানের, বাস্তবতার সঙ্গে আধ্যাত্মিকতার, জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার, ধর্মের সঙ্গে বিজ্ঞানের সমন্বয় সাধন করে ভারতীয় ধর্মের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায় সৃষ্টি করেন তিনি।

কিন্তু সমস্ত জাতির পক্ষে দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, ঠাকুরের এই বৈপ্লবিক পরিকল্পনা কার্যে রূপায়িত হবার আগেই দেশভাগের সঙ্গে সঙ্গে সব কিছু ফেলে রেখে চলে আসতে হয় পূর্ববঙ্গ হতে। পূর্ববঙ্গ থেকে শুধু হাতে এসে তিনি সাঁওতাল পরগণার অন্তর্গত দেওঘরের একটি নিজস্ব জায়গা বাসস্থানের জন্ত বেছে নেন। সেদিন কয়েকজন ঘনিষ্ঠ শিষ্যকে সঙ্গে করে ঠাকুর ওঠেন একটি সামান্য চালাঘরে। কিন্তু কোনো স্কোভ জাগেনি ঠাকুরের মনে। সেদিন তাঁর অটল সহিষ্ণুতা আর

গভীর অনাসক্তি দেখে সবাই আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল। পাবনার সং-সঙ্গবাড়ি ও তাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা শাখা-প্রশাখা সমন্বিত এতবড় একটি বিরাট প্রতিষ্ঠানকে চিরদিনের মতো ছেড়ে আসতে কিছুমাত্র কষ্ট হলো না মনে। এতবড় একটা বিপর্যয়ে এতখানি নির্বিকার থাকা কখনই সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়।

কোন কোন ভক্ত ও শিষ্য ঠাকুরকে ভূসম্পত্তি বিনিময়ের পরামর্শ দিলেন। এ বিষয়ে একটু চেষ্টা করলেই সরকারী সাহায্য পাওয়া যেত। কিন্তু ঠাকুর নির্বিকারভাবে উপেক্ষা করে গেলেন এসব পরামর্শ। সকলের মনে হলো ঠাকুরের কাছে ভাঙ্গা ও গড়া, পাওয়া ও হারানোর মধ্যে কোন পার্থক্যই নেই। এতবড় একটি ঘটনার বিক্ষোভ তাঁর চিরপ্রশান্ত হৃদয় সমুদ্রে একটি বুদ্ধদণ্ড সৃষ্টি করতে পারল না। একটি চঞ্চলতার ঢেউও জাগাতে পারল না। নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর এক লোষ্ট্রপাতের মতো কোন্ অভলে তলিয়ে গেল।

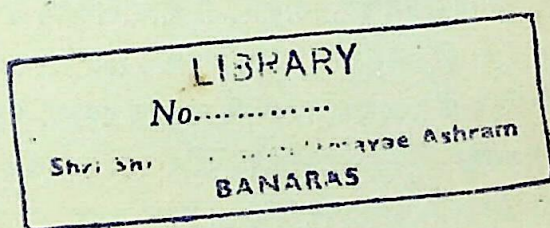
আশ্চর্য এই মহাপুরুষ। নিজে কিছু না চাইলেও সমস্ত ঋদ্ধিও সিদ্ধি আপনা থেকে এসে পড়ে তাঁর কাছে। দেখতে দেখতে ঠাকুরের আবাসস্থানটিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠতে থাকে এক বিরাট সংসঙ্গ। নিজেকে যতই চেপে রাখবার চেষ্টা করুন না কেন ঠাকুর, তাঁর আধ্যাত্মিক সাধনলব্ধ কত বাণী এবং তাঁর ভাবসিদ্ধি দেহ হতে বিচ্ছুরিত দিব্যজ্যোতির অজস্র ছটা দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। দিনে দিনে দেবদারুর ছায়ায় ঘেরা দেওঘরের রুক্ষ কাঁকুড়ে মাটির জনহীন প্রান্তরটি ভরে উঠতে লাগল জনসমাগমে।

পাবনাতে একদিন যা গড়তে গড়তে ফেলে রেখে চলে এসেছিলেন এখানে আবার তা আপনা হতেই গড়ে উঠতে লাগল। কে কোথা থেকে উপাদান যোগাতে লাগল ঠাকুর নিজেই তা জানেন না। তা জানবার দরকার করেন নি কোনদিন।

অজস্র ভক্তের অকুণ্ঠ সহযোগিতায় এখানেও গড়ে ওঠেছে অসংখ্য শাখা-প্রশাখা সমন্বিত এক বিশাল প্রতিষ্ঠান। আজ প্রতিদিন শুধু

বাংলা দেশ নয়, সারা ভারতের দূর-দূরান্তের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ত্রিতাপজর্জরিত মুক্তিকামী অজস্র মানুষ ছুটে আসছে ঠাকুরের কাছে। তাঁর পুণ্য দর্শন অভিলাষে ভিড় করছে তাঁর ঘরের চারিপাশে। আকুলভাবে চাইছে পথের সন্ধান।

বয়স আলী পার হয়ে গেছে। বার্ধক্যজনিত দুর্বলতায় অনেকখানি অশক্ত হয়ে পড়েছে দেহ। তবু এতটুকু কমে নি মনের তেজ। এতটুকু স্নান হয়নি দেহাভ্যন্তর হতে বিচ্ছুরিত দিব্যজ্যোতির উজ্জ্বলতা আর সেই দিব্যজ্যোতির অলৌকিক প্রভাবে নবজীবন লাভ করে অসংখ্য ভক্ত; কত অজস্র পাপাত্মা পরিণত হয় পুণ্যাত্মায়।



শ্রীশ্রীঠাকুর সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ

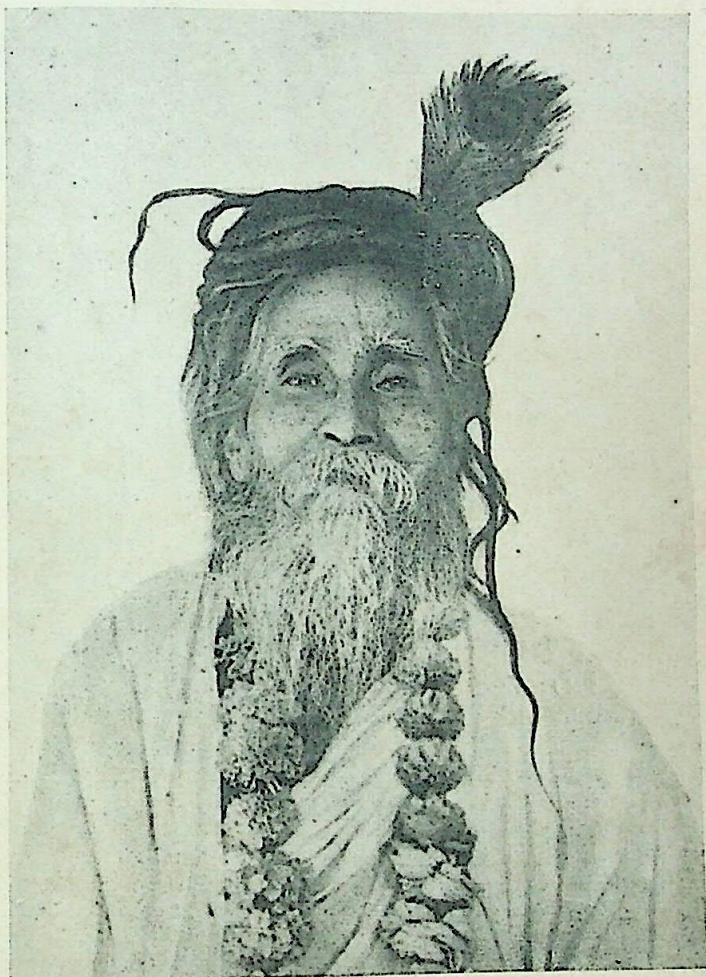
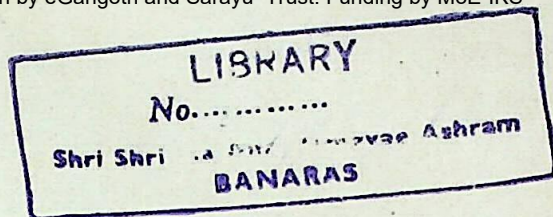
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে ।

হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥

একেই বলে ষোলনাম বত্রিশ অক্ষর সমন্বিত নামমালা । একেই বলে হরিনাম মহামন্ত্র । এ-মন্ত্রের অন্তর্নিহিত ছন্দ হচ্ছে গায়ত্রী, এ-মন্ত্রের ঋষি হচ্ছেন স্বয়ং বাসুদেব ; ত্রিপুরা দেবতা । দ্বাপরযুগের শেষ ভাগে একদিন ভক্তশ্রেষ্ঠ নারদ মুনিকে আদিপুরুষ নারায়ণের এই নাম উচ্চারণের দ্বারাই কলির কুহক হতে উদ্ধার পাবার উপায় বলে বলে দেন লোকপিতামহ ব্রহ্মা । তারপর এই কলিযুগে অগ্নিপুত্রাণ থেকে কৃষ্ণনাম ও ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ থেকে রামনাম সংগ্রহ করে জীব উদ্ধারের জন্য এই নামমালার প্রচার করেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু । অবশেষে সাম্প্রতিককালে এই নামমন্ত্রের সোচ্চার ধ্বনিস্পন্দনে আসমুদ্রহিমাচল সারা ভারতের আকাশ-বাতাসকে অনুক্ষণ মুখরিত করবার ব্রত গ্রহণ করেছেন যে মহাসাধক, তিনি হচ্ছেন সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ ।

আজ থেকে ছিয়ান্তর বছর আগে অর্থাৎ ১২৯৮ সালের ৬ই ফাল্গুন কৃষ্ণপঞ্চমী তিথিতে যখন হুগলি জেলার অন্তর্গত কেদুয়া গাঁয়ের একটি ঘরে গ্রাম্য সন্ধ্যার নিবিড় অন্ধকারকে বিদীর্ণ করে আলোর ফুল হয়ে ফুটে উঠেছিল যে শিশুটি তখন কিন্তু সে ঘরের অথবা সে-গাঁয়ের কোন লোক ভাবতেই পারেনি যে, এই শিশু একদিন ভারতের অধ্যাত্ম-সাধনার অন্ধকার আকাশে একটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্করূপে আবির্ভূত হবে ; এ-শিশুর মহান আত্মার সুরভিতে আমোদিত হবে সমগ্র ভারতের জনারণ্য ; বুঝতে পারেনি, সমগ্র জীবজগতের উদ্ধারের জন্য এর প্রাণ চিরদিন কাঁদতে থাকবে ।

কিন্তু এই নবজাত শিশুর চেহারা দেখে অবাক হয়ে গেল সবাই । এক দেবোপম দ্যুতি তার মুখে । এক স্বর্গীয় সুষমার আভাস ফুটে



শ্রীশ্রীঠাকুর সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ

বেরোচ্ছে তার সারা অঙ্গে। এ ছেলে বড় হলে কোন-না-কোন দিকে উন্নতি করবে, এ ধরণের একটা ধারণা সেইদিনই বন্ধমূল হয়ে উঠল অনেকের মনে।

কেওটা হচ্ছে মামার বাড়ি। সেইখানেই জন্ম হলো। পৈত্রিক গ্রাম ডুমুরদহ। বাবা প্রাণহরি চট্টোপাধ্যায় সেখানকার একজন নাম-করা ডাক্তার। শুধু নাম-করা নয়, অতিমাত্রায় জনপ্রিয়। ওই অঞ্চলের লোক হরি-ডাক্তার বলতে অজ্ঞান। কারণ, শুধু যে তাঁর ওষুধ ধন্বন্তরির মতো কাজ করে তা নয়, মানুষের বিপদে-আপদের খবর শুনতে-না-শুনতেই ছুটে গিয়ে বাঁপিয়ে পড়বেন। যেমন করে হোক উদ্ধার করবেন।

জন্মের পর ছ'মাস মামার বাড়িতেই কেটে গেল। মামার বাড়িতেই ছেলের নাম রাখা হলো—প্রবোধচন্দ্র।

কিন্তু এই দুটি মাসের মধ্যে একটি বারের জন্মও ছেলেকে গিয়ে একবার দেখার সময় পেলেন না প্রাণহরিবাবু। তাঁর পেণাগত ব্যস্ততাই এর একমাত্র কারণ নয়। ডাক্তারি ও জনসেবার কাজ ছাড়া আর একটা বড় কাজ বড় চিন্তা ছিল হরি-ডাক্তারের। সে-কাজ সে-চিন্তা হচ্ছে ব্রজনাথের সেবা। জাগ্রত গৃহদেবতা ব্রজনাথের সেবার ভার একদিনের জন্ম কারো উপর দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারেন না প্রাণহরিবাবু।

তাই পুত্রের জন্মসংবাদে কিছুমাত্র বিচলিত করতে পারেনি তাঁকে। নিজের ও সংসারের ভাল-মন্দের সব ভার যিনি তাঁর ব্রজনাথের উপর সঁপে দিয়েছেন, কোন ঘটনার পক্ষে তাঁকে বিচলিত করা সম্ভব নয়।

ছেলের মা ও মায়ের বাড়ির অনেকেই এতে কিছুটা ক্ষুব্ধ হলেন। সবাই বলাবলি করতে লাগলেন, এমনই-বা কী কাজ বাপু যে নিজের ছেলেকে একবার চোখে চেয়ে দেখতে এলো না একদিন। কাজ কি কেউ আর করে না!

গাঁয়ের দু'চারজন ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-বন্ধুও ছেলেকে দেখে আসবার জন্ম অনুরোধ করলেন প্রাণহরিবাবুকে। কিন্তু তাঁর শুধু এক কথা। এক

জবাব দেন সকলকে । আমি দেখার কে, আমি দেখে কী হবে ? যাঁর দেখার তিনি ঠিক দেখবেন । আমার ব্রজনাথের উপর দেখার ভার দিয়েছি । তাঁর জিনিস তিনি দেখবেন না তো কে দেখবেন !

এমনি দেবভক্ত কর্মযোগী গৃহসন্ন্যাসী ছিলেন প্রাণহরি ডাক্তার । সংসারে থেকেও সংসারের ভোগ সুখের প্রতি ছিলেন এমনি উদাসীন ও অনাসক্ত । ঠিক যেন পদ্মপাতায় জল । এমনি করে সব রকমের কায়িক সম্পর্ক আর অনাত্ম বা আত্মেতর বিষয় থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিজের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে চলবার এক অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল তাঁর ।

ছমাস পর একটা ভাল দিন দেখে স্ত্রীপুত্রকে বাড়ি নিয়ে এলেন প্রাণহরিবাবু ।

সত্যই দেখার মতো ছেলে বটে । প্রাণহরিবাবুর মতো উদাসীন অনাসক্ত লোকও খুশি না হয়ে পারলেন না ।

কিন্তু যিনি সুখ-দুঃখ আনন্দ-বেদনার সমস্ত অনুভূতিই তাঁর ব্রজনাথকে নিঃশেষে দান করে শুদ্ধ মুক্তি চেয়ে নিয়ে নিশ্চিত হয়ে আছেন সব দিক থেকে তাঁর পক্ষে খুশি হওয়া না হওয়া সমান কথা । খুশির ভাব জাগতে-না-জাগতেই তা তলিয়ে গেল তাঁর মুক্তিচেতনার অতল গভীরে ।

হাঁটতে শিখলে সব শিশুই দুরন্ত হয় । কিন্তু শিশুসুলভ কোন পরিচয় পাওয়া যেত না প্রবোধচন্দ্রের মধ্যে । তাঁর একমাত্র খেলা ছিল ঠাকুরের মূর্তি গড়া । ছোট থেকেই তিনি ছিলেন বড় শান্তিপ্রিয় ও স্বল্পভাষী । খেলার সাথীদের সঙ্গে মারামারি ধরাধরি পছন্দ করতেন না । বেশী কথাও বলতেন না ।

অসাধারণ হয়েই যেন জন্মগ্রহণ করেছিলেন প্রবোধচন্দ্র । জৈব-জীবনের যে মাপকাঠি দ্বারা সাধারণ মানুষের জীবনধর্ম নিয়ন্ত্রিত হয়, সে মাপকাঠি তাঁর জীবনের সবটুকু নাগাল পায় না ।

তাঁর এই বিধিনির্দিষ্ট অসাধারণ সাধারণ মানুষ ঠিক বুঝতে না

পারলেও, জ্যোতিষীদের দৃষ্টি এড়ালো না। জ্যোতিষীদের কথাটা মাই প্রথমে তুললেন। ছেলের ভবিষ্যত জীবন সম্বন্ধে কোন আগ্রহই ছিল না প্রাণহরিবাবুর। কারণ তিনি ছেলে জন্মাবার সঙ্গে সঙ্গেই তার সকল ভবিষ্যত তাঁর ঠাকুরের হাতে তুলে দিয়েছেন। যা করবার ব্রজনাথই করবেন। গৃহদেবতা ব্রজনাথের উপর মা মালবতীর ও বিশ্বাস ও নির্ভরতা কিছু কম নয়। তিনিও দিনের বেশীর ভাগ সময় পূজা-অর্চনা ও শাস্ত্রপাঠ নিয়েই থাকেন। তবু পুত্রের ভবিষ্যত সম্পর্কে কিছু জানবার কোতূহল তিনি কিছুতেই চেপে রাখতে পারলেন না। এতটা ভীত কোতূহল তিনি তাঁর আগের কোন সন্তানের বেলায় কিন্তু অনুভব করেননি।

নাম-করা সেরা সেরা জ্যোতিষীদের ডাকা হলো।

জাতকের জন্মকালীন গ্রহচক্র বিচারের পর জ্যোতিষীরা যা ঘোষণা করলেন তাতে প্রবোধচন্দ্রের বিধিনির্দিষ্ট অসাধারণত্ব সম্বন্ধে আর সন্দেহ রইল না বাপ-মায়ের। জ্যোতিষীরা সকলেই একমত হয়ে ঘোষণা করলেন মীনলগ্ন। জন্মলগ্নে বৃহস্পতি ও শুক্র একত্রে অবস্থান করছেন। শুক্র তুঙ্গস্থ। বৃহস্পতি আছেন স্বক্ষেত্রে। রাহু তৃতীয় তুঙ্গী। শনি যদিও বক্রী তথাপি সপ্তমে। চন্দ্রের অবস্থানের জন্য বৃহস্পতি শুক্রকে নিরীক্ষণ করছেন। বুধ একাদশে। মঙ্গল ধর্মস্থানে স্বক্ষেত্রে।

তাঁরা আরও বললেন, এই শিশু ভবিষ্যতে জ্ঞানের গভীরতায় প্রেমের সর্বব্যাপকতায় ত্যাগ ও তিতিক্ষার কঠোরতায়, ঔদার্যে ও মহানুভবতায় এক বিরাট শিক্ষা ও দীক্ষাগুরুরূপে আত্মপ্রকাশ করবেন। ইনি পঁচিশ বছরে পদার্পণ করতেই মহাপুরুষের লক্ষণসমূহ প্রকাশ পাবে এঁর জীবনে। প্রেমধর্মের এক মহা প্রচারকরূপে সারা দেশ পরিভ্রমণ করে এক গভীর চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করবেন অসংখ্য মানুষের মনে।

এই আশ্চর্য ভবিষ্যদ্বানী শুনে মা আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন অন্তরে। পিতা নির্বিকারভাবে ব্রজনাথকে স্মরণ করলেন। বাবা-মা

দুজনেই একবাক্যে ব্রজনাথের কাছে প্রার্থনা করলেন, ঠাকুর, ওকে যেন তোমার করে বাঁচিয়ে রেখো।

প্রবোধচন্দ্রের বয়স মাত্র তখন পাঁচ। ভবিষ্যত বা কোন কিছু সম্পর্কে কোন ধারণাই ছিল না তাঁর।

সারা বাড়ি জুড়ে সে এক অদ্ভুত পরিবেশ। এক আশ্চর্য আবহাওয়া। যখন যে কোন সময়ে সে বাড়িতে কেউ ঢুকবে দেখবে, কেউ-না-কেউ ঠাকুর পূজো করছে অথবা অতিথি সেবা করছে। উচ্চ বা অনুচ্চ সুরে কেউ-না-কেউ হরিনাম করছে।

জীবে প্রেম; ঈশ্বরে ভক্তি আর হরিনামে রুচি—এই ছিল সে বাড়ির শিক্ষা। এইভাবে নামগানের মধুর সুরে অনুরণিত ও প্রেম-ভক্তির অবিরাম রসধারায় সর্বদা সিক্ত হয়ে থাকত যেন সারা বাড়িটি। সেখানে প্রতিটি দেবপূজা নির্ধার সঙ্গে অনুষ্ঠিত হত; প্রতিটি অতিথি-ফকির নারায়ণ জ্ঞানে সেবিত হত; প্রতিটি জীব প্রেমের বস্তুরূপে স্বীকৃত হত।

এইভাবে শৈশব হতেই এক অকৃত্রিম প্রেমভক্তির স্বতশ্ফূর্ত রসে সিক্ত হয়ে উঠতে লাগল প্রবোধচন্দ্রের মনটি। জন্মগত সাত্ত্বিক সংস্কারের নব অঙ্কুরটি দিনে দিনে সতেজ হয়ে বেড়ে উঠতে লাগল অনুকূল পরিবেশের সরস আলো হাওয়ায়।

কিন্তু হঠাৎ একটি আঘাতে বড় বিচলিত হয়ে উঠলো সমগ্র সংসারটি। মা মাল্যবতী অকস্মাৎ দেহরক্ষা করলেন। তখনো পাঁচ বছর সম্পূর্ণরূপে অতিক্রম করেননি প্রবোধচন্দ্র। এই সময় হঠাৎ মাকে হারিয়ে বিহ্বল হয়ে উঠলেন তিনি। বড় অসহায় বোধ করতে লাগল তাঁর স্নেহকাতর শিশুমন। মৃত্যুর ভীষণতা সম্বন্ধে তখন কোন জ্ঞান ছিল না তাঁর। তবু একটা অতিবাস্তব অভাববোধের তীক্ষ্ণতা এক দুঃসহ একাকীত্বের বোঝাভার প্রতিনিয়ত অনুভব করতে লাগলেন অন্তরে। এক তীব্র যন্ত্রণার আগুনে তিলে তিলে দগ্ধ হতে লাগল তাঁর

প্রতিটি স্নায়ুতন্ত্রী ।

প্রাণহরিবাবু ছেলেকে কিছুদিনের জন্য মামার বাড়ি পাঠিয়ে দিলেন ।

হরিনাম প্রধান গাঁ হিসাবে কেওটার তখন বেশ সুনাম ছিল । প্রায়ই হরিনাম সংকীর্তন হত গাঁয়ের এখানে-সেখানে । কিন্তু যেখানেই হরিনাম হত সেখানেই ছুটে যেতেন প্রবোধচন্দ্র । বিশেষ করে নগর কীর্তনের সময় নামের দলের সঙ্গে নেচে নেচে সারা গাঁ ঘুরে বেড়াতেন ।

কিন্তু খেলাধুলায় কোন উৎসাহ নেই । হরিনাম ছাড়া আর কোন কিছুতে রুচি নেই । এমনিতে স্বভাবতঃই তিনি ছিলেন উদাসীন প্রকৃতির । মার মৃত্যুর পর হতে জাগতিক ব্যাপারে আরও উদাসীন হয়ে উঠলেন তিনি যেন ।

কথাটা শুনে প্রাণহরিবাবু বিশেষভাবে বিচলিত হয়ে উঠলেন । কিছুদিনের মধ্যেই ছেলেকে নিজের কাছে নিয়ে গেলেন ।

এবার হতে সন্তানদের জীবনে মাতা-পিতার দ্বৈত ভূমিকায় আবির্ভূত হলেন যেন প্রাণহরিবাবু । মায়ের মতো পরম স্নেহ যত্নে মানুষ করে তুলতে লাগলেন তাদের । মায়ের মতই তাদের সময়ে খাওয়ান পরান শোয়ান । মায়ের মতই সব সময় তাদের চোখে চোখে রাখেন । কিন্তু এজগৎ তাঁকে প্রায় সব সময়ই বাড়িতে থাকতে হত । ডাক্তারির কাজে খুব ক্ষতি হতে লাগল । গাঁ ছেড়ে কোথাও ডাকে যেতে পেতেন না ।

তাছাড়া মার অভাব পিতার দ্বারা সম্পূর্ণরূপে পূরণ করা সম্ভব নয় । প্রাণহরিবাবু ক্রমে বুঝতে পারলেন তাঁর এত চেষ্টা সত্ত্বেও ছেলেদের মনের কোথায় যেন একটা গভীর ক্ষত রয়ে গেছে । সে ক্ষত পূরণ করা দূরের কথা তার সন্ধানই পাননি তিনি এখনো ।

এমন সময় তাঁর দু'চারজন আত্মীয় বন্ধু পরামর্শ দিলেন তাঁকে, আবার রিয়ে কর ।

প্রাণহরিবাবু দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন, বিয়ে অবশ্য আমি করবো

পারি ; কিন্তু সে শুধু আমার সন্তানদের স্বার্থের খাতিরে ; আমার ভোগ সুখের জন্য নয়। এমন যদি কোন মেয়ে পাই যে আমার সন্তানদের নিজের গর্ভজাত সন্তান বলে কোনরূপ কুণ্ঠা না করে বুকে তুলে নিতে পারবে ও মানুষ করতে পারবে, তাহলে আমি তাকে নিশ্চয়ই বিয়ে করব।

সত্যিই কিন্তু এমন মেয়ে পেতে বেশী দেরী হলো না। ফলে আবার দার পরিগ্রহ করলেন প্রাণহরিবাবু। আবার মা পেলেন প্রবোধচন্দ্র।

এবার ছেলের শিক্ষার দিকে নজর দিলেন প্রাণহরিবাবু। তখনকার দিনে ব্যাঙেল চার্চ স্কুল সাহেবী স্কুল হলেও ইংরিজি শিক্ষার জন্য ধনী অভিজাত বাঙালীরা ছেলেদের সেখানে পাঠাতেন। প্রবোধচন্দ্রের দাদা প্রাণহরিবাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র বঙ্কিম সেখানে পড়ত।

প্রবোধচন্দ্রকেও সেই স্কুলে ভর্তি করে দেয়া হলো। কিন্তু ইংরিজি শিক্ষাতে তাঁর বিশেষ কোন রুচি ছিল না।

এদিকে একদিন রাত্রিতে একটি চমকপ্রদ ঘটনা ঘটল। রাত্রি তখন গভীর। সকলেই ঘুমিয়ে আছেন। প্রবোধচন্দ্রও বাবা-মার কাছে ঘুমোচ্ছেন। এমন সময় ঘুমন্ত অবস্থাতেই তিনি টেঁচিয়ে উঠলেন। তাঁর চিৎকারে সকলের ঘুম ভেঙ্গে গেল। সকলেই জেগে উঠে দেখলেন, প্রবোধচন্দ্র তখনো ঘুমের ঘোরে চিৎকার করে বলছেন, ও বাবা, দেখছি না, আমার মাথার গোড়ায় শিবঠাকুর দাঁড়িয়ে রয়েছে।

প্রাণহরিবাবু ছেলেকে জাগিয়ে বসালেন। জেগে উঠেও প্রবোধচন্দ্র ওই একই কথা বললেন।

প্রাণহরিবাবু ভাবলেন, দিনের বেলায় প্রায়ই ঠাকুর ঠাকুর খেলে বলেই ছেলে হয়ত ঠাকুরের স্বপ্ন দেখেছে।

কিন্তু জ্যোতিষীদের ভবিষ্যদ্বানীর কথা সহসা মনে পড়তেই অল্প কথা ভাবতে লাগলেন তিনি। ভাবলেন, ভবিষ্যতে প্রবোধচন্দ্র তাঁর

অধ্যাত্মসাধনায় যে আশ্চর্য সিদ্ধি লাভ করবেন আজকের ইষ্টদর্শন তারই ইঙ্গিত দান করে গেল।

কথাটা ভাবতে ভয়ও হলো তাঁর। ভবিষ্যতে ছেলে তাঁর এতখানি বড় হবে এটা তিনি চাননি। কোন পিতাই হয়ত তা চান না। সব পিতাই চান, তাঁর ছেলে বড় হয়ে সংসারে থেকেই সংসারের মুখ উজ্জ্বল করুক, সংসারের সবাইকে নিয়ে হাস্তমধুর আনন্দ-ঘন একটি পরিমণ্ডল সৃষ্টি করুক ; বেশী দূর দূরান্তে নয়। বড় জোর তার যশের সুরভি সমাজে কিছুটা ছড়িয়ে পড়ুক। কোন পিতাই চান না, তাঁর ছেলে সংসার ত্যাগ করে সংসারকে নিরানন্দের অন্ধকারে ডুবিয়ে সারা দেশকে আলো দান করুক।

প্রাণহরিবাবুর সত্যিই ভয় হলো, প্রবোধচন্দ্র যদি সত্যি সত্যিই একদিন সন্ন্যাসী হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। কিন্তু পরক্ষণেই ভাবলেন, এ-ভয় এ-ভাবনা বৃথা। দৈবের লিখন খণ্ডন হবার নয়। যা কিছু বিধিনির্দিষ্ট তা হবেই। স্তত্রাং সব কিছু ব্রজনাথের উপর নিশ্চিন্ত হওয়াই যুক্তিসংগত।

প্রবোধচন্দ্রের পড়াশুনোর গতি-প্রকৃতি দেখে প্রাণহরিবাবু একটা জিনিস বুঝতে পারলেন, ইংরিজি শিক্ষার প্রতি একেবারেই মন নেই তাঁর। তাছাড়া ঠাকুর-দেবতা, বিশেষ করে গৃহদেবতা ব্রজনাথের প্রতি আগ্রহ তাঁর অপরিসীম।

এক্ষেত্রে প্রবোধচন্দ্রকে সংস্কৃত শিক্ষাই দান করা উচিত। এই শিক্ষার মাধ্যমে ভারতের ধর্মতত্ত্ব ও দর্শনের সঙ্গে গভীরভাবে পরিচিত হবার সুযোগ পাবে প্রবোধচন্দ্র এবং তার ফলে ভারতের ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রতি আগ্রহ তাঁর আরও বেড়ে যাবে। তা যদি হয় তাহলে ভবিষ্যতে প্রবোধচন্দ্রের হাতেই তাঁর ব্রজনাথের সেবার ভার দিয়ে নিশ্চিন্তে পরলোকে যেতে পারবেন তিনি।

তখন বালীতে যাদবচন্দ্র স্মৃতিরত্নের একটি টোল ছিল। যাদবচন্দ্র শুধু একজন পণ্ডিত নন ; তিনি একজন ধর্মপ্রবণ নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ।

পূজা-অর্চনা ব্রত-উপবাস কোনটাই বাদ যায় না তাঁর।

প্রবোধচন্দ্রের বয়স তখন মাত্র বারো। ঠিক হলো, গুরুগৃহে থেকেই পড়াশুনো করবেন।

পরের বছরেই উপনয়ন হলো প্রবোধচন্দ্রের। এই উপনয়ন অনুষ্ঠান গভীরভাবে রেখাপাত করে তাঁর মনের উপর। বেদমন্ত্রের স্মৃগস্তীর ধ্বনি-মাধুর্য, দুর্বোধ্য শব্দের গূঢ় অর্থ ব্যঞ্জনা, অনন্ত জ্যোতির মূর্ত প্রতীক সেই মহান আদিত্যবর্ণ পুরুষের অম্পর্ষ আভাস, সব মিলিয়ে তার মনটাকে আচ্ছন্ন করে ফেলল নিবিড়ভাবে।

উপনয়ন-পর্ব শেষ হয়ে গেলেও সে-কথা তিনি ভুলতে পারলেন না।

উপনয়নের পর থেকেই শাস্ত্রের সব আচার-আচরণ নিয়ম ও নিষ্ঠার সঙ্গে মেনে চলতে লাগলেন প্রবোধচন্দ্র। কারো কোন কিছু বলার অপেক্ষা তিনি রাখেন না। নিজে থেকেই তিনি সচেতন। কারো সাহায্য না নিয়েই তিনি সব কিছু করে চলেন।

মাঝে মাঝে গুরুগৃহ থেকে এসে ব্রজনাথকে দেখে যান প্রবোধচন্দ্র। যেখানেই থাকুন, যাই করুন ব্রজনাথের কথা ঠিকই মনে থাকে। সব কিছুর উর্ধ্বে তাঁর অন্তরের আকাশে ঠিক ধ্রুবতারার মতোই জ্বল জ্বল করে জ্বলতে থাকেন ব্রজনাথ।

টোলের পড়া যাদবচন্দ্র স্মৃতির কাছে বেশই চলতে লাগল। তবু প্রবোধচন্দ্রের মন ঠিক হয় না। অথচ অসুবিধাটা যে ঠিক কিসের তা বুঝতে বা বোঝাতে পারেন না। স্মৃতিরত্ন একজন পণ্ডিত। শাস্ত্রগত জ্ঞানের গভীরতায় ও জ্ঞানচর্চার পারদর্শিতায় তাঁর কোন ত্রুটি নেই ঠিকই। কিন্তু যেখানে গুরুশিষ্যের অন্তরের সম্পর্ক, যেখানে পরস্পরের হৃদয়ের যোগসূত্র, সেখানে তিনি ধরা দিতে চান না। নিজের অন্তর দিয়ে পুত্রতুল্য ছাত্র বা শিষ্যের অন্তরের গভীরতম কামনাকে জানার কোন মমতাপূর্ণ কৌতূহল নেই স্মৃতিরত্নের।

তাই ভিতরে ভিতরে ক্ষুণ্ণ হয় প্রবোধচন্দ্রের মন। প্রাণহরি-

বাবুর একথা বুঝতে দেৱী হয় না। প্রবোধচন্দ্র কিছু খুলে না বললেও সূক্ষ্ম ক্ষোভের রেশটুকু এরই মধ্যে বেজে উঠেছে তাঁর অন্তরে। তিনি গুরুর সন্ধান করতে লাগলেন।

পেতে এমন কিছু দেৱীও হলো না। গুরু যেন বিধিনির্দিষ্ট হয়েই ছিলেন। দিকসই গাঁয়ের যোগেশ্বর দাশরথি ঠাকুর সব কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গেই রাজী হয়ে গেলেন।

প্রবোধচন্দ্রের বয়স তখন আঠারো। বৈশাখ মাসে ভাল একটা দিন দেখে প্রাণহরিবাবু নতুন উদ্যমে আবার পড়া শুরু করে দিলেন প্রবোধচন্দ্র। কিন্তু শুধুমাত্র শাস্ত্র পাঠেই তৃপ্ত থাকতে পারে না তাঁর মন। অষ্টাঙ্গ যোগবিদ্যা শিক্ষার জন্ত মন তাঁর উন্মুখ হয়ে উঠল। যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান-ধারণা ও সমাধি—এই আট রকমের যোগ সাধনার মাধ্যমেই ইন্দ্রিয় সংযম এবং মন ও চিন্তবৃত্তির নিরোধ সম্ভব। অষ্টযোগের শেষ স্তর সমাধির মধ্য দিয়েই সাধক তার আরাধ্য ইষ্টদেবতার সঙ্গে একাত্মতা লাভ করতে পারে।

দাশরথি ঠাকুরও একজন যোগী পুরুষ। শিষ্যের মনের কথা বুঝে তাঁকে কিছু কিছু যোগবিদ্যা শেখাতে শুরু করলেন।

বিনামাঘে বজ্রাঘাতের মতো হঠাৎ পিতৃবিয়োগ হতেই কিছুটা দমে গেলেন প্রবোধচন্দ্র। পিতার মৃত্যুতে সংসার দেখাশোনার কিছুটা চাপ এসে পড়ল অস্বাভাবিকভাবেই। কিন্তু সব ভার ব্রজনাথের উপর চাপিয়ে দিয়ে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে এলেন তিনি। তাছাড়া পিতার মৃত্যুতে শোকের পরিবর্তে বিস্ময় অনুভব করলেন শুধু। কোন গৃহী লোক স্বনির্দিষ্ট দিনে এমন হাসতে হাসতে বিনা যন্ত্রণায় মরতে পারে, একথা আগে কল্পনাও করতে পারেননি প্রবোধচন্দ্র। এমন পিতার সন্তান হিসেবে নিজেকে ধন্য মনে করলেন তিনি।

পিতার মৃত্যু সাময়িকভাবে কিছু বাধা সৃষ্টি করলেও সে বাধা টিকতে পারল না তাঁর সামনে। তাঁর যে জীবননির্ধারণী সাধনার সাগর-সঙ্গম পথে দুর্বার বেগে এগিয়ে চলেছে, তার প্রবল গতিবেগের সামনে কোন

বাধাই টিকতে পারল না।

পিতার মৃত্যুর এক বছর পর অর্থাৎ ১৩১৯ সালে দীক্ষা নিলেন প্রবোধচন্দ্র। দীক্ষার জন্ত অণ্ড কোথাও যেতে হলো না; অণ্ড কোন গুরু ধরতে হলো না। এতদিনের শিক্ষাগুরুই হলেন দীক্ষা গুরু। গুরুকে ভক্তিভরে প্রণাম করে প্রবোধচন্দ্র বললেন, হে দেব তোমার প্রসাদে আমি যেন সর্ব দিক দিয়ে কৃতকার্য হতে পারি, মায়া ও মৃত্যুর মহাপাশ হতে নিজেকে মুক্ত করে আমি যেন শিবতুল্য হতে পারি।

কিন্তু দীক্ষা নেবার পরও শিক্ষা ও পাঠাভ্যাস ঠিকই চলতে লাগল। ১৩২৩ সালের মধ্যে ব্যাকরণের আশ্রম এবং মধ্য ও বেদান্তের আশ্রম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন। এমন সময় গুরুদেব আদেশ করলেন, বিয়ে করতে হবে। গুরুবাক্য কখনো লঙ্ঘন করেননি প্রবোধচন্দ্র। কিন্তু এ আদেশ তিনি শিরোধার্য করে নিতে পারলেন না। গুরুর এ-বাক্যে দ্বিধা ও দ্বন্দ্ব জাগল তাঁর মনে—একদিকে গুরুবাক্যের প্রতি শ্রদ্ধা অণ্ডদিকে সংসার-জীবনের প্রতি গভীর অনাসক্তি ও অনিচ্ছা।

কিছুদিনের জন্ত গুরুর আদেশ পালনে অক্ষম হয়ে কাটোয়া নবদ্বীপ ও পুরীতে গিয়ে রইলেন। কিন্তু কোথাও শান্তি পেলেন না। এভাবে গুরুকে এড়িয়ে কতদিন পালিয়ে পালিয়ে বেড়াবেন। তাছাড়া যিনি একাধারে তার শিক্ষা ও দীক্ষাগুরু যিনি তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু ও জীবনের পরিচালক তাঁর আদেশ অমান্য করে তাঁকে মনোকষ্ট দেয়া উচিত নয়। আরও একটা কথা। ব্রজনাথের উপর যদি তাঁর নিজের ও ভবিষ্যতের সব ভার অর্পণ করে থাকেন তাহলে শুধু বিয়ের বিষয়টা ভেবে লাভ কি।

অবশেষে গুরুর ইচ্ছা ও আদেশে শুভলগ্নে বিয়ে হয়ে গেল। প্রবোধচন্দ্রের বয়স তখন পঁচিশ। কিন্তু পড়াশুনো ও জপ-তপ ঠিকই চলতে লাগল। এই সময় তিনি একে একে উপনিষদের আশ্রম মধ্য এবং পুরানতীর্থ ও পুরানরত্ন পরীক্ষাগুলির জন্ত তৈরি হতে থাকেন।

বিয়ে করেছেন। স্ত্রীর প্রতি স্বাভাবিক স্নেহ ভালবাসার কোন ক্রটি নেই। তাঁর প্রতি কর্তব্যে কোন অবহেলা নেই। তবু অন্তরের দিক থেকে কোন ভাবান্তর ঘটল না তাঁর এই বিয়ের ফলে। তাঁর দেহগত ইন্দ্রিয়চেতনার সঙ্গে বিয়ের কোন সম্পর্ক কোনদিন অনুভব করলেন না তিনি। স্ত্রীকে শুধু সহধর্মিনী ভাবলেন, অর্ধাঙ্গিনী ভাবতে পারলেন না একটি দিনের জন্যও।

সাধবী স্ত্রী কমলাও তাকে যথেষ্ট সাহায্য করে যেতে লাগলেন এ বিষয়ে। স্বামীর ত্যাগধর্মে নিজে থেকে তিলে তিলে দীক্ষিত করে তুলে স্বামীকে উৎসাহ দিতে লাগলেন। ব্রজনাথ এবং স্বামীর সেবা করে যেতে লাগলেন অক্লান্তভাবে।

এই সময় নিদারুণ দারিদ্র্য দেখা দেয় সংসারে। কিন্তু কোন ভাববই টলাতে পারেনি তাঁদের। যত আঘাত বাইরে থেকে এসেছে তাঁদের উপর ততই ব্রজনাথের উপর আস্থা তাঁদের বেড়ে গেছে, ততই তাঁরা বেশী জোরে আঁকড়ে ধরেছেন ব্রজনাথকে। প্রবোধচন্দ্র বলতেন, ধীর সংসার সেই দেখবে, আমি নামেমাত্র সংসারী সেজে বসে আছি।

এদিকে প্রবোধচন্দ্রের পঁচিশ বছর বয়স পূর্ণ হয়ে এল। মৈবের লিখন খণ্ডিত হবার নয়। জ্যোতিষীদের ভবিষ্যদ্বাণী সত্যে পরিণত হতে আর বেশীদিন বাকি নেই। তাঁর সাধনা দিনে দিনে বেড়ে চলেছে। শাস্ত্রপাঠের সঙ্গে সঙ্গে চলে জপ তপ এবং ধ্যান। এক-একদিন সারারাত্রি ধ্যানে কেটে যায়।

প্রবোধচন্দ্র তখন থাকতেন চুঁচড়ার বিশ্বনাথ চতুষ্পাঠীতে। বেদান্ত পাঠের জন্য দুই বছর আগে গুরুদেবই তাঁকে সেখানে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু বেদান্তের প্রতিপাদ্য ব্রহ্মকে কেবলমাত্র জ্ঞানের দ্বারাই জানতে চাইতেন না প্রবোধচন্দ্র, তাঁকে ধ্যানের মধ্যে প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করতে চাইতেন। এজন্য সাধনার অন্ত ছিল না তাঁর।

সেবার পঁচিশ পার হয়ে সবেমাত্র ছাব্বিশে পড়েছেন প্রবোধচন্দ্র। তখন শীতকাল। সেদিন গভীর রাত্রিতে চতুষ্পাঠীর ঘরে তিনি ধ্যান-

মগ্ন । এমন সময় সহসা অন্তরে তাঁর শিবমূর্তির আবির্ভাব হলো ।

ভীষণভাবে চমকে উঠলেন প্রবোধচন্দ্র । ভয়ও পেলেন । কারণ এই অলৌকিক অভিজ্ঞতার জন্ম প্রস্তুত ছিল না তাঁর মন । তাঁর ভীতি-বিহ্বল জীবচৈতন্যটি কেঁপে উঠল আমূলভাবে ।

ক্রমে এই ভীতিবিহ্বল ভাবটি কাটিয়ে উঠলেন প্রবোধচন্দ্র । সাহস সঞ্চয় করে বললেন, কে আপনি ?

শিবমূর্তির কাছ থেকে স্পর্শ উত্তর এল, আমি তোমার গুরু ।

তাঁর ধ্যানমার্জিত যোগনেত্রের স্বচ্ছ দৃষ্টির সাহায্যে ষতদূর সম্ভব দেখলেন প্রবোধচন্দ্র, শিব নয়, যেন অনন্ত শুভ্র এক বিরাট জ্যোতিপুঞ্জ জন্ম জন্মান্তরব্যাপী অবিচার অন্ধকার ভেদ করে শিবরূপ ধারণ করে আবির্ভূত হয়েছেন তাঁর সামনে ।

প্রবোধচন্দ্র তখন আবার সাহস করে বললেন, আপনি তাহলে আমায় ইচ্ছা দর্শন করান ।

প্রাণপণ শক্তিতে প্রথমে ইচ্ছামন্ত্র জপ শুরু করলেন প্রবোধচন্দ্র । তারপর রাম নাম । তারপর ওঙ্কার মন্ত্র ।

সহসা চক্ষু খুলে জয়ুগলমধ্যে এক দিব্যজ্যোতি আবির্ভূত হলো । বহু সাধনার পর যে ত্রাটিক সম্ভব হয় সাধকদের জীবনে, সেই ত্রাটিক আপনা হতে হয়ে গেল ।

ক্রমে সব মন্ত্র বন্ধ হয়ে গেল আপনা হতে । একে একে বিলুপ্ত হয়ে গেল সব ধ্বনি । এক অনন্ত জ্যোতির সীমাহীন শব্দহীন সমুদ্রের অতল গভীরে ক্রমশঃ তলিয়ে যেতে লাগলেন প্রবোধচন্দ্র । সেখানে কোন রূপ নেই, শব্দ নেই, চেতনা নেই । সমস্ত সন্নিহিত হারিয়ে ফেললেন তিনি ।

সন্নিহিত ফিরে পেলেন ব্রাহ্মমূর্তিতে । এদিকে পৃথিবীতেও অন্ধকারের পরপারে দূর দিগন্তে ফুটে উঠেছে অস্পষ্ট জ্যোতির রেখা ।

সেই মুহূর্তেই চতুষ্পাঠী হতে গুরুগৃহের পথে বেরিয়ে পড়লেন প্রবোধচন্দ্র । চুঁচুড়া হতে দিকসই । পথ চলেছেন তবু কিছুই দেখছেন না

পথে। একটা আচ্ছন্ন আবিষ্কৃত ভাব। এক পরমানন্দের দিব্য মাদকতায় মত্ত হয়ে উঠেছে সমস্ত দেহমন।

গুরুগৃহে পৌঁছতেই তাঁর দেহমনের অবস্থা দেখে গুরুদেব বিস্মিত হয়ে গেলেন। স্ত্রী কমলাও তখন গুরুগৃহেই ছিলেন। সকলেই তাঁর অবস্থা দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। তখনো প্রবোধচন্দ্রের সারা অঙ্গ কাঁপছে। অফিসাভিক প্রেমবিকারের লক্ষণগুলি ফুটে উঠেছে সে অঙ্গে।

সবাই বলল, প্রবোধচন্দ্র পাগল হয়ে গেছে।

গুরুদেব বুঝলেন, উন্মাদ নয়, দিব্যোন্মাদ। বহু জন্মের তপস্কার ফলেই সাধকেরা এই দিব্যোন্মাদ ভাবের অধিকারী হন।

তিন-চার দিন পর আবার চতুপাঠিতে চলে গেলেন প্রবোধচন্দ্র। কিন্তু গুরুদেবের মন তখনো আন্দোলিত মথিত হচ্ছে একটি আধ্যাত্মিক প্রশ্নে, আসলে কে এই প্রবোধচন্দ্র? কী করে জাগল এই ভাব তাঁর মধ্যে?

মুখে যে কথা জানাতে পারেননি, সে-কথা প্রশ্নের আকারে লিখে পাঠালেন শিষ্যের কাছে। গুরুদেব লিখলেন “তুমি আমার কে, গুরু না শিষ্য, তা জানি না। তবে একটি কথা ভালভাবেই জানি, তুমি আমার, আমি তোমার। যদি গুরু হও, তবে আমি তোমার শিষ্য হিসেবে শরণ নিচ্ছি। কৃপা করে উদ্ধার কর। আর আমি যদি তোমার গুরু হই, তাহলে বল, তুমি কে, তোমার স্বরূপ কী এবং কী উপাদানে তা গঠিত।”

তার উত্তরে প্রবোধচন্দ্র জানালেন, তোমার দেওয়া ভাব, তোমার দেওয়া ভাষা, তোমারই চরণে ডালি দিলাম যা ইচ্ছা কর।

কী অপূর্ব আত্মসমর্পণের সুর। জ্ঞানের কোন অহংকার নেই। মন্ত্রসিদ্ধি লাভের কোন অভিমান নেই। আছে শুধু একান্ত বশব্দ এক শিষ্যের অকুণ্ঠ আনুগত্য আর শিশুস্বলভ নির্ভরতা।

গুরুদেব বুঝলেন, এক মহাব্রত উদযাপনের জন্য পৃথিবীতে এসেছেন

প্রবোধচন্দ্র। সে ব্রত হচ্ছে অঙ্গশ্র পাণী-তাপী জীবের উদ্ধার। শুধু নিজের ব্যক্তিগত মোক্ষই তাঁর কাম্য নয়।

গুরুদেব আরও বুঝলেন প্রবোধচন্দ্র এক নামপ্রেমী মহাপুরুষ। নিরন্তর নামগানের মধ্য দিয়েই জীবের উদ্ধার করতে এসেছে সে। তাই সদা সর্বদা অন্তরে রামের ধ্যান। কণ্ঠে রামনাম। কখনো-বা কৃষ্ণনাম। নিরাকার নিগুণ ব্রহ্ম সাকার অবতার রূপে তাঁর ধ্যান ধারণায় আবির্ভূত হন।

এবার হতে তাই গুরুদেব প্রবোধচন্দ্রের নূতন নামকরণ করলেন, সীতারাম দাস।

সীতারাম একই সঙ্গে জ্ঞান ও ভক্তিযোগে সিদ্ধ। তিনি একাধারে পরম জ্ঞানী ও পরম ভক্ত। আবার ভক্তিরসের ক্ষেত্রে তিনি মধুর ও দাস্য ভাবের উপাসক। একদিকে তিনি মধুরা নামক সমর্থী রত্নির উপাসিকা কৃষ্ণপ্রাণা রাধা; অন্যদিকে তিনি শ্রীরামসীতার সেবক দাসানুদাস। তাই কৃষ্ণ ও রামের যুগ্ম নামে বিধৃত হয়েছে তাঁর নামমালা।

নামই শ্রেষ্ঠ যোগ। প্রেমভক্তিই শ্রেষ্ঠ বিদ্যা। তবু গুরুদেবের মন মানে না। যোগ অভ্যাসের জন্তু তাই তিনি সীতারামকে ত্রিবেণীতে যোগীরাজ গোঁড়েন্দ্র মহাদেবের নিকট পাঠাইলেন। সব দিক দিয়ে সফল ও সার্থক করে তুলতে হবে সীতারামের অধ্যাত্ম-সাধনাকে। কোন রকমের কোন ফাঁক বা ত্রুটি না থাকে যেন তার মধ্যে।

এই সময় এক দারুণ বিপর্জয় নেমে আসে সীতারামের সংসারে। একমাসের মধ্যে তাঁর বড় ভাই বঙ্কিম ও ভ্রাতৃবধূ দেহত্যাগ করেন। সংসারের যে বোঝা ঝেড়ে ফেলে মুক্ত হবার চেষ্টা করেন, সেই বোঝাই ঘুরে ফিরে আবার এসে ঘাড়ে চাপে। আবার ব্রজনাথের কাছে কাতর প্রার্থনা জানান সীতারাম, দেখো ঠাকুর, যেন লক্ষ্যভ্রষ্ট না হই। দুঃখ দাও তাতে ক্ষতি নেই, কিন্তু দুঃখে যেন ভেঙ্গে না পড়ি।

সংসার চিন্তার উপর আবার একটার পর একটা মৃত্যুশোক ।
সুদূর শৈশবে মা গেছেন । তারপর বাবা । তারপর বড় ভাই ও
ভ্রাতৃবধু ।

কিন্তু সীতারাম জানেন, এ শোক মিথ্যা । সংসারে একের সঙ্গে
অন্যের এই আত্মীয়তার সম্পর্ক একান্তভাবে মায়িক ।

রামায়ণে দেখা যায় রামচন্দ্র ভরতের মুখে পিতৃবিয়োগের সংবাদ
শুনে কিছুকাল অধীর হয়ে পড়েন । মন্দাকিনী তীরে ইঙ্গুদীফলে পিতৃ-
পিণ্ড রচনা করে তা দান করবার সময় শোকোচ্ছ্বাসে ভুলুণ্ঠিত হয়ে
কাঁদতে থাকেন । কিন্তু পরক্ষণেই চিন্তাসংযম করে সংসারের অনিশ্চয়তা
সম্বন্ধে উপদেশ দিতে থাকেন ভরতকে । সমুদ্রে পতিত দৈববশে
মিলিত কাষ্ঠদ্বয় যেমন শ্রোতোবেগে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, তেমনি স্ত্রী
পুত্র ও জ্ঞাতীদের সঙ্গে আমাদের মিলনও দৈবাধীন ; কখন চিরবিরহ
উপস্থিত হবে, তার কোন নিশ্চয়তা নাই । তাছাড়া জীবিত ব্যক্তির
মৃত্যুকালই যখন আসন্ন ও অনিশ্চিত তখন মৃত ব্যক্তির জগৎ অনুতাপ
না করাই বিধেয় ।

সীতারামও তাই আর কোন অনুতাপ না করে কাজে মন দিলেন ;
সাধনায় চিত্তনিবদ্ধ করলেন ।

নাভিক্রিয়া বিভিন্ন রকমের মুদ্রা, আসন প্রাণায়াম প্রভৃতি বিষয়ে
সীতারামকে শিক্ষা দিলেন যোগী মহারাজ । কিন্তু তিনি ক্রমে বুঝলেন,
একমাত্র জপের দ্বারাই সব কিছু আয়ত্ত্ব করে নিয়েছেন সীতারাম ।
যোগ করার আর কোন প্রয়োজন নেই । নাম ও জপের অপার
মহিমা যেন মূর্ত হয়ে উঠেছে তাঁর ভক্তিসিদ্ধ জীবনে ।

১৩২৬ সালে ডুমুরদহে ব্রজনাথ সমিতি গঠিত হলো এবং নিয়মিত
হরিনাম সংকীর্তনের জগৎ একটি হরিবাসর স্থাপিত হলো । প্রায়ই হরি
নামের অনুষ্ঠান হতে লাগল আর দলে দলে অসংখ্য নরনারী যোগ দিতে
লাগল সে অনুষ্ঠানে ।

এই সময় তিনটি বছর ধরে গয়া, কাশী, বৃন্দাবন, পুরীধাম, তার-

পীঠ প্রভৃতি প্রধান প্রধান তীর্থগুলি পর্যটন করে বেড়ান সীতারাম। ১৯৩০ সালে খণ্ড মৌন অভ্যাস করেন। দিনের পর দিন মাসের পর মাস মৌন অবলম্বন করে থাকেন। এই মৌন অবস্থায় কয়েকখানি ধর্ম ও সাধনতত্ত্ব বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করেন সীতারাম।

এই বছর 'চোখের জলে গায়ের পূজা' নামক একখানি গ্রন্থ রচনা করেন সীতারাম। এই অমূল্য গ্রন্থে ভারতের নারীজাতির কর্তব্য ও তাদের আর্থিক উন্নতির উপায় নির্দেশ করেছেন তিনি। নারীজাতী সম্পর্কে বৈদিক ভারতের প্রাচীন সংস্কার ও শাস্ত্র নির্দেশগুলি আবার যেন প্রাণ পেল সীতারামের লেখনীতে। কলির কুহকে পড়ে ভারতের নারীজাতি আজ বিপথে চালিত।

তিনি বলেছেন, যথাকালে নারীদের বিবাহ দিতে হবে। বিবাহ সংস্কারই স্ত্রীলোকের বৈদিক উপনয়ন সংস্কার। পতির সেবাই তাদের গুরু কূলে বাস; গৃহকর্মই তাদের সায়ং ও প্রাতঃকালীন হোমস্বরূপ অগ্নি পরিচর্যা। নারী বিশ্বজননী তার মধ্যে যে মহাশক্তি স্তূপ্ত হয়ে রয়েছে, আজ ভোগবিষ্ঠা কুণ্ডের মধ্যে ডুবে গিয়ে নারীরা সে শক্তির কথা ভুলে গেছে। এই শক্তিকে জাগাতে হলে আগে মনকে বশীভূত করতে হবে। তিনি বলেছেন, মন বশ হলে জগতে অপ্রাপ্য কিছুই থাকবে না। কর্মের বন্ধন আসবে না...যে নারী তার অসংযত মনের ক্রীড়াপুত্তলিমাত্র সে দানবী; আর যারা মনকে জয় করতে পেরেছে তারাই সীতা, সাবিত্রী, লক্ষ্মী।

এই মনকে বশ করার সবচেয়ে সোজা উপায় হলো যতদূর সম্ভব স্বল্পবাক হয়ে সংযতচিত্তে স্বামী স্বামী জপ করা। সীতারাম বলেছেন, জপ কর, অনিবার স্বামী স্বামী জপ কর। জিহ্বাকে উর্ধ্ব চেপে রেখে দৃষ্টি স্বামীর কোঠি চন্দ্র সূর্যীতল চরণ নখরে স্থির রাখ অথবা স্বামী-দেবতার উর্ধ্ব নেত্রে স্থির কর, অথবা স্বামীর গণিময় মুকুটের উজ্জ্বল হীরকখণ্ডে তোমার চোখ দু'টি স্থির করে জপ কর। বসে জপ করতে করতে যদি পা ব্যথা করে অথবা কাজের ক্ষতি হয়, তা হলে কাজ

করতে করতে জপ কর। বিশ্রাম কালে বা শয়নকালে জপ কর। প্রয়োজনীয় কথা ছাড়া কথা বলা ছেড়ে দাও।

পরের বছরে প্রথম নামঘণ্ট অনুষ্ঠিত হলো।

তারপরে থেকে প্রায়ই হতে লাগল নামঘণ্ট। এই নামঘণ্ট বলা কালে প্রায়ই বাহুজ্ঞান হারিয়ে ফেলতেন সীতারাম।

কিন্তু বাড়িতে থেকে নামঘণ্টের অনুবিধা হচ্ছিল। তাই গঙ্গাভীরে নতুন আশ্রম তৈরী হলো। নাম হলো রামাশ্রম। এবার থেকে এই আশ্রমেই বাস করতে লাগলেন সীতারাম।

আবার কিছুদিনের জন্ত কাশী বৃন্দাবন ভ্রমণ করেন সীতারাম। যার নির্মল চিত্তদর্শনে পরম সত্য সত্ত্ব প্রতিভাত, তীর্থদর্শনে কোন প্রয়োজন নেই তাঁর। সকল স্থানই সমান তাঁর কাছে। সর্বত্রই তিনি দর্শন করেন তাঁর ইচ্ছা দেবতাকে।

কিন্তু সীতারাম তো শুধু তীর্থভ্রমণ করেন না। তীর্থ ভ্রমণের সঙ্গে সঙ্গে তিনি করে যান নামপ্রচারের ব্রত পালন। যখন যেখানে যান যখন যেখানে থাকেন নামের মহিমা প্রচারই হয়ে ওঠে তাঁর একমাত্র কাজ। আজ হতে প্রায় চারশো বছর আগে বাংলা দেশে শ্রীচৈতন্য-দেবই প্রথম হরিনাম প্রচার করেন। তারপর এ যুগে আবার নাম প্রেমিক মহাসাধক সীতারাম সেই নামের মহিমাকে তুলে ধরেন। কারণ কলিযুগে নাম ছাড়া জীবের মুক্তির জন্ত কোন উপায় নেই।

প্রথমতঃ শ্রদ্ধায় বা অশ্রদ্ধায় আমরা কোন দেবতার নাম কীর্তন করলেই সহজেই তাঁর দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় এবং তাঁর কৃপা লাভ হয়। নামীর অলৌকিক শক্তি ক্রমশঃ নামকারীর মধ্যে সঞ্চারিত হওয়ার ফলে নামকারী সর্ব ভয় ও ধীরে ধীরে অষ্টপাশ হতে মুক্ত হয়।

লজ্জা, ঘৃণা, ভয়, কুলশীলজাতি-অভিমানজনিত মোহ, দ্বেষ, শঙ্কা, পৈশুণ্য এবং জুগুপ্সা এই অষ্টপাশের দ্বারা নিত্য মুক্ত পরমাত্মা জীব-রূপে আমাদের দেহের অভ্যন্তরে আবদ্ধ। ক্রমাগত নাম করতে করতে মানুষ এই অষ্টপাশ বা ভাববন্ধন হতে মুক্ত হয়ে তার অন্তর্নিহিত

পরমাত্মাকে চিনতে পারে ।

নামের একটি বড় গুণ হলো সব পাপ হরণ করা । কলিযুগে এমন কোন পাপ নেই যা নামকীর্তন দূর করতে পারে না । জগতে তিনরকমের পাপ আছে—কর্মজ, বাগজাত ও মানস । হরিনামের সময় মানুষের হাত, মুখ এবং মন তিনটিই এককেন্দ্রিক হয়ে নামকীর্তনে রত থাকে । নামের সময় মানুষ হাত দিয়ে হয় করতালি দেয় অথবা দু'হাত তুলে উদাহ হয়ে ঈশ্বরের জয় কীর্তন করে । মুখে হরিনাম করে এবং মনে হরিচিন্তা করে । এইভাবে সব পাপ স্ফালন হয়ে যায় ।

১৩৩৭ সালে সাধবী সহধর্মিনী দেহত্যাগ করেন । সব রকমের শোক দুঃখকে আগেই জয় করেছেন সিদ্ধপুরুষ সীতারাম । তাই এই মৃত্যু তাঁকে কোন আঘাতই দিতে পারল না । শোকজয়ী শ্রীরামচন্দ্রের আত্মস্থ ভাব দেখে ভরত বলেছিলেন,

কো হি শ্রাদ্দীদৃশো লোকে ষাদৃশস্তুমরিন্দম্ ।

ন ত্বাং প্রব্যথয়েৎ দুঃখ প্রীতিবা ন প্রহর্যয়েৎ ॥

নির্বিকারচিত্ত সীতারাম সম্পর্কেও আমরা ঠিক এই কথা বলতে পারি । তোমার শ্রায় এই জগতে আর কোন্ ব্যক্তি আছেন, দুঃখে তুমি ব্যথিত হও না, স্তুখে তোমার হর্ষ নেই ।

এখন সংসারে কেবল মা । বিমাতা বলে কোনদিন মনে হয়নি তাঁকে । গর্ভধারিনী মার অভাব কোনদিন বুঝতে পারেননি সীতারাম । ছেলে সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী হলেও মার স্নেহের অন্ত নেই । সন্তান যেখানেই যান মার স্নেহছায়া সবখানেই আচ্ছন্ন করে থাকে তাকে ।

এই বছরেই এক কঠিন রোগে আক্রান্ত হন সীতারাম । ডাক্তাররা রোগের নাম বলল, সাইনোভাইটিস । ডান পায়ে অস্ত্রোপোচার করতে হবে । মা অক্লান্তভাবে অনুক্ষণ সেবা করে যেতে লাগলেন ।

আশ্চর্য এই মহাসাধক । কঠিন রোগভোগের মধ্যেও তিনি খুঁজে পেলেন ঈশ্বরের পরম অভিপ্রকাশ । দুঃসহ রোগযন্ত্রণার মধ্যেও কঠে

নিয়ত ধ্বনিত হতে লাগল রামনাম। আচ্ছন্ন আবিল অন্তরে নিয়মিত
চলল ইষ্টদেবের ধ্যান।

অস্ত্রোপোচারের সময় সাধারণতঃ রোগীকে অজ্ঞান করতে হয়। কিন্তু
সীতারামকে অজ্ঞান করতে হলো না। তিনি রামনাম করতে করতে
অস্ত্রোপোচারের দুঃসহ যন্ত্রণা হাসিমুখে সহ্য করলেন। মুখে এতটুকু
বিকার পর্যন্ত দেখা গেল না। দেহ থেকে মানসচেতনাকে এমন
অদ্ভুতভাবে বিচ্ছিন্ন করে নেবার ক্ষমতা দেখে বিস্ময়ে অবাক হয়ে গেল
ডাক্তারেরা।

রোগ জর্জরিত দেহটা বিছানায় বন্দী হয়ে থাকলেই বা, সীতারামের
মন কিন্তু একটি দিনের জন্মও সে বন্দীত্ব স্বীকার করে নিল না। মনের
ধর্ম কেবল এগিয়ে চলা আপনসাধনার পথে। বেদের ঐতরোয় ব্রাহ্মণের
মত চরৈষোতি মন্ত্রে দীক্ষিত সে মন একটি দিনের জন্মও থামতে জানে
না। কোন্ আবহমান কাল হতে শুরু হয়েছে সাবিত্রীদেবের অক্লান্ত
আকাশ পরিক্রমণ, তিনি যদি তাঁর চলার পথে একটি দিনের জন্ম
তদ্রাভিভূত হয়ে না পড়েন, একটি বারের জন্মও না থামেন তবে
সীতারামের মনই বা সহসা কেন থামবে তার চলার পথে। চলাই
হলো অমৃত।

শুয়ে শুয়েই ধ্যানে মগ্ন থাকতেন প্রায়। রাম নাম করতেন সব
সময়। এই সময় ভিতরে এক-এক সময় নাদ শুনতে পেতেন। সাধকদের
অন্তরে জ্যোতিরূপ পরমাঙ্গার প্রকাশের আগে বা পরে অথবা ইষ্ট-
দর্শনের সময় তাঁরা একরকম সূক্ষ্ম অলৌকিক ধ্বনি শুনতে পান। এই
ধ্বনিকে নাদ বলা হয়। নাদ সহস্র রকমের। তার মধ্যে বেশীর
ভাগই অব্যক্ত এবং কিছু ব্যক্ত নাদ অর্থাৎ যে-নাদের ধ্বনি জাগতিক
শব্দের সঙ্গে মেলে। ব্যক্ত নাদ শুনতে কখনো শব্দ বা মেঘের ধ্বনি
আবার কখনো-বা ঝরনার শব্দের মতো মনে হয়। যে সে সাধক নাদ
শুনতে পান না; নাদ সাধকের সিদ্ধি সূচনা করে। তাই বহু সাধনার
পর এই নাদ শুনতে পাওয়া যায়। অ, উ, ম যে তিনি অন্ধরে

ওঙ্কার মন্ত্র গঠিত, এই তিনটি অক্ষরের এক একটি নিয়ে নাদের অভ্যাস করতে হয়।

এই নাদ শুনতে শুনতে সাধকের চিত্ত হতে সব রকমের চিন্তা সংস্কার ও ভেদজ্ঞান চলে যায়। তখন সোহং ভাবে জ্যোতিরূপ আত্মার প্রকাশ হয় এবং প্রাণ ওঙ্কারে প্রবিষ্ট হয়। নাদের শেষ পরিণাম হলো ব্রহ্মলাভ। নাদের আবির্ভাব না হওয়া পর্যন্ত সাধককে ধ্যান করে যেতে হবে সাবধানে।

অস্ত্রোপাচারের পর রোগশয্যায় শুয়ে শুয়ে ধ্যানমগ্ন অবস্থায় এই নাদ শুনতে শুনতে সন্নিহিত হারিয়ে ফেলতেন সীতারাম। ক্রমশঃ ঘটত জ্যোতির্বিদ্যুরূপ আত্মার প্রকাশ।

ক্রমে ধীরে ধীরে সে উঠলেন সীতারাম। কিন্তু ডান পাটি কিছুটা খঞ্জ হয়ে গেল। কিন্তু সেদিন ঘুনাঙ্করে ভাবতে পারেন নি তিনি, তাঁর এই খঞ্জর একদিন তাঁকে শ্রীচৈতন্যদেবের অবতাররূপে নিঃসংশয়িতরূপে প্রতিষ্ঠিত করবে তাঁকে ভারতের সাধক-সমাজে; তাঁর এই দেহগত সামান্য একটি দুর্ঘটনা ধর্মজগতে এক মহান ঘটনারূপে চিহ্নিত হয়ে থাকবে যুগ যুগ ধরে; অজস্র মুমুক্শু মানুষের আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে আনবে এক বিরাট আলোড়ন।

এখন চলেছে ৪৭০ চৈতন্যাব্দ।

আজ হতে চারশ বছর আগে শ্রীচৈতন্যদেবের অন্যতম ঘনিষ্ঠ সহচর অচ্যুতানন্দ চৈতন্যদেবের পুনরাবির্ভাব সম্বন্ধে যে ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন আজ সীতারামের জীবনে সে বাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্যে পরিণত। তিনি যে সব লক্ষণগুলির কথা বলে গেছেন সেগুলি স্পষ্ট ফুটে উঠেছে সীতারামের মধ্যে। চৈতন্যদেব আবার বাংলাদেশে আবির্ভূত হবে। চারশো বছর পর এ-বিষয়ে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল ভক্ত অচ্যুতানন্দের এবং এই আবির্ভাব সম্বন্ধে তিনি লিখে গেছেন: তাঁহার (শ্রীচৈতন্যদেবের) দ্বিতীয় অংশে একটি চরণ নষ্ট হবে। ইনি জ্ঞানী ও বহুদর্শী হবেন। ব্রহ্মবিদ ও রামাহতি ধর্মের শ্রীসম্প্রদায়ভূক্ত

বলে প্রসিদ্ধ হবেন। গার্হস্থ্যশ্রমে এঁর নাম হবে প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ইনি শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের প্রীতিভাজন হবেন। তিনি দেশভ্রমণ করে ধর্মপ্রচার করবেন।

অচ্যুতানন্দের এই ভবিষ্যদ্বাণী সম্বলিত পুঁথিটির অনুবাদ করেন। কটকের র্যাভেনসা কলেজের অধ্যাপক শ্রীআর্তবল্লভ মহাস্তী। স্মরণ্য আজ ধাঁরা সীতারামকে শ্রীচৈতন্যদেবের অবতার বলে বিশ্বাস করেন, তাঁদের বিশ্বাসকে নিবিড়তম গুরুভক্তির প্রবল উচ্ছাসজনিত এক সহজ সংস্কার বলে উড়িয়ে দেয়া যায় না। তাঁদের এ বিশ্বাস এক অখণ্ডনীয় যুক্তির দৃঢ় ভিত্তিভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত।

ছাত্রাবস্থায় দিকসই গাঁয়ে দাশরথি ঠাকুরের কাছে থাকার সময় থেকেই চণ্ডীপাঠ শুরু করেন সীতারাম। এমন হৃদয়গ্রাহী চণ্ডীপাঠ কেউ কখনো কোথাও শোনেনি। শুধু কণ্ঠের মাধুর্য ও উচ্চারণভঙ্গীর আশ্চর্য স্পষ্টতাই এ পাঠের আকর্ষণীয় বস্তু নয়, তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে দেবীর রূপকল্পনা সম্বন্ধে এক নিবিড় অনুভূতি ও দেবীভক্তের জ্ঞানগত উপলব্ধি।

এ পাঠ যে শুনত সেই মুগ্ধ হয়ে যেত। সংসারের শতপাকে আবদ্ধ মানুষের মনও জাগতিক সমস্ত বিষয়চিন্তার বহু উর্ধ্বে উঠে গিয়ে আত্মশক্তির ধ্যানে তন্ময় হয়ে পড়ত। তাই তখন সবাই বলত, দাশরথি ঠাকুর নয়। তাঁর শিষ্যের মুখ থেকে চণ্ডীপাঠ শুনব।

আজ বহুদিন পর আবার চণ্ডীপাঠের ডাক পড়ল। ৩৪০ সালে জুবানন্দ গিরি মহারাজ এক ধর্মসভায় চণ্ডীপাঠের জন্য আমন্ত্রণ জানালেন সীতারামকে। সঙ্গে সঙ্গে সানন্দে রাজী হয়ে গেলেন সীতারাম। কিন্তু পাঠ শুরু করতে-না-করতেই আত্মশক্তিস্বরূপিনী পরব্রহ্মের ধ্যানে সমাধিস্থ হয়ে পড়লেন। উপস্থিত সকলে সীতারামের প্রতি এক বিস্ময়-বিমিশ্রিত শ্রদ্ধায় অভিভূত হয়ে উঠলেন।

বাহ্যজ্ঞান যথাসময়েই ফিরে পেলেন। কিন্তু এক নিবিড়

আধ্যাত্মিক অতৃপ্তিতে সমস্ত হৃদয় ভরে উঠল সীতারামের। অভিমানে ফুলে ফুলে উঠতে লাগল সমগ্র অন্তরাত্মা। দেখা দিতে-না-দিতেই কেন তিনি বারবার এমন করে চলে যান। এক বিন্দু আলো চকিতে ফুটে উঠতে-না-উঠতেই আবার তা কেন মিলিয়ে যায়।

প্রথমে মূর্ধস্থানে জয়গলমধ্যে একটি আলোকবিন্দু দেখা দেবে। জ্যোতিস্বরূপ পরব্রহ্মের এই চকিত বিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি নাদ শুনতে পাবেন। আর সঙ্গে সঙ্গে বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে ফেলবেন। এইভাবে কতক্ষণ থাকেন কিছু বুঝতে পারেন না। যোগশাস্ত্রে বলে, জীবাত্মা ও পরমাত্মার সমভাবে অবস্থানের নামই সমাধি। কিন্তু সীতারামের মনে হয় তাঁর এই সমাধিকাল বড়ই স্বল্পস্থায়ী। জেগে উঠে মনে হয় সব অন্ধকার। সব শূন্য। সব স্তব্ধ।

পৃথিবীতে এত আলো; কিন্তু চোখে অন্ধকার দেখতে লাগলেন সীতারাম। চারিদিকে শুধু অনায়া আর অবিচার সঘন অন্ধকার। পৃথিবীতে এত শব্দ; তবু কানে কিছুই শুনতে পাচ্ছেন না তিনি। পৃথিবীতে কত বস্তুর ছড়াছড়ি চারিদিকে; তবু মনে হলো ওরা সব অবস্তু।

তাঁর মনে হলো, একমাত্র ব্রহ্মের জ্যোতি ছাড়া আর কোন আলো নেই, নাদ ছাড়া আর কোন শব্দ নেই। আর যা আছে সব মিথ্যা। সব মায়া।

তা যদি হয় তবে কোথায় সেই পরম সত্য? কী করেই বা তাকে লাভ করা যায়?

কেন, তার দেখা আপন অন্তরে আগেই পেয়েছিল সীতারাম। কিন্তু না। এমন করে চকিতে একবার দেখা পেলেন হবে না। স্থায়ীভাবে ধরে রাখতে হবে সেই সত্যের জ্যোতিকে। তাড়াড়া আপন অন্তরের ক্ষুদ্র গণ্ডীটুকুর মধ্যে সে সত্যকে লাভ করলে চলবে না। এই বিশ্বের জলে-স্থলে অন্তরীক্ষে সর্বভূতে প্রত্যক্ষ করতে পারবেন যেদিন সেই সত্যকে, একমাত্র সেইদিন জানবেন প্রকৃত সিদ্ধিলাভ করেছেন তিনি

তাঁর সাধনায় ।

এই প্রকৃত সিদ্ধির জন্ম গভীরতর সাধনায় আত্মনিয়োগ করলেন সীতারাম । রামাশ্রমে ফিরে গিয়ে একটি গভীর গুহা কেটে তার মধ্যে প্রবেশ করলেন । বাইরের জগৎ হতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিলেন একেবারে ।

মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পাতন । কঠিন পণ করলেন সীতারাম । তাঁর সাধনার কঠোরতা এবং কৃচ্ছ্রসাধন দেখে ভয় পেলেন ভক্ত শিষ্য এবং আত্মীয় স্বজনরা ।

সে কী ভীষণ সাধনা ! আহার নেই, নিদ্রা নেই, কথাবার্তা নেই । একটিবারের জন্ম পৃথিবীতে আলো হাওয়ায় বেরিয়ে আসা নেই । কেবল একমনে জপ আর তপ । চিত্তভূমিকে সংযত করে ইন্দ্রিয়ের সব দ্বারগুলিকে রুদ্ধ করে মন বুদ্ধি অহংকারকে একেবারে অবলুপ্ত করে ধ্যান করে যেতে লাগলেন ।

ক্রমে পূজা, সন্ধ্যাকৃতিক, পাঠ প্রভৃতি কর্মগুলিরও অবসান হলো । রইল শুধু ধ্যান আর ধারণা । জপ আর তপ ।

অবশেষে সেই প্রার্থিত দিনটি এসে গেল ।

প্রথমে এক পরম পুলকে আগ্নুত হয়ে উঠল সীতারামের চিত্ত । মৃদু রোমাঞ্চ জাগল সারা অঙ্গে । তারপর নাদ শুনতে লাগলেন । দক্ষিণ ও বাম কর্ণকুহরে যথাক্রমে পুরুষ ও নারীকণ্ঠে কারা যেন বড় মধুর স্বরে হরিনাম শোনাচ্ছে ।

আলোর ঝরনা ঝরে যাচ্ছে যেন সেই অন্ধকার গুহাপ্রদেশে । সে এক অপূর্ব অনাস্বাদিতপূর্ব অনুভূতি । গুহার মধ্যে আর স্থির হয়ে বসে থাকতে পারলেন না সীতারাম । বহুদিনের মৌন ভঙ্গ করে গুহা থেকে হরিনাম করতে করতে ছুটে বেরিয়ে এলেন । তিনি স্বকর্ণে গুহার ভিতর বহুকণ্ঠে গীত তারক ব্রহ্ম 'হরে কৃষ্ণ' নাম শুনেছেন । এই নামগানের শব্দই বহু আকাঙ্ক্ষিত নাদরূপে আবির্ভূত হয়েছে তাঁর অন্তরে ।

এই নামই তাঁর সাধনার মূলমন্ত্র । এই নামের মহিমাতেই তিনি

লাভ করেছেন সিদ্ধি। কিন্তু শুধু নিজের মুক্তিই তো বড় কথা নয়। এবার থেকে এই নামপ্রচারের মধ্য দিয়ে আনতে হবে অজস্র জীবের মুক্তি। এই নামগানের শক্তিতে তিনি সর্বভূতে তাঁর ইস্টদেবকে প্রত্যক্ষ করবেন।

সিদ্ধিলাভের সঙ্গে সঙ্গে গুহা থেকে বেরিয়ে এসে মৌন ভঙ্গ করে নামের মহিমা সম্বন্ধে এক সংক্ষিপ্ত উপদেশ বাণী দান করেন ঠাকুর সীতারাম। তিনি বললেন।

“শ্রদ্ধা অশ্রদ্ধা, বিশ্বাস অবিশ্বাস সব ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে নাম করো। নামের শক্তিই তোমাকে শ্রদ্ধা, বিশ্বাস, ভক্তি দেবে—পরমকে পাইয়ে দেবে। কবে ভক্তি রুচি বিশ্বাস আসবে সেজন্য বসে থেকে না।”

সাধনার বলে যাঁর প্রাণ ওঙ্কারে প্রবিষ্ট হয়ে গেছে সেই মহাসাধক সীতারাম দাসকে পণ্ডিতগণ এবার ওঙ্কারনাথ উপাধিতে ভূষিত করলেন।

এবার থেকে দীক্ষাগুরুরূপে অবতীর্ণ হলেন সীতারাম। ‘হরে কৃষ্ণ’ এবং ‘হরে রাম’ এই দুটিই তাঁর কাছে দীক্ষামন্ত্র। এই নামমন্ত্রের সাহায্যে অজস্র জীবের উদ্ধার সাধন করবেন তিনি।

পরের বছর পুরীধামে জগন্নাথদেব প্রকট হয়ে দর্শন দান করেন সীতারামকে। সেদিন ছিল ১৩৪৪ সালের ১০ই বৈশাখ। শেষরাত্রিতে জগন্নাথদেব স্বয়ং দর্শন দান করে বলেন, যা যা নাম প্রচার করগে।

এইভাবে অচ্যুতানন্দের পুঁথিতে উল্লিখিত সীতারামের অবতার-জীবন সম্পর্কে আর-একটি কথা প্রমাণিত হলো। তাতে লেখা ছিল, ইনি জগন্নাথ দেবের প্রীতিভাজন হবেন।

নাম প্রচারের ব্রত আগেই গ্রহণ করেছিলেন সীতারাম। এবার থেকে তাতে মনপ্রাণ সমর্পণ করে বাঁপিয়ে পড়লেন। তাঁর অন্তরের আসল কথাটিই যেন জগন্নাথদেবের বাণী হয়ে ফুটে উঠেছে।

নাম প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে শুরু হলো চাতুর্মাস্য ব্রত উদ্‌যাপন। এই ব্রতপালন ঠাকুর সীতারামের সাধক জীবনে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

এই ব্রতের অর্থ হলো, চার মাস এক স্থানে অবস্থান, অখণ্ড নামকীর্তন, যজ্ঞ, তপ, পাঠ ও ধর্মালোচনা। সঙ্গে সঙ্গে চলে অন্ন মহোৎসব।

দূর-দূরান্ত থেকে হাজার হাজার মানুষ ছুটে এসে এই অখণ্ড নামকীর্তনে যোগ দেয়। মহোৎসবের বিরাট অন্নখণ্ডে সকলেই প্রসাদ পায়। দেখে-শুনে ঠাকুর সীতারামের আনন্দ আর ধরে না। কিন্তু কোথা হতে কারা এই বিরাট যজ্ঞের আয়োজন করে। কোথা হতে এত জিনিসপত্র আসে তা কেউ বুঝতেই পারে না। এ এক আশ্চর্য ব্যাপার।

এই ব্রত প্রতিবারই এক জায়গায় অনুষ্ঠিত হয় না। কখনো ডুমুরদহে, কখনো কটকে, যখন যেখান থেকে আমন্ত্রণ আসে। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে এত আমন্ত্রণ আসে যে তাতে সাড়া দেয়া সব সময় সম্ভব হয়ে ওঠে না।

নামের মতো জ্ঞান নেই নামের মতো ব্রত নেই।

নামের মতো ধ্যান নেই নামের মতো ফল নেই ॥

নামের মতো ত্যাগ নেই নামের মতো সংযম নেই।

নামের মতো পুণ্য নেই নামের মতো গতি নেই ॥

যুক্তি নয়, বিচার নয়, তর্ক নয়, শুধু নাম করে যাও। ইচ্ছা সাক্ষাৎকার হবেই হবে। শুধু জ্ঞানের দ্বারা ইচ্ছালাভ হয় না। দেবতার প্রসাদ লাভ করা যায় না।

ঠাকুর এক সহজ সুন্দর উদাহরণ দিয়ে এই সত্যটি বুঝিয়ে দিয়েছেন। রাজার প্রচুর ধন-ঐশ্বর্য আছে—এ কথা শুধু জ্ঞানের দ্বারা জানলেই কারো দুঃখ যাবে না, সেবার দ্বারা গুণকীর্তনের দ্বারা তাঁকে সন্তুষ্ট করলে তার কিছু পাওয়া যাবে তাঁর কাছ থেকে। তেমনি রাম, কৃষ্ণ, শ্যাম-শ্যামা, ব্রহ্ম, সোহং প্রভৃতি আমাদের ইচ্ছাদেবতা যার যাই হোক না, শুধু জ্ঞানের দ্বারা তাঁকে জেনে কোন লাভই হবে না আমাদের। ভজনার দ্বারা নামকীর্তনের দ্বারা তাঁকে তুষ্ট করে তাঁর কৃপা লাভ করতে হবে। একমাত্র নামের দ্বারাই ভগবানের

অপার মহিমা কে জীবনে প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করতে পারি আমরা।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পর নামের এই অনন্ত মহিমা আর কোন সাধক এমন করে প্রচার করেননি সারা ভারতে। আর কোন সাধক অজস্র পাণীতাপী জীবের উদ্ধারের জন্য এমনভাবে পাগল হয়ে ছুটে বেড়াননি।

শ্রীচৈতন্যদেবের পর একমাত্র ঠাকুর সীতারামই সেই আশ্চর্য সাধক যিনি নামের মধ্যেই লাভ করেছেন সকল সিদ্ধির সার। অনন্ত জীব-প্রেমের মধ্যেই খুঁজে পেয়েছেন আপন মুক্তিকে।

প্রথমে গেলেন উত্তর-ভারত। দিল্লী, দেরাহুন, এলাহাবাদ, কান্ধী, বন্দাবন, মথুরা প্রভৃতি আরও কত জায়গা। যখন যেখানেই যান ঠাকুর সীতারাম, অভূতপূর্ব সাড়া জাগে সেখানে। নামগান শুনতে শুনতে নাম প্রেমে মাতোয়ারা হয়ে দলে দলে অসংখ্য মানুষ ছুটে আসে।

উত্তর-ভারতের পর মধ্যভারত। তারপর উড়িষ্যা হয়ে দক্ষিণ-ভারত। সেখানেও সাড়া জাগল বিরাট।

পথে যেতে যেতে ভাবেন ঠাকুর সীতারাম, যেখানেই যান, সব জায়গা সব মানুষকেই এমন ভাল লাগে কেন। বিদেশ বিড়ুঁই বলে মনেই হয় না। মনে হয় এসব জায়গা এই সব মানুষ তাঁর কতদিনের চেনা, কত আপনার। তবে কি এটা নামের গুণ?

তা নয়ত কী। নামই অমৃত।

এই অমৃত সিঞ্চনের সঙ্গে সঙ্গে মধু বরতে থাকে যেন জলে স্থলে অন্তরীক্ষে। মধুময় হয়ে ওঠে সমস্ত দুালোক ও ভূলোক। মধুময় হয়ে ওঠে পৃথিবীর প্রতিটি ধূলি-কণা। প্রেমময় হয়ে ওঠে প্রতিটি জীব। নামগানের মধুর ধ্বনি কানে যাবার সঙ্গে সঙ্গে শুধু জীবাত্মাই পর-মার্থলাভের জন্য আকুল হয়ে ওঠে না, এই ধ্বনিতে এক অভিনব প্রাণ চেতনায় সঞ্জীবিত হয়ে ওঠে প্রতিটি জড় পদার্থ।

নামের এমনি গুণ। নাম করতে করতে সব কিছু ভাল লাগে। সমস্ত হিংসা বা ঘেঁষাভাব চলে যায়।

উচ্চকণ্ঠে নামগান করে। যার ঠাকুর দেবতায় কোন ভক্তি বা আস্থা নেই এমন ভোগবাদী স্বার্থপর লোকের মনও তাতে টলে উঠবে। নামগানের ছন্দায়িত ধ্বনিস্পন্দন ক্রমাগত তার মধ্যে গিয়ে এক আলোড়ন সৃষ্টি করবে তার মনোজগতে। সে নিশ্চয়ই ভাববে, যে-জীবন সে যাপন করছে, এইটাই সব নয়। এই পারিবারিক সুখশান্তির উর্ধ্বে আরও একটা জিনিস পাবার আছে। সেইটাই হচ্ছে পরমার্থ। এই ভাবে নাম গানের মধ্যে সে খুঁজে পাবে এক অনাস্বাদিতপূর্ব রস। নাম-গান শুনে যদি এর রস পাওয়া যায় তাহলে স্বকণ্ঠে উচ্চারণ করলে না জানি কত গভীর হবে সে রসের আনন্দ।

সমস্ত ভারত পরিক্রমা করার পর আবার ফিরে এলেন বাংলা দেশে। প্রতিটি জেলায় জেলায় ঘুরে নাম প্রচার করে বেড়াতে লাগলেন অজস্র মানুষকে দীক্ষা দিলেন। কত মধুর কথামৃত দান করে তাদের মনের সব সংশয় ও অবিশ্বাস দূর করে দিলেন।

যদি নাম জপ করে সিদ্ধি লাভ করা যায় তাহলে কি শাস্ত্রপাঠের কোন প্রয়োজন নেই? এ প্রশ্ন অনেকের মধ্যেই মাঝে মাঝে জাগে। এ প্রশ্ন অবশেষে ঠাকুর সীতারামের কানে গিয়ে পৌঁছায়। এ প্রশ্নের ঠাকুর যে উত্তর দেন তার মধ্যে তাঁর একটি মহান বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে।

চৈতন্যদেবের মতো ঠাকুর সীতারাম শুধু নামকৈবল্যবাদী নন। নামের প্রতি মানুষের অনুরাগ স্থায়ী ও গভীর করে তোলার জন্যই তিনি শাস্ত্রপাঠের পক্ষপাতী। তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন শাস্ত্র পাঠের প্রয়োজন নামে অনুরাগ আনবার জন্য; কেমন করে নাম করতে হয়, নামীর স্বরূপ, নামীর লীলা, এই সব শাস্ত্রে বর্ণিত আছে। শাস্ত্র না পড়লে নামে অনুরাগ আসবে কেন?

যতক্ষণ পর্যন্ত না মানুষের চিত্তশুদ্ধি হয় ততক্ষণ সে ইচ্ছা করলেই সদাসর্বদা নাম করতে পারে না। ক্ষণে ক্ষণে ঘটে তার চিত্তচাঞ্চল্য। এই চিত্তশুদ্ধির জন্যই স্মৃতিশাস্ত্র পাঠের প্রয়োজন। কখন শয্যাভ্যাগ করতে হয়, কখন স্নান, সন্ধ্যা পূজা, আরতি, তর্পণ, অতিথিসেবা

করতে হয়, কখন কেমন আহার বিহার করলে চিত্তশুদ্ধি হয়, চিত্ত ভবনয় হয়, স্মৃতিশাস্ত্রে তা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

তারপর পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত, বেদ, উপনিষদ প্রভৃতি শাস্ত্রে নাম ও নামীর মহিমাই বিচিত্রভাবে কীর্তিত হয়েছে। পুরাণ না থাকলে আমরা রামনাম জপের ফলে রত্নাকরের আশ্চর্য উদ্ধার কাহিনীর কথা জানতে পারতাম না। মৃত্যুকালে অজামিল পুত্রকে 'নারায়ণ নারায়ণ বলে ডেকে পরমগতি লাভ করে ছিলেন, একথাও আমরা জানতে পারতাম না। পুরাণ না পড়লে কেমন করে জানতে পারতাম আমরা ভক্ত প্রহ্লাদের কাহিনী ?

গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অজুর্নকে বলেছেন, শ্রদ্ধায় বা হেলায় যে ভাবেই হোক, যে আগার নাম করে হে পার্থ, তুমি জেনো যে সে আমার হৃদয়ে বাস করে। কিন্তু মহাভারত পাঠ না করলে গীতার এই উপদেশামৃত আমরা পেতাম না। তারপর বেদ উপনিষদ না থাকলে আমরা জ্ঞান ও কর্মের প্রকৃত মর্ম বুঝতে পারতাম না। উপনিষদ না থাকলে কে বলে দিত ব্রহ্মের স্বরূপ ?

নিজ নিজ সাধনার অনুকূল শাস্ত্র আলোচনা না করলে নামে একান্ত অনুরাগ আসে না। কেবল সত্য নির্ণয় করে একটিকে বেছে নিয়ে তাতে একাগ্র হবার জন্মই শাস্ত্র। তাই শাস্ত্র পাঠের একান্ত প্রয়োজন। শাস্ত্রবাক্য চিরসত্য ; দূরদৃষ্টিসম্পন্ন।

শাস্ত্রপাঠের পর আসে প্রতিমা উপাসনার কথা। এ বিষয়েও আছে ঠাকুর সীতারামের সূচিস্থিত অভিমত। কোন সাধক একবারেই সিদ্ধি লাভ করতে পারে না। বাহ্য পূজা এক ধরনের প্রস্তুতি। পরিশেষে সাধকের সমগ্র চিত্ত ইচ্ছাচিন্তায় একেবারে তন্ময় ও বিভোর হয়ে গেলে পূজার আর প্রয়োজন হয় না।

ঠাকুর বলেছেন, সত্য যুগে ধ্যানের দ্বারা জ্ঞান সিদ্ধি হত। ত্রেতা যুগে তপস্যার দ্বারা। দ্বাপরে যাজ্ঞন এবং কলিযুগে প্রতিমা পূজার দ্বারা জ্ঞান লাভ হয়। পূজা হতে ভক্তি উৎপন্ন হয়। ভক্তির দ্বারা জ্ঞান

লাভ হয় ; জ্ঞান হতে লাভ হয় বিজ্ঞান বা অপরোক্ষ জ্ঞান । এই জ্ঞানলাভের ফলে সব ভেদ দূর হয়ে যায় এবং সর্বভূতে ঈশ্বরের স্বরূপ প্রত্যক্ষ হয় ।

মনুসংহিতায় আছে : পূজায় অদৃশ্য পুণ্য নাস্তি লোকত্রয়েষপি । পূজার সমান পুণ্যকাজ আর ত্রিভুবনে নেই ।

এই পূজা আবার পাঁচ রকমের । পাঁচ রকমের পূজায় পাঁচ রকমের মুক্তি লাভ হয় । পাঁচ রকমের পূজার নাম হলো অভিগমন, উপাদান, যোগ, স্বাধ্যায় ও ইজ্য। অভিগমনের অর্থ হলো দেবতার স্থান মার্জন ও উপলেশ । উপাদানের অর্থ, গন্ধ পুষ্পাদি চয়ন । ইষ্টদেবতাকে আপনার আত্মা এই ভাবে চিন্তা করার নাম যোগ । মন্ত্রার্থসন্ধানপূর্বক জপ, স্তোত্রাদি পাঠ, হরিসংকীর্তন, ও শাস্ত্র অভ্যাসের নাম স্বাধ্যায় । ইজ্য হলো স্থায়ী দেবতার যথার্থভাবে পূজা ।

অভিগমনে সাষ্টি বা তত্তুল্যরূপ মুক্তি, উপাদানে সামীপ্য বা নৈকট্য রূপা মুক্তি, যোগে সালোক্য মুক্তি, স্বাধ্যায়ে সাযুজ্য বা অভেদ মুক্তি এবং ইজ্যায় স্বরূপ্য বা সমানরূপতা মুক্তি লাভ হয় ।

পূজার আর একটি গুণ আছে । একটি ঘরে ঠাকুর রেখে নিত্য তিনবেলা ফুলচন্দন ধূপ দীপ দিয়ে পূজা আরতি ও নাম সংকীর্তন করতে থাকলে পূজকের অন্তরে বাইরে এক সাত্ত্বিক আবহাওয়ার সৃষ্টি হয় । পূজাবাদ অর্থাৎ শজঘণ্টা ও নাম সংকীর্তনের শব্দে প্রচুর সাত্ত্বিক পরমাণু নিত্য আকর্ষিত হতে থাকে । সেই সাত্ত্বিক পরমাণুতে ক্রমে পূজার ঘরখানি পূর্ণ হয়ে যায় । পূজার প্রসাদ ও শাস-প্রশাসের মধ্য দিয়ে সাত্ত্বিক পরমাণু শরীরে প্রবেশ করতে থাকে । এইভাবে পূজক সত্ত্বগুণের অধিকারী হয় । ইষ্টের ধ্যান করতে করতে তন্ময় হয়ে যায় এবং অবশেষে সে সিদ্ধিলাভ করে ।

হরে কৃষ্ণ আর হরে রাম ।

শুধু দুটি নাম । কিন্তু কী অদ্ভুত মহিমা এই দুটি নামের যে নামের বলে শতকোটি যজ্ঞ, তীর্থভ্রমণ, সত্য, দয়া, দম, দান, ব্রহ্মচর্য,

ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, জ্ঞান, পুণ্য প্রভৃতি সব কিছুর ফল পাওয়া যায়।

অথচ একটু ভেবে দেখলে দেখা যাবে এঁরা দুজনেই আমাদের অন্তরের অন্তরতম। এঁদের বিরাট দৈবী সত্তা আমাদের ক্ষুদ্র মানব সত্তার সঙ্গে নিবিড়ভাবে রয়েছে জড়িয়ে।

কৃষ্ণ কে ?

যে পরমানন্দ সত্তা আমাদের নিত্য আকর্ষণ করছেন, ভববন্ধন ছিঁড়ে তাঁর সঙ্গে মিলিত হবার জন্য আহ্বান করছেন তিনিই হলেন কৃষ্ণ। আমরা যতই তাঁকে ডাকব তিনিই ততই এগিয়ে আসবেন আমাদের কাছে।

রাম কে ?

যে পরমানন্দ সত্তা যোগীদের অন্তরে নিত্য লীলা করেন তিনিই হচ্ছেন রাম। ঠাকুর সীতারাম বলেছেন, 'রা' বলে মুখ হাঁ করলে সব পাপ চলে যায় আর 'ম' বলে মুখ বন্ধ করলে আর কোন পাপ ঢুকতে পায় না।

রাম এবং কৃষ্ণ এঁরা দুজনেই হরি। কারণ এঁরা দুজনেই আমাদের পাপ, তাপ, ক্লেশ ও সমস্ত ভূভার হরণ করেন। আসলে কিন্তু এঁরা দুই নন। এঁরা এক।

কিন্তু শুধু এই নামেই যে ডাকতে হবে এমন কোন কথা নেই। যে নামেই ডাক, শেষে কিন্তু সেই ডাক তাঁর কানে গিয়েই পৌঁছবে।

শুধু নাম জপ কর। নিগুণ সগুণ যে রূপে যে-ভাবে তাঁকে চাও সেইরূপে সেইভাবেই তাঁকে পাবে।

কিন্তু এখানে অনেকের মনে একটি প্রশ্ন জাগতে পারে এবং এ প্রশ্ন দুই একজন ভক্ত করেছেন ঠাকুরকে। প্রশ্নটি হলো, অন্য মনে ডাকলে তিনি কি কৃপা করেন? অনেক সময় আমি তাঁকে ডাকতে চাই, কিন্তু ডাকতে গিয়ে দেখি মন সরে যাচ্ছে। তাহলে এটা কি মিথ্যাচার হবে ?

এ প্রশ্নের উত্তর ঠাকুর দিয়েছেন অত্যন্ত সহজ উদাহরণ সহযোগে।

তিনি বলেছেন, মনকে জয় করবার জন্য যে চেষ্টা তা কখনোই মিথ্যাচার হতে পারে না। লোক ঠকানোর জন্য সাধু সেজে সাধনার ভাণ করাই হলো মিথ্যাচার।

তাছাড়া সাধক অবস্থায় মনের চঞ্চলতা থাকবে বৈকি ! অত্ন মনে ডাকলেও তিনি কৃপা করবেন। আমার নাম যদি অত্ন মনে ডাক, তাহলে আমি কি সাড়া দেব না ? না তোমার কাছে, যাব না ? তোমার কাছে গিয়েও যদি দেখি তুমি অত্নমনস্ক হয়ে রয়েছে তাহলেও বলব, এসেছি। তেমনি তাঁকে অত্ন মনে ডাকলেও তিনি এসে বলবেন, আমি এসেছি।

তিনি আরও স্পষ্ট করে নামের মহিমা সম্বন্ধে এক জায়গায় বলেছেন, বস্তুগুণ যাবে কোথায় ? অবিশ্বাস করে অশ্রদ্ধা করে একটু নাইট্রিক এ্যাসিড গায়ে ঢেলে দিয়ে দেখ না। সেইরকম রাম নাম গা' তো, উচ্চৈশ্বরে গা। শান্তি অনিবার্য।

বার বার নাম জপ করতে করতে ভক্ত ইষ্টদেবের দর্শন পায়। একদিন ঠাকুর সীতারাম এ-বিষয়ে একটি বাস্তব ঘটনার উল্লেখ করেন শিষ্যদের কাছে।

বীরভূম জেলায় বিরূপাক্ষ নামে এক সাধু ছিলেন। তিনি যে মন্ত্র জপ করতেন, সে মন্ত্র ভুল ছিল। কিন্তু তাঁর গুরুমন্ত্র ও ইষ্টদেবে গভীর বিশ্বাস আর কঠোর সাধনা দেখে ইষ্টদেবী স্থির থাকতে পারলেন না। মা অত্ন রূপে এ.স বললেন, তোর মন্ত্র ভুল আছে, তুই গুরুর কাছে ঠিক করে নে।

বিরূপাক্ষ বললেন, কে তুই ? না না, গুরুদেবের মন্ত্র ভুল কখনোই হতে পারে না।

সুতরাং আবার সেই মন্ত্রই জপ করে যেতে লাগলেন বিরূপাক্ষ। মা আবার এসে বললেন, বল, আমাকে কী করতে হবে ?

বিরূপাক্ষ ভাবলেন, কে ইনি ? বার বার কেনই বা আসছেন ? ইষ্টদেবী নন তো ? তাহলে কেনই বা নিজরূপে আসছেন না ? তারপর

বললেন, একটা কাজ তোকে করতে হবে। আমার আসনের পাথর-
খানা আনি যেখানে যাব নিয়ে যেতে পারবি ?

দেবী বললেন, তথাস্তু।

এইভাবে বিরূপাক্ষ যেখানেই যান তাঁর আসনের পাথরখানা মা বয়ে
নিয়ে বেড়ান। অবশেষে একদিন মা বিরূপাক্ষের গুরুদেবের কাছে
গিয়ে বললেন, বাবা, বিরূপাক্ষের মস্তকটি ঠিক করে দাও। আমি তাকে
নিজ মূর্তিতে দেখা দিতে পারছি না। পাথর বয়ে বেড়াতে হচ্ছে।

গুরুদেবে বিরূপাক্ষের কাছে এসে মস্তকটি ঠিক করে দিলেন। সেই
মস্তক জপ করে ইষ্টদেবীর দর্শন লাভ করলেন বিরূপাক্ষ।

ঠাকুর সীতারাম দীক্ষাগুরু হিসাবে এক পরম বৈশিষ্ট্যের পরিচয়
দিয়েছেন। গুরু শিষ্যের সম্পর্কটিকে তিনি এক আশ্চর্য মাধুর্য ও
সম্মতি দান করেছেন। ভক্ত শিষ্যদের প্রতি তাঁর স্নেহ যেমন
অপরিসীম তাদের প্রতি সহানুভূতি তেমনি গভীর। এক গভীর
সহানুভূতির সঙ্গে শিষ্যদের সাধন-পথের সুবিধা অসুবিধাগুলি শোনেন
এবং সঙ্গে সঙ্গে তার প্রতিকারের পথ বলে দেন।

একবার পুরীতে থাকাকালে ঠাকুর সীতারামের কাছে ওড়িশ্যা-
দেশীয় এক বিধবা যুবতী এসে দীক্ষা প্রার্থনা করে। যুক্তকণ্ঠে
স্বীকারোক্তি করে সে বলে, সে একজন ভ্রষ্টা ও পাপিষ্ঠা। কিছুদিন
আগে সে কুলত্যাগ করে একজন লোকের সঙ্গে শহরে চলে আসে।
কিন্তু লোকটি তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে তাকে ত্যাগ করে চলে
যায়। এখন তার মোহভঙ্গ হয়েছে। সে নিজের ভুল বুঝতে
পেরেছে। এখন সে ঠাকুরের চরণে আশ্রয় চায়।

ঠাকুর বললেন, নাম করো এক মনে ; সব ঠিক হয়ে যাবে।

কোথাও বিরাম নেই ঠাকুর সীতারামের। যেখানেই যান অসংখ্য
নরনারী এসে ছেকে ধরে তাঁকে। দীক্ষা দাও ঠাকুর। উদ্ধার
করো।

ঠাকুরের মুখে ওই এক কথা। শ্রীচৈতন্যদেবের মতো তাঁরও দৃঢ়

বিশ্বাস, কলৌ নাস্ত্যেব গতিরগুণা। কলিকালে নাম ছাড়া অণু কোন পথ নেই। অণু কোন গতি নেই।

নাম জপ করতে করতে স্থূলদেহ শোধন করতে হবে। দেহ শোধন না করলে ইষ্টদেবের সঙ্গে মিলন সম্ভব নয়। দেহের অভিমান ও ইন্দ্রিয় চেতনাই জীবাত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে এক দুস্তর প্রাচীর খাড়া করে রেখেছে।

ঠাকুর সীতারাম একটি উদাহরণ দিয়ে বলেছেন, একটি কলসীতে গঙ্গাজল ভরে কলসীটা গঙ্গায় ভাসিয়ে দে। কলসীর জলে আর গঙ্গার জলে আসলে কোন ভেদ না থাকলেও কলসীর ব্যবধানের জন্মই কলসীর জল গঙ্গার জলের সঙ্গে মিশে এক হতে পারছে না। কলসীটা ভেঙ্গে গেলেই দুটি জল এক হয়ে যায়। তেমনি ভগবৎ সাগরে ডুবে থেকেও আমাদের দেহঘটের জন্মই পৃথক হয়ে আছি। তাঁর সঙ্গে একেবারে একাত্ম হয়ে যেতে পারছি না।

স্থূল দেহ শোধন শুরু হলেই নানারকমের প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় সাধকের জীবনে। প্রথমে অশরীরে বহিরঙ্গের কম্পন, রোমহর্ষ ও হৃদকম্প হয়, হাত পায়ের নানারকমের ভঙ্গী হয়।

পরে শোধিত সূক্ষ্ম শরীরে অলৌকিক শব্দ স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধের আবির্ভাব হয়। শরীর স্থির হলেই জোনাকির মতো অথবা প্রদীপের কত জ্যোতি দেখতে পাওয়া যায়। রাম, কৃষ্ণ, কালী, দুর্গা প্রভৃতি নানা দেবদেবীরও দেখা যায়।

কিন্তু এতে বিস্ময় ও গর্ব এই দুটি অনুভূতির কোনটি জাগলে চলবে না সাধকের অন্তরে। এই অলৌকিক অভিজ্ঞতার জন্ম কোন বিস্ময় বা গর্ব জাগলেই সাধনার বিশেষ ক্ষতি হয়।

এইভাবে এক মহাসাধক তাঁর দীর্ঘ সাধন জীবনের লৌকিক অলৌকিক অজস্র অভিজ্ঞতার অমূল্য কথা শিষ্যদের কত সহজ করে বুঝিয়ে দিয়েছেন।

যাঁরা যোগসিদ্ধ মন্ত্রসিদ্ধ মহাপুরুষ তাঁদের এই লৌকিক বাস্তব জীবনের অন্তরালে এক অলৌকিক দিব্যজীবন থাকে লুকিয়ে। সে জীবনকে তাঁরা লোকচক্ষু হতে আড়াল করে রাখলেও মাঝে মাঝে বেরিয়ে আসে দিব্য জীবনের এক অপূর্ব জ্যোতি। তাঁরা কোন যোগ-বিভূতি প্রকাশ করতে না চাইলেও মাঝে মাঝে বিভিন্ন কর্মের মধ্যে আপনা থেকে ফুটে ওঠে সে বিভূতি।

তাহাড়া যে কোন আত্মিক বা আধ্যাত্মিক শক্তিহীতো অলৌকিক।

আমরা যারা দেহের মায়ায় সব সময় আবদ্ধ আছি, যারা আত্মাকে চিনি না, জানি না তাদের কাছে যে কোন আত্মিক বা আধ্যাত্মিক ক্রিয়াকাণ্ড অলৌকিক মনে হওয়াই স্বাভাবিক।

ঠাকুর সীতারামের অনেক অলৌকিক শক্তির পরিচয় অনেক ভক্তই প্রত্যক্ষ কারছেন তাঁদের বাস্তব জীবনে।

বেশী দিনের কথা নয়। ১৯৬১ সালের ১৮ই মে তারিখ ভক্ত শিষ্য অজিতকুমার ঠাকুরের অলৌকিক মহিমার প্রত্যক্ষ পরিচয় পেয়ে আশ্চর্য হয়ে যান। ঘটনাটি ঘটে ঠাকুরের কাছে দীক্ষা গ্রহণের মাত্র ছয় মাস পরে। কলকাতার বাসায়।

সেদিন তাঁর স্ত্রী স্নানের ঘরে পড়ে যান। অত্যধিক রক্ত বের হওয়ার ফলে অজ্ঞান হয়ে পড়েন। সঙ্গে সঙ্গে মেডিকেল কলেজে নিয়ে যাওয়া হয়। রক্ত দেবার ব্যবস্থা হয়। কিন্তু রোগীর রক্তধারনেরও ক্ষমতা নেই, অক্সিজেন দেয়া হতে লাগল। প্রায় শেষ অবস্থা।

এমন সময় হাসপাতালের বারান্দায় বসে অজিতকুমার আকুল হয়ে ঠাকুর সীতারামকে ডাকতে লাগলেন। ডাক্তাররা ছুটে ছুটি করছেন রোগীর প্রাণ বাঁচাবার জন্য। কিন্তু তিনি স্থিরভাবে বসে ঠাকুরের কাছে কাতরভাবে প্রার্থনা করতে লাগলেন, 'হে ঠাকুর, এই সর্বনাশ কেন হবে? ছেলে মেয়ে নিয়ে আজ কেন আমি পথে দাঁড়াব তোমার চরণে আশ্রয় যখন নিয়েছি? জানি, আমি, শত অবরোধে অপরাধী, তবু শরণাগতকে রক্ষা করো। দয়া করো।

বেলা তখন বারোটা। ঠাকুরকে এক মনে এক প্রাণে ডাকতে ডাকতে বাহুজ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলেন অজিত কুমার। কতক্ষণ এ ভাবে ছিলেন কিছুই খেয়াল ছিল না তাঁর। বহুক্ষণ পর একজন ডাক্তারের ডাকাডাকিতে যখন হুঁস হলো, তখন দেখলেন বেলা তখন পাঁচটা। ডাক্তার তাঁকে বললেন, আপনি কান্দছেন আর বিড়বিড় করে কী বকছেন? আর কোন ভয় নেই, আপনি খেতে যান। রোগী আস্তে আস্তে সুস্থ হয়ে উঠছেন।

সত্যি সত্যিই দেখা গেল, সন্ধ্যা হতেই রোগীর সম্পূর্ণ জ্ঞান ফিরে এল এবং রাত্রির মধ্যেই তিনি সুস্থ হয়ে উঠলেন।

ডাক্তারদের চিকিৎসা শাস্ত্র অনুসারে সব করণীয় যখন শেষ হয়ে গেল তখন সেই অবধারিত মৃত্যুর কবল থেকে রোগিনী কিভাবে জীবন ফিরে পেল তা ভেবে আশ্চর্য হয়ে গেলেন ডাক্তারেরা। তারপর অজিতকুমার সব কথা ভেঙ্গে বললে তাঁরা সকলেই সীতারামের আলৌকিক মহিমার কথা স্বীকার না করে পারেননি না।

ঠাকুরের প্রিয় শিষ্য শশাঙ্কশেখর বাগচী মহাশয়ও একবার তাঁর আলৌকিক মহিমা প্রত্যক্ষ করেন নিজের চোখে।

বাগচী মহাশয় তখন লুগলী কলেজের অধ্যাপক। সেবার পিতৃ শ্রাদ্ধোপলক্ষে তিনি শ্রাদ্ধের দিন ঠাকুরের উপস্থিতি প্রার্থনা করেন। ঠাকুর তখন অল্প এক জায়গায় নাম যজ্ঞে ব্যস্ত ছিলেন। তিনি জানালেন, সর্ব কার্য সুসম্পন্ন হবে।

বাগচী মহাশয়ের চুঁচুড়োর বাড়িতে অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়েছে। তখন শ্রাবণের শেষ। আকাশে মেঘের ঘনঘটা। এদিকে ভোর হতেই মুক্ত অঙ্গনে হরিনাম শুরু হয়েছে। বহু লোক সমাগম হয়েছে। কোন চাঁদোয়ার ব্যবস্থা করা হয়নি। সেদিন বহু লোকই আশ্চর্য হয়ে দেখল, চুঁচুড়োর চারিদিকেই মুখলধারে রুপ্তি হচ্ছে, অথচ শ্রাদ্ধবাসরের আশে পাশে কোথাও এক ফোটা রুপ্তিও পড়ছে না।

ঐদিনই আর একটি আশ্চর্য ঘটনা দেখা গেল। ঠাকুর সীতারাম

নিজে আসতে না পারায় কাজকর্মে সাহায্য করার জন্য তাঁর প্রিয় শিষ্য মহাবীরকে পাঠিয়েছেন। তিনিও খুব পরিশ্রম করছেন। সন্ধ্যার সময় দেখা গেল, তখনো একশো নিমস্ত্রিত অভুক্ত রয়েছেন, অথচ ভাঁড়ারে মাত্র গোটাকতক মিষ্টি পড়ে রয়েছে।

ভক্তপ্রবর মহাবীর তখন ঠাকুরের একখানি ছবি বুকে করে ভাঁড়ারে নিয়ে গিয়ে কাতরভাবে ঠাকুরের কাছে গৃহস্বামীর মান রক্ষা করবার জন্য প্রার্থনা করলেন।

পাতা পেড়ে সব লোককে বসিয়ে দেওয়া হলো। চাহিদামত সকলকে মিষ্টিও দেওয়া হলো। অথচ দেখা গেল সকলের খাওয়ার পরও আরও কিছু উষ্ম রয়েছেন।

আধুনিক শিক্ষায় উচ্চশিক্ষিত বাগচী মশায় একমাত্র ঠাকুরের কৃপা ছাড়া এই আশ্চর্য ঘটনার অন্য কোন কারণ খুঁজে পাননি।

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজি সাহিত্যের অধ্যাপক সদানন্দ চক্রবর্তী ঠাকুর সীতারামের একজন প্রিয় শিষ্য। ১৩৫৯ সালের ৮ই আষাঢ় তারিখে নবদ্বীপে তিনিও ঠাকুরের দিব্য জীবনের এক আলৌকিক মহিমা প্রত্যক্ষ করেন।

সেদিন ঠাকুর নবদ্বীপে তাঁর পূর্বপরিচিত একজন ভক্তের অন্ত্রখের খবর পেয়ে তাঁকে দেখতে গিয়েছেন। তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ প্রায়। নদীয়ার পুলিশ সাহেব তারকনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ঠাকুরের একজন প্রিয় শিষ্য। তিনি ঠাকুরকে গাড়িতে করে নিয়ে যাচ্ছেন। পথে শ্রীগৌরাজ দেবের মন্দির।

সেদিন অধ্যাপক চক্রবর্তী ছাড়াও ঠাকুরের সঙ্গে ছিলেন শ্রীশশাঙ্ক শেখর বাগচী, অধ্যাপক ভক্ত তারশঙ্কর ভট্টাচার্য, অধ্যাপক প্রমোদরঞ্জন গুপ্ত, শ্রীনীগোপাল চক্রবর্তী ও কিস্কর প্রণবানন্দ। গৌরাজ দেবের মন্দিরের কাছে গাড়ি আসতেই ঠাকুর মন্দির দর্শনের জন্য নামতে চাইলেন। মন্দিরের সেবাইত শ্রদ্ধাভরে ঠাকুরকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে গেলেন। মন্দিরের ভিতরে সেই ছোট্ট কুঠরীতে বিগ্রহ মূর্তির

সামনে গিয়ে সবাই দাঁড়ালেন। মূর্তি দর্শন করে ঠাকুর ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলেন।

অধ্যাপক চক্রবর্তী আগেই বিশ্বস্ত সূত্রে শুনেছিলেন, ঠাকুর সীতারাম চৈতন্যদেবের অবতার। একথা ঠিক অবিশ্বাস না করলেও পরিপূর্ণভাবে বিশ্বাস করতে পারেননি। তাঁর মনে হলো, একথা যদি সত্যি হয় তাহলে গৌরান্ধ দেবের বিগ্রহ মূর্তির গলায় যে মালা রয়েছে সেই মালা ঠাকুরের গলায় আসবে।

মূর্তি দর্শন করে ঠাকুর মন্দির প্রাঙ্গণে নামলেন। তবু বিগ্রহের গলার মালা ঠাকুরের গলায় এল না। তবে একটি আশ্চর্য ঘটনা সকলেই দেখলেন। যে-ই ঠাকুরের চরণ স্পর্শ করে প্রণাম করে তারই হাত ধূপ, ধুনো, চন্দন, পদ্ম প্রভৃতির সমবায় সৃষ্ট এক মধুর ও পবিত্র স্রগন্ধে ভরপুর হয়ে যায়। কিন্তু মনের কথাটি বারবার এক ভীক্ষু প্রশ্নের আকারে পৌড়া দিতে লাগল অধ্যাপক চক্রবর্তীর মনকে। যুক্তিবাদী মনে সংশয় প্রবল হয়ে উঠল। উপযুক্ত প্রমাণ না পেয়ে কোন অলৌকিক কথা লোক মুখে শুনে বিশ্বাস করতে রাজী নন তিনি। তাঁর আরও মনে হলো, যাঁরা ঠাকুরকে চৈতন্যদেবের অবতার বলে থাকেন তাঁরা ভক্তির আতিশয্যে অলৌকিক কল্পনাকে সত্য বলে চালাতে চান।

যিনি পূর্বজন্মে সাক্ষাৎ চৈতন্য ছিলেন তিনি মন্দিরে প্রবেশ করলেন অথচ বিগ্রহ তাঁকে চিনতে পারলেন না, তাঁর পরিচয়ের কোন চিহ্ন পাওয়া গেল না, তা কেমন করে সম্ভব?

গম্ভব্য স্থানে পৌঁছে কাজ সেরে ফেরা হলো। ফিরবার পথে সকলেই টের পেলেন, ঠাকুরের সর্বাঙ্গ থেকে সেই মধুর গন্ধ বের হচ্ছে। ঠাকুরের কৌ খেয়াল হলো আবার তিনি গৌরান্ধ দেবের মন্দিরে যেতে চাইলেন।

রাত্রি তখন গভীর। তবু সারা মন্দির জুড়ে অসংখ্য লোকের ভীড়। আবার সকলে মন্দিরের মধ্যে যে ঘরে বিগ্রহ আছেন সেই

সেই ঘরে প্রবেশ করলেন। ঠাকুর ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলেন। প্রণাম সেরে তিনি ফিরবার উদ্যোগ করতেই একজন অতি সুন্দর যুবক বিগ্রহের গলার মালাটি ঠাকুরের গলায় পরিয়ে দিলেন।

সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুর অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে অধ্যাপক চক্রবর্তী মুখপানে চাইলেন। সে অর্থ বুঝতে কিছু কষ্ট হলো না। অধ্যাপক চক্রবর্তীর। ঠাকুর সত্যিই অন্তর্ধার্মী। তিনি যোগশক্তিবলে তাঁর শিষ্যের মনের গোপন কথাটি জানতে পেরেছেন।

ঠাকুর গাড়িতে উঠতে যাচ্ছিলেন এমন সময় সেই সুদর্শন যুবকটি ছুটে এসে বিগ্রহের উত্তরীয়টি ঠাকুরের গলায় পরিয়ে দিলেন। যতটুকু প্রমাণ অধ্যাপক চক্রবর্তী চেয়েছিলেন এবার যেন তিনি তার থেকে বেশী পেলেন। সত্যোপলব্ধির এক প্রখর আলোক সম্পাতে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল তাঁর মনের সব সংশয়।

অবতারবাদ এমন কিছু একটা অদ্ভুত বা উদ্ভট কল্পনা নয়। যুগে যুগে অনেক অবতার আবির্ভূত ও তিরোহিত হয়েছেন। আবার হবেন।

এ বিষয়ে ঠাকুর সীতারামেরই একটি বাণী আছে। তিনি বলেছেন, আগুনে যেমন লোহা পড়ে থাকলে সেই লোহাকে লোকে আগুন বলে, তেমনি ধারা ভগবানকে অনন্তভাবে আশ্রয় করে থাকেন তাঁদের লোকে চিরদিন অবতার ভগবান ইত্যাদি বলে এসেছে।

অর্থাৎ ভগবানকে বেশীদিন ধরে থাকলে ভগবানের শক্তির অনেক খানি তাঁদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়, আগুনে যেমন কোন লোহা অনেক ক্ষণ পড়ে থাকলে আগুন হয়ে যায়।

ঠাকুর আর এক জায়গায় বলেছেন, নদী সমুদ্রের সন্ধানে ছুটে যেতে যেতে সমুদ্রের কাছে এসে আর যদি যেতে না পারে তাহলে সমুদ্রই অনেক সময় দুহাত বাড়িয়ে এসে সে নদীকে উদ্ধার করে। তেমনি ভগবানও অনেক সময় এগিয়ে এসে তাঁর ভক্তের সঙ্গে মিলিত হন।

ভক্তেরা তাকে যা বলে বলুক। ঠাকুরের সেদিকে কোন আক্ষেপ নেই। তাঁর শুধু কাজ আর কাজ, অবিরাম নাম প্রচার। ১৩৬০ সালে একবার এক সঙ্গে সাতশো দীক্ষার্থীকে দীক্ষা দেন। আজও দীক্ষাদানের শেষ নেই। আজও কত যুগ্ম দীক্ষার্থীকে দীক্ষা দেন।

ঠাকুরের কোন ক্লান্তি নেই। শুধু ভক্তরাই তাঁর কৃপা পাবার জন্য কাঁদছে না! তিনি নিজেও যে ভক্তদের জন্য কৃপার পশরা নিয়ে কাঁদছেন। তাই আজ তিনি সর্বসিদ্ধি লাভ করেও বিশাল আধ্যাত্মিক সম্পদের অধিকারী হয়েও কাঙালের মত ঘুরে বেড়াচ্ছেন। অসংখ্য জীবের মুক্তির জন্য আকুলতার অন্ত নেই তাঁর আজও।

শুধু নাম আর নাম। আজও অখণ্ড অনন্ত নামায়ত্ন করে পড়ছে সদা সর্বক্ষণ। এই অতি বৃদ্ধ বয়সেও ঠাকুর যেখানেই চলেছেন, তাঁর সঙ্গে সঙ্গে বয়ে চলেছে অখণ্ড নামের স্রোত। এক নতুন ভগীরথের মত পাপদগ্ধ অজস্র নরনারীর উদ্ধার সাধনের জন্য পতিত পাবনী নামের স্রোতোধারাকে ভারতের এক প্রান্ত থেকে আর প্রান্ত পর্বন্ত প্রতিটি জনপদে প্রবাহিত করে নিয়ে চলেছেন ঠাকুর। শ্রুতি বলেছে, কলিযুগে রাম ও কৃষ্ণনাম জপই ইষ্টদেবতার দর্শনলাভের একমাত্র উপায়।

ঠাকুর সীতারাম বলেছেন, অপরোক্ষ জ্ঞানের হেতু অন্তর্গামী ঈশ্বর-স্বরূপ শ্রীরামচন্দ্র আদিদেব পরাৎপর হরি রামকে আমি ভজনা করি। বাল্মীকি রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডে আছে :

ভগবান্নারায়নো দেবঃ শ্রীমাংশক্রায়ুধঃ প্রভুঃ ।

একশৃঙ্গো বরাহস্তং ভূতভব্যমপভ্রজিৎ ॥

অক্ষরং ব্রহ্ম সত্যঞ্চ মধ্যে চাস্তে চ রাঘব ।

লোকানাং হং পরো ধর্মো বিশ্বক্সেনশ্চতুর্ভূজ ॥

আপনি শ্রীমান চক্রায়ুধ প্রভু ভগবান নারায়ণ। আপনি একশৃঙ্গ বরাহ, ভূত ভবিষ্যৎ,—শত্রুনিধনকারী। হে রাঘব, আপনি আদি অন্ত ও মধ্যে অক্ষর সত্য ব্রহ্ম। আপনি লোকের পরম ধর্ম বিশ্বক্সেন চতুর্ভূজ।

ঠাকুর আরও বলেছেন, জগতের উত্তম তপস্বী হলো শ্রীহরিকীর্তন।

বিশেষতঃ কলিযুগে বিষ্ণুপ্রীতির জন্ম তা আচরণ করবে। নামের এতদূর শক্তি যে সব পাপ-তাপ দূর করে দেয় ; দেহের উপাদান পর্যন্ত পাণ্টে দেয়।

ব্রহ্মপুরাণে আছে :

প্রমাদাদপি সংস্পৃষ্টো যথানলকণা দহেৎ ।

তথোষ্ঠ পুট সংস্পৃষ্টং হরিনাম দহেদঘম ॥

অগ্নিকণা ভুল করে কোন দাহ্য পদার্থ স্পর্শ করলেও যেমন তাকে দগ্ধ করে তেমনি হরিনাম কোন মানুষের ওষ্ঠপুট স্পর্শ করার সঙ্গে সঙ্গে তার পাপ দগ্ধ করে। এমনি নামের মহিমা।

যিনি সমাধি লাভ করেন তিনিই সাধু! এই সাধু দুই শ্রেণীর—ঈশ্বরকোঠি ও ব্রহ্মকোঠি। ঈশ্বরকোঠির সাধকেরা সমাধি থেকে ব্রহ্মজ্ঞান নিয়ে ফিরে এসে তাই দিয়ে জগতের কল্যাণ করেন। কিন্তু ব্রহ্মকোঠির সাধকেরা ব্রহ্মের মধ্যে একেবারে বিলীন করে দেন নিজেদের। ঠাকুর সীতারাম হচ্ছেন এমনি একজন সাধক যিনি নিজের জন্ম মোক্ষ চান না, যিনি তাঁর সাধনার সমস্ত সম্পদ উজাড় করে ঢেলে দিতে চান জনগণের কল্যাণে।

নিরালম্ব স্বামী

সে আজ নববই বছর আগের কথা। তখন বর্ধমান জেলার খানাজংশন স্টেশনের কাছাকাছি চান্না গাঁয়ের কালীচরণ বাঁড়ুজ্যের সংসারে বেশ বাড়-বাড়ন্ত ও আয়-উন্নতি হতে শুরু হয়েছে। ঘরে জমিজমার আয়ের সঙ্গে যোগ দিয়েছে চাকরির টাকা। যশোর জেলার বনগাঁয়ে নাজিরগিরি করে ভালই উপায় করেন কালীচরণবাবু। ধান ধনের কোন অভাব নেই সংসারে। কিন্তু সংসারে কেবল ধান-ধানকে অবলম্বন করেই লক্ষ্মীলী আসে না। ধনের সঙ্গে চাই পুত্র। কথায় বলে, ধনে পুতে লক্ষ্মীলাভ।

কালীচরণও একথা প্রায়ই মনে করতেন। কিন্তু গম্ভীর প্রকৃতির চাপা লোক বলে একথা কারো কাছে কোনদিন প্রকাশ করতেন না। কেবল মাঝে মাঝে চাকরির জায়গা হতে বাড়ি এসে গাঁয়ের প্রান্তে বিশালাক্ষীর মন্দিরে গিয়ে কাতর প্রার্থনা জানাতেন দেবীর কাছে।

শান্ত্রে যে পঞ্চাঙ্গের উল্লেখ আছে তার মধ্যে পিতৃঋণ বড় কঠিন ঋণ। জন্মের সঙ্গে সঙ্গে আমরা পিতার কাছে যে ঋণে আবদ্ধ হই, বড় হয়ে পুত্রের জন্ম দান করে সেই ঋণ হতে আমরা মুক্ত হই।

গাঁয়ের পূর্বপ্রান্তে নির্জন বনমধ্যস্থ মন্দিরে গিয়ে ধর্না দিতেন কালীচরণ। দেখতে দেখতে অন্তরের গোপনতম সাধ হয়ে উঠত নিবিড়তম সাধনা। হৃদয়বৃত্তে যে সাধ ফুলের মত ফুটে উঠত, সেই ফুলটিকে ছিঁড়ে মনে মনে অর্পণ করতেন দেবীর পদতলে। কিন্তু এ সাধনায় সিদ্ধিলাভের আকাঙ্ক্ষাটি ছিল বড় চমৎকার। যেমন-তেনমন পুত্র হলে চলবে না। যিনি তাঁর অন্তরের সাধ পূরণ করবেন, তাঁর সাধনার সিদ্ধিদান করবেন যিনি, তাঁর উপর এক অদ্ভুত সর্ব আaroপ করতেন কালীচরণ। বলতেন, আমার মনস্কামনা যদি পূরণ করে মা, তাহলে আমায় এক বলবান বীর্যবান ও চরিত্রবান পুত্র দিও।

আমি কখনো চাই না, আমার পুত্র, পশুর মত জন্মাবে বাড়বে ও মরবে ; সে দেশ বা দেশের জন্ত কিছু করবে না, দেশ তাকে জানবে না, এ আমি ভাবতেই পারি না। তার চেয়ে আমার পুত্র যদি কখনো না হয় তাও ভাল। আমি চাই, চরিত্রের দৃঢ়তায় ও বীর্যবন্তায়, অন্তরের তেজস্বীতায়, আত্মার পরিপূর্ণতায় আর পাঁচজনের মধ্যে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে আমার পুত্র।

অবশেষে একদিন মুখ তুলে চেয়েছিলেন দেবী বিশালান্মী। মনস্কামনা পূরণ করেছিলেন কালীচরণের। ১২৮৪ সালের অগ্রহায়ণ মাসে এক পুত্রসন্তান লাভ করলেন কালীচরণ।

কালীচরণ তখন বাড়িতে ছিলেন না। চাকরির জায়গা থেকেই খবর পেয়েছিলেন। এক মাস পর বাড়ি এসে পুত্রকে দেখে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। ঠিক যেমনটি চেয়েছিলেন তেমনটি হয়েছে। পূর্ণিমার চাঁদের মতো মুখ, সুপুষ্ট দেহ, গায়ের রঙ দুধে আলতায় গোলা। পুত্রের নাম রাখলেন যতীন্দ্রনাথ।

ছোটবেলায় বড় দুরন্ত ছিলেন যতীন্দ্রনাথ। সমবয়সী আর-সব ছেলেদের থেকে স্বাস্থ্যের দিক দিয়ে তিনি যেমন সবচেয়ে বলিষ্ঠ, তেমনি দুরন্তপনাতেও ছিলেন সবার সেরা। তাঁর প্রভুত্ব মাথা পেতে মেনে নিত ছেলেরা।

যতীন্দ্রনাথের খেলার ধরণটি বড় অদ্ভুত ছিল। তিনি কখনো গাঁয়ের ভিতর কোথাও এক জায়গায় বসে খেলা করতে পছন্দ করতেন না। দল বেঁধে সব ছেলেদের নিয়ে গিয়ে গাঁয়ের শেষে কখনো মাঠে গিয়ে ছুটাছুটি করতেন আবার কখনো-বা খড়িনদীর ধারে ঘন আম-বনের মধ্যে গাছের ডালে ডালে ঝালঝাপুটি খেলতেন।

বাল্যাশিক্ষা শুরু হয় গাঁয়ের পাঠশালায়। পড়াশুনোয় যেমন কোন অবহেলা ছিল না, তেমনি আবার বেশীক্ষণ বই নিয়ে বসেও থাকতে চাইতেন না। থাকবার কোন দরকারও ছিল না! কারণ তাঁর বুদ্ধি আর স্মৃতিশক্তি দুই-ই ছিল। কিছুক্ষণ মন দিয়ে পড়লেই

তাঁর সব মুখস্থ হয়ে যেত ।

প্রাথমিক শিক্ষা শেষ হতেই ছেলেকে নিজের কাছে নিয়ে গেলেন কালীচরণ । সেখানে কিছুদিন রেখে পাঠিয়ে দিলেন কলকাতায় এনট্রান্স পড়বার জন্য । ছুটি হলেই গাঁয়ে আসতেন যতীন্দ্রনাথ । যখন যেখানেই থাকতেন গাঁয়ের কথা জন্মভিটের কথা প্রায়ই মনে পড়ত তাঁর । ধুলোভরা ছায়া-ঘেরা সেই গাঁয়ের পথ, খড়ের চালওয়ালা মাটির ঘর, গাঁয়ের চারপাশের দিগন্তজোড়া ধানক্ষেত, নদীর ধারের সেই ছায়াঘন আমবন সব কিছুর সঙ্গে একটা নাড়ীর যোগ অনুভব করতেন ।

যতীন্দ্রনাথ স্পষ্ট অনুভব করতেন, তিনি তাঁর গাঁকে গর্ভধারিণী মায়ের মতোই ভালবাসেন । মাকে ছেড়ে বেশীদিন কোথাও থাকতে যেমন তাঁর মন চায় না, তেমনি বেশ কিছুদিন গাঁ থেকে দূরে থাকতেও কষ্ট হয় তাঁর । গাঁ থেকে দূরে গিয়ে তাকে যেন ভালভাবে চিনতে পেরেছেন তিনি । জড়িয়ে পড়েছেন নিবিড়তর এক মায়ার বন্ধনে ।

বাইরে থেকে যখন গাঁয়ে আসেন তখন খুব ভাল লাগে । মনে হয় অনেক দিন মায়ের কোলছাড়া হয়ে থাকার পর আবার যেন মায়ের কোলে এসে পড়েছেন । মা বললেন, তা মন কেমন করবে না ? এটা যে তোর জন্মভিটে ! এখানে তুই ভূমিষ্ঠ হয়েছিস, এই ভিটেতে তোর নাড়ী পোঁতা আছে । এর সঙ্গে যে তোর নাড়ীর যোগ রয়েছে । মানুষের জন্মভিটে তার মায়ের থেকে কিছু কম নয় যতীন । মা তাঁর সন্তানকে দশ মাস দশ দিনের বেশী গর্ভে ধারণ করতে পারে না । গর্ভ থেকে সেই সন্তান প্রসব হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জন্মভিটের মাটিই তাকে কোল দেয় । তারপর রক্তমাখা যে নাড়ী সন্তানকে তার মার দেহের সঙ্গে যুক্ত করে রাখে গর্ভাবস্থায়, প্রসবের পর সেই নাড়ী কেটে দিয়ে জন্মভিটের মাটিতেই পুঁতে রাখা হয় । সুতরাং তোর জন্মভিটের প্রতি তোর মন কাঁদবে, এ আর এমন বেশী কথা কি ! আর জন্মভিটে মানেই গাঁ । কথায় বলে গাঁয়েমায়ের সমান কথা । প্রবাসে গেলে দেখবি, গাঁয়ের কোন লোকের সঙ্গে দেখা হলে মনে হয় যেন মায়ের পেটের ভাইকে পেয়েছি ।

এইভাবে বাল্য ও কৈশোর হতে আপন জন্মভূমি ও গাঁয়ের প্রতি এক নিবিড় মমত্ববোধ তাঁর মাতৃ চেতনার সঙ্গে এক হয়ে মিশে ছিল যতীন্দ্রনাথের মনে। তখন কিন্তু যতীন্দ্রনাথ ঘৃণাকরেও ভাবতে পারেননি তাঁর এই সহজ মাতৃচেতনা তাঁর বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ বিস্তৃত হয়ে দেশাত্মবোধের এক বিরাট পরিধি রচনা করবে তাঁর মনের চারিদিকে।

বাল্য ছেড়ে কৈশোরে ঢুকতেই যতীন্দ্রনাথের ভিতর এক আশ্চর্য ভাবান্তর লক্ষ্য করল গাঁয়ের লোক। সকলে ভাবল, তাঁর বাবার মতই রাশভারি হয়ে উঠবেন যতীন্দ্রনাথ। আগেকার সেই দুর্বল ভাব আর নেই। নেই কোন বালকস্মলভ চঞ্চলতা। এখন একা একা শুধু নির্জন মাঠ ও বনের ধারে বেড়াতে ভালবাসেন। বিশেষ করে বিশালাক্ষী দেবীর মন্দির সংলগ্ন নির্জন বনটি বড় ভাল লাগে তাঁর।

কিন্তু মনটা তাঁর গান্ধীর্ষে জমাট বেঁধে উঠলেও মুখের উপর কোন অহেতুক কাঠিন্যের ভাব ফুটে ওঠেনি কখনো। মুখের উপর সব সময় ফুটে থাকত একটি নির্মল হাসির ছটা। গাঁয়ের ছোট বড় সব মানুষের প্রতি ছিল তাঁর সমান মমত্ববোধ। বাইরে থেকে আসার পর সকলের খোঁজ খবর নিতেন। কারো সঙ্গে দেখা হলেই হাসিমুখে কুশল জিজ্ঞাসা করতেন।

স্কুল ছেড়ে কলেজে ঢুকলেন যতীন্দ্রনাথ। ছেলের উচ্চশিক্ষা ও নৈতিক চরিত্র গঠনের দিকে বরাবর লক্ষ্য ছিল কালীচরণের। এন্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ায় সঙ্গে সঙ্গে এফ, এক্লাসে ভর্তি করে দিলেন তাঁকে।

তখন দেশে ইংরেজ-শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। দেশের অশিক্ষিত ও অল্পশিক্ষিত জনসাধারণ এই শাসনকে সহজ বলে মনে নিয়েছে। বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে এই শাসনের বিরুদ্ধে কোন ক্ষোভ ছিল না। ইংরেজরা যখন, খীষ্টান, গ্লেচ্ছ এই ধরণের একটা ধর্মগত বিদ্বেষ ছাড়া কোন রাজনৈতিক অসন্তোষ সাধারণ মানুষের মনে ছিল না।

কিন্তু কলকাতার শিক্ষিত জনগনের মনে তখন এক রাজনৈতিক চেতনা জাগতে শুরু করেছে ধীরে ধীরে। ইংরিজি শিক্ষা ও ইউরোপের

রাজনৈতিক ইতিহাসের সঙ্গে ক্রমপরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশ ও স্বজাতি সম্বন্ধে এক রাজনৈতিক ধারণা দানা বেঁধে উঠতে শুরু করেছে তাদের মনে। ভারতবর্ষ আমাদের দেশ, সকল ভারতবাসী এক জাতি এবং এক বিদেশী শক্তি এসে গায়ের জোরে এই দেশ ও জাতিকে অধিকার করে আমাদের পরাধীন করে রেখেছে, এই ধরনের এক জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠতে শুরু করেছে তারা।

কলেজে পড়ার সময় এই জাতীয়তাবোধ ক্রমশঃ বদ্ধমূল হয়ে উঠতে থাকে যতীন্দ্রনাথের অন্তরে। এই জাতীয়তাবোধ যতই গভীর হয়ে উঠতে থাকে ততই দৃঢ় হয়ে উঠতে থাকে দেশের স্বাধীনতালাভের সংকল্প। কিন্তু মনে মনে শুধু সংকল্প করলেই হবে না, সেই সংকল্পকে সার্থক করে তোলবার জন্য চেষ্টা করতে হবে মনেপ্রাণে।

যতীন্দ্রনাথ এ বিষয়ে একটা জিনিস ভালভাবে বুঝলেন, দেশের স্বাধীনতালাভের জন্য সংগ্রামে অবতীর্ণ হবার আগে শক্তি অর্জন করতে হবে। যে শক্তি, সামরিক শিক্ষা ও অস্ত্রশস্ত্রের বলে ইংরেজরা অত দূর থেকে এসে এই বিশাল দেশকে জয় করেছে, একে একে সব তা চাই।

এফ, এ পাশ করার পর সামরিক শিক্ষা লাভের জন্য পাগলের মত এখানে সেখানে ঘুরতে লাগলেন যতীন্দ্রনাথ। দৈহিক শক্তির অভাব নেই তাঁর। তাঁর স্বাস্থ্য উন্নত এবং বলিষ্ঠ। কিন্তু সামরিক শিক্ষা ছাড়া এ শক্তির কোন মূল্য নেই। নিজে প্রথমে উপযুক্ত সামরিক শিক্ষা লাভ করে পরে আর পাঁচজনকে শিক্ষিত করে তুললেন সে শিক্ষায়। তারপর চেষ্টা করতে হবে অস্ত্রশস্ত্র লাভের জন্য। এইভাবে ধীরে ধীরে সারা দেশ ব্যাপী গড়ে তুলবেন এক বিরাট বিপ্লবের আন্দোলন। দেশের বিভিন্ন মানুষের মধ্যে বিচ্ছিন্নভাবে দেশপ্রেমের যে সব খণ্ড ক্ষুদ্র অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ধূমায়িত অবস্থায় থিক থিক করছে, সেই সব স্ফুলিঙ্গগুলিকে একত্রিত করে পরিণত করে তুলবেন বিরাট অগ্নিকাণ্ডে। সন্ত্রস্ত করে তুলবেন বিদেশী শাসক-সম্প্রদায়কে।

এই সময় মাঝে মাঝে চান্নায় গিয়ে বিশালান্দীর মন্দিরে গিয়ে

দেবীর কাছে শক্তি ভিক্ষা করতেন যতীন্দ্রনাথ । কাতরকণ্ঠে বলতেন, শক্তি দাও মা, যাতে বিদেশীদের দেশ থেকে তাড়িয়ে স্বাধীন করে তুলতে পারি দেশকে ।

যতীন্দ্রনাথের কাতর প্রার্থনায় অবশেষে দেবী সাড়া দেন । সহসা এক অপ্রত্যাশিত সুযোগ মিলে গেল সামরিক শিক্ষার । নামের শেষে উপাধিটা পাণ্টে অর্থাৎ যতীন্দ্রনাথ উপাধ্যায় নামে সামরিক শিক্ষা লাভ করেন ।

সামরিক-শিক্ষা লাভ করে সৈন্য-বিভাগে যোগ দিয়ে সেই শিক্ষাকে সফল করে তুলবার চেষ্টা করেন যতীন্দ্রনাথ । কিন্তু তার অনেক আগেই ব্রিটিশ-সরকার এক নিষেধাজ্ঞা জারি করে বাঙালি যুবকদের পণ্টনে যোগদান একেবারে নিষিদ্ধ করে দিয়েছে ।

মনের দুঃখে ঘুরতে ঘুরতে মধ্যভারতের দেল্লী রাজ্য বরোদায় এসে রাজার সৈন্যবিভাগে ঢোকবার চেষ্টা করেন । কিন্তু সে চেষ্টা ব্যর্থ হয় ।

বরোদায় থাকাকালে হঠাৎ একদিন সন্ধান পেলেন শ্রীঅরবিন্দের । শ্রীঅরবিন্দ তখন বিলেত থেকে এসে বরোদার স্টেট কলেজে ইংরাজি সাহিত্যের অধ্যাপনা করছেন । সবাই বলল, তুমিও বাঙালী, তিনিও বাঙালী । তিনি তোমায় এ-বিষয়ে সাহায্য করতে পারেন । তাছাড়া রাজাসাহেব নিজে তাঁকে শ্রদ্ধার চোখে দেখেন । তাঁর কথা রাজা কিছূতেই ঠেলতে পারবে না ।

ভয়ে ভয়ে সংশয়জড়িত চিন্তে দেখা করতে গেলেন যতীন্দ্রনাথ । তিনি ভাবতেই পারেননি প্রথম দর্শনেই শ্রীঅরবিন্দের স্ননজরে পড়ে যাবেন । যতীন্দ্রনাথের গোপন সংকল্পের কথা শুনে বিশেষ প্রীত হলেন শ্রীঅরবিন্দ । তিনি যতীন্দ্রনাথকে আশ্বাস দিয়ে সহানুভূতির সঙ্গে বললেন, আমি যথাসাধ্য সাহায্য করব তোমায় এ-বিষয়ে । তবে চাকুরি পেয়ে আসল সংকল্পের কথা যেন কোনদিন তুলে যেও না ।

কথাটা শুনে বিস্মিত ও আনন্দিত দুই-ই হলেন যতীন্দ্রনাথ । তাহ'লে তিনি যা চান শ্রীঅরবিন্দও কি আসলে তাই চান ? তিনিও কি এক ছাইচাপা আগুন ? যে-বিপ্লবের আগুন তিনি সারা দেশ-

ব্যাপী জ্বালতে চলেছেন সে আগুন আগে থেকেই প্রচ্ছন্নভাবে জ্বলছে শ্রীঅরবিন্দের অন্তরে ।

কিন্তু এ-বিষয়ে আর বেশী কিছু না বলে উত্তর করলেন যতীন্দ্রনাথ, আমার আসল লক্ষ্যের কথা আগেই বলেছি আপনাকে ; এটা হচ্ছে আমার উপলক্ষ্য মাত্র ।

শ্রীঅরবিন্দের বিশেষ চেষ্টায় বরোদা স্টেটের মহারাজার দেহরক্ষীর কাজ পেলেন যতীন্দ্রনাথ । তাঁর আনন্দ আর ধরে না । কিন্তু আনন্দ শুধু চাকরির কথা ভেবে নয়, এ আনন্দের মূল কারণ হলো শ্রীঅরবিন্দের সাহচর্যলাভ । স্মৃষ্টি এবং অবকাশ পেলেই তিনি ছুটে যেতেন শ্রীঅরবিন্দের কাছে । আলোচনা করতেন দেশের স্বাধীনতা সম্পর্কে । শ্রদ্ধার সঙ্গে শুনতেন তাঁর স্মৃতিস্তম্ভ বাণী ।

শ্রীঅরবিন্দ যে অনন্য সাধারণ প্রতিভার অধিকারী প্রথম দেখাতেই যতীন্দ্রনাথ অনেকটা বুঝতে পেরেছেন । কয়েকদিনের পরিচয়ে আরো অনেক কিছু বুঝতে পারলেন তিনি । বুঝলেন, শ্রীঅরবিন্দ শুধু একজন সাধারণ অধ্যাপক নন । তিনি একজন চিন্তাশীল পণ্ডিত । সাহিত্য ও দর্শনে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি তাঁর । মহাভারতের কোন কোন অংশ ইংরেজিতে কাব্যানুবাদ করছেন ।

শ্রীঅরবিন্দ কথাপ্রসঙ্গে প্রায়ই বলতেন, দেশের স্বাধীনতার জন্য শুধু দৈহিক শক্তি হলেই চলবে না । তার সঙ্গে চাই আত্মিক শক্তি । আত্মা আমাদের পরিণত ও পূর্ণ না হলে স্বাধীনতা পেয়েও সে কষ্টার্জিত স্বাধীনতাকে আমরা সার্থক করে তুলতে পারব না ।

তিনি এর আগেই দেশবরেণ্য নেতা স্বাধীনতা সংগ্রামের বীর যোদ্ধা মারাঠাগৌরব বাল গঙ্গাধর তিলকের সংস্পর্শে এসেছেন এবং একই মত ও পথের যাত্রীরূপে বেশ ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন দু'জনে ।

একদিন যতীন্দ্রনাথ বিকালের দিকে শহর থেকে কিছুটা দূরে ঘোড়ায় চেপে পাহাড় দিয়ে বেড়াতে যান । হঠাৎ পার্বত্য আদিবাসীরা তাঁকে আক্রমণ করে । ঘোড়াটি বিভ্রান্ত হয়ে তাঁকে ফেলে দিয়ে চলে

যায়। আঘাত বেশ তীব্র হওয়ায় অচেতন হয়ে পড়েন যতীন্দ্রনাথ। এদিকে আদিবাসীরা তাঁকে মৃত ভেবে চলে যায়। কিছুক্ষণ পর চেতনা ফিরে পেয়ে যতীন্দ্রনাথ দেখেন তাঁর কাছে একটি লাঠি পড়ে রয়েছে। সেই লাঠিতে ভর দিয়ে ফিরে আসতে থাকেন রাজবাড়ির দিকে। ততক্ষণে রাজবাড়ি থেকেও লোকজন তাঁর সন্ধানে বেরিয়ে পড়েছে। কারণ সওয়ারহীন অবস্থায় তাঁর ঘোড়াটি রাজবাড়িতে ফিরলে অনেকের মনে বিপদের আশঙ্কা দেখা দেয় এবং তারা বেরিয়ে পড়ে।

যে কোন বিপদে পড়লেই তিনি দৈহিক শক্তি আর সাহস দুটোরই সমান পরিচয় দিতে পারতেন।

কলেজে দিনে দিনে স্নানাম বেড়ে চলেছে শ্রীঅরবিন্দে। মন কিন্তু সেদিকে নেই। তিনি হচ্ছেন প্রকৃত কর্মযোগী, সমস্ত স্নানাম ও দুর্নামের উদ্দেশ্যে তাঁর মন। সে কথা আর কেউ না জানলেও যতীন্দ্রনাথ ভাল-ভাবেই জানেন। কারণ তিনিও সেই পথের পথিক।

১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীঅরবিন্দ ভবানী-মন্দিরের পরিকল্পনা করেন। প্রথমে নর্মদাতীরে গঙ্গোনাথ আশ্রমে ও পরে কলকাতায় মুরারিপুকুরে একটি করে শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করা হয়। দেশের তরুণ যুবকদের দেশপ্রেমের মন্ত্রে দীক্ষিত করে তাদের একই সঙ্গে সামরিক শিক্ষাদান ও আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনই হবে এই সব শিক্ষামন্দিরগুলির কাজ।

কিন্তু যতীন্দ্রনাথ তো আগে থেকেই এ প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ ও এ মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে আছেন। তাঁর তো নতুন করে এ-বিষয়ে দীক্ষা নেবার কোন প্রয়োজন নেই।

হঠাৎ একদিন বাবা-মার এক জরুরি চিঠি পেয়ে গাঁয়ের বাড়িতে চলে এলেন যতীন্দ্রনাথ। এসে দেখলেন চান্না হতে মাইল কয়েক দূরে এক গাঁয়ে তাঁর বিয়ের ঠিক হয়েছে। তাঁর দেশোদ্ধারের সংকল্পের কথা বাবা-মাকে জানিয়ে আপত্তি তুললেন যতীন্দ্রনাথ। কিন্তু সে আপত্তি টিকল না। বাবা যুক্তি ও দৃষ্টান্ত দেখিয়ে বললেন, অনেক স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতাই বিবাহিত। তাছাড়া তুমি একথাই বা মনে করছ

কেন যে তোমার স্ত্রী তোমার ব্রতে বাধা দেবেন। তিনি সব দিক দিয়ে তোমার প্রকৃত সহধর্মিনী ও সহধর্মিনী হয়ে উঠতে পারেন।

পরবর্তীকালে এ-কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্যি হয়েছিল।

বাড়ি থেকে আবার বরোদায় ফিরে আসেন যতীন্দ্রনাথ। এই সময় নর্মদা নদীর পারে ছারোভি শহরে সাখরিয়া বাবা নামে এক আশ্রমবাসী যোগীর সঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের যোগাযোগ ও ঘনিষ্ঠতা হয়। শোনা যায় সাখরিয়া বাবা সিপাহীযুদ্ধের একজন বীর যোদ্ধা ছিলেন। পরে ইংরেজদের কোপদৃষ্টি এড়াবার জন্য সাধু হয়ে যান। ভবানী-মন্দির প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি শ্রীঅরবিন্দকে যথাসাধ্য সাহায্য করবেন, এ প্রতিশ্রুতি দেন। যতীন্দ্রনাথ দেশপ্রেমের মূর্ত প্রতীক এই যোগী-পুরুষের কাছ থেকে অনেক প্রেরণা লাভ করেন।

১৯০৫ সালে বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলন শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীঅরবিন্দ ও যতীন্দ্রনাথ দুজনেরই দৃষ্টি পড়ল সেদিকে। প্রচণ্ড বিক্ষোভে ফেটে পড়েছে সারা বাংলাদেশ। আর চুপ করে বসে থাকা যায় না। বিন্দুমাত্র বিলম্ব না করে চাকরি ছেড়ে বাংলা দেশের পথে রওনা হলেন শ্রীঅরবিন্দ ও যতীন্দ্রনাথ।

বাংলাদেশে এসে বিপ্লবের কাজে আত্মনিয়োগ করলেন যতীন্দ্রনাথ। এই সময় তিনি বারীন ঘোষ প্রমুখ প্রখ্যাত বিপ্লবীদের সংস্পর্শে আসেন।

আলিপুর বোমার মামলায় শ্রীঅরবিন্দ কারারুদ্ধ হলে বারীন ঘোষ বিপ্লবের নেতৃত্ব করেন। নিজস্ব কারাবাসের গভীর নিঃসঙ্গতার শান্ত অবকাশে এক আশ্চর্য রূপান্তর সাধিত হয় শ্রীঅরবিন্দের অন্তর-জগতে। তিনি দু'টি আকাশ-বাণী পান এই সময়। একটিতে তাঁকে ভারতবাসীর পুনরভ্যুত্থানে সাহায্য করার নির্দেশ দেওয়া হয়; আর অপরটিতে বলা হয় জগতের কল্যাণ সাধনে ভারতের আধ্যাত্মিক ভূমিকার কথা। এই বাণী লাভের পর রাজনৈতিক জীবন থেকে ধীরে ধীরে সরে এসে অধ্যাত্ম-জীবনের পথে এগিয়ে যেতে থাকেন শ্রীঅরবিন্দ।

১৯১০ সালের ৪ঠা এপ্রিল শ্রীঅরবিন্দ পণ্ডিচেরীতে গিয়ে উপস্থিত হলেন। পরে সেখানে এক যোগাশ্রম গড়ে তুলতে থাকেন।

এই সময় যতীন্দ্রনাথের মনোজগতেও এক আলোড়ন উপস্থিত হয়। বারীন ঘোষের সঙ্গে তাঁর কোন কোন বিষয়ে মতবিরোধ হয় এবং বিপ্লবের কার্যকারিতা সম্বন্ধে সন্দেহ জাগতে শুরু করে মনে।

সহসা একদিন কলকাতা থেকে চান্নার বাড়িতে চলে যান যতীন্দ্রনাথ। সবাইকে বললেন, তিনি ক্লান্ত অসুস্থ। তাই বিশ্রাম গ্রহণ করবেন কিছুকাল বাড়িতে বসে। কিন্তু কেউ জানল না, তাঁর ক্লান্তিটা দেহের নয়, মনের। বাইরের দ্বন্দ্বের চেয়ে অন্তর্দ্বন্দ্ব তিনি বেশী দ্রুতবিক্ষত।

বিপ্লব, কোলাহল, নরহত্যা সব কিছু হতে দূরে গাঁয়ের শান্ত নিজের পরিবেশে বেশ কিছুদিন শান্ত জীবন যাপন করবেন যতীন্দ্রনাথ। দেহটা বিশ্রাম পেলেও মন কিন্তু বিশ্রাম পেল না। এক দিনের জন্তও নিশ্চিন্ত হতে পারলেন না তিনি।

গাঁয়ে থাকাকালে মাঝে মাঝে আগেকার মতো বিশালস্মার মন্দিরে যেতেন যতীন্দ্রনাথ। এখন আর শক্তি চাইতেন না দেবীর কাছে, চাইতেন জ্ঞান।

শ্রীঅরবিন্দ দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন, তিনি তাঁর যোগলব্ধ শক্তির দ্বারা আনবেন ভারতের স্বাধীনতা, ও সমগ্র জগতবাসীর আত্মিক উন্নতি। এ ধরনের কোন উচ্চাভিলাষ ছিল না যতীন্দ্রনাথের মধ্যে। তিনি চাইতেন শুধু চিন্তের শুদ্ধি আর জ্ঞানের স্বচ্ছতা। তিনি প্রথমে জানতে চান নিজেকে। তারপর জানবেন বিশ্বস্থিতি ও স্রষ্টার রহস্যকে। কিন্তু সব কিছুর মূলে হচ্ছে আত্মজ্ঞান।

তাছাড়া আত্মজ্ঞান বা আত্মোপলব্ধি না হলে আত্মশক্তি লাভ বা আত্মিক উন্নতি সম্ভব নয়। এই আত্মশক্তিতে বঙ্গীয়ান না হয়ে উঠলে ভারতবাসী কখনো স্বাধীনতার প্রকৃত মূল্য বা তাৎপর্য বুঝতে পারবে না। একদল যখন স্বাধীনতার জন্ত জীবন পণ করে সংগ্রাম করছে

আর একদল তখন তাদের বাধা দেবে অথবা এক দল স্বাধীনতা কৌশলকমে আনলেও আর-একদল সে স্বাধীনতাকে পণ্ড করে দেবে।

এই আত্মজ্ঞান লাভের জন্য সদগুরু খুঁজে বার করতে হবে। ঘরে বসে থাকলে হবে না। তাই ঘর থেকে বেরিয়ে পড়বার সংকল্প করলেন যতীন্দ্রনাথ।

এই সময় কিছুদিনের ব্যবধানে বাবা-মা দু'জনেই মারা যান। তার কিছুদিন বাদে তাঁর একটি কন্যা সন্তান জন্মে। কিন্তু কোন কিছুই তাঁকে তাঁর সংকল্প থেকে বিচ্যুত করতে পারল না।

পথে বেরিয়ে পড়লেন তিনি। কিন্তু প্রকৃত পথ কোথায়! কে বলে দেবে আত্মজ্ঞানরূপ অমৃত লাভের পথ! তিনি তো পথের সন্ধান জানেন না; জানেন শুধু তাঁর লক্ষ্য।

এক-একবার তাঁর মনে হয়, আত্মা কোথায় নেই? বিশ্বের সর্বত্রই ছড়িয়ে রয়েছে তাঁর আত্মা। সারা আকাশ জুড়ে দেখতে পাচ্ছেন এই আত্মার এক আশ্চর্য ব্যাপ্তি। স্বচ্ছ জলের মধ্যে দেখতে পাচ্ছেন এই আত্মার প্রতিফলন। ফুলের সুরভিতে পাচ্ছেন তাঁর আত্মার সুরভি। আত্মা আছে বলেই এ-জগৎ সত্য।

কিন্তু পরক্ষণেই আবার মনে হলো একথা মিথ্যা। তাঁর আত্মার সঙ্গে জগতের কোন যোগ নেই। জাগতিক সব বস্তুই এক-একটি স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে।

যতীন্দ্রনাথ নিজেই বুঝতে পারলেন, তাঁর আত্মজ্ঞান এখনো গভীর হয় নি। আত্মার সর্বব্যাপী শক্তি ও অমৃতত্ব সম্বন্ধে কিছুই বুঝতে পারেননি তিনি।

পথে কোন সাধু-সন্ন্যাসী দেখলেই ভাবেন ইনিই বৃষি তাঁর সদগুরু। তাঁর সঙ্গে কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর মোহভঙ্গ হয়। আবার যাত্রা শুরু করেন।

বেনারসে একদিন এক শক্তিমান সাধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হল। কিন্তু তাঁর কাছে দীক্ষা নেবার ইচ্ছা প্রকাশ করলে তিনি বললেন, আমি

তোমার বিধিনির্দিষ্ট গুরু নই। এখান থেকে উত্তর দিকে যাত্রা কর। কিছুদিনের মধ্যেই তুমি তোমার গুরুর সাক্ষাৎ পাবে। অনুরোধ করাতে তিনি জায়গার নাম বললেন, নৈনিতাল। এর বেশী আর কিছু বললেন না।

এবার নূতন আশায় উৎসাহিত হয়ে নৈনিতালে গিয়ে উপস্থিত হলেন যতীন্দ্রনাথ। সেখানে গিয়ে শুনলেন, সোহং স্বামী নামে এক শক্তিমান বাঙালী সাধক গঙ্গার ধারে এক যোগাশ্রম স্থাপন করেছেন।

দর্শন করার সঙ্গে সঙ্গে আপনা থেকে শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে এল যতীন্দ্রনাথের। অপরূপ তাঁর অঙ্গকান্তি। স্থঠাম ও স্তূগঠিত দেহে আশ্চর্য স্বাস্থ্যের প্রাচুর্য। গৌরবর্ণ। পরিধানে বাঘছাল। মাথার কেশপাশ ও জটায় দীর্ঘ নয়। মুখমণ্ডলে বিরাজ করছে এক দিব্য প্রশান্তি। যতীন্দ্রনাথ স্পষ্ট বুঝতে পারলেন, এই মহাপুরুষের দেহগত পূর্ণতাটা কিছুই নয়। এক আশ্চর্য আধ্যাত্মিক বিভূতির অসামান্য জ্যোতি প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছে তাঁর সারা অঙ্গে।

সোহং স্বামী বললেন, এখনি গঙ্গায় স্নান করে এসো।

সঙ্গে সঙ্গে দীক্ষাকার্য সম্পন্ন হয়ে গেল। যতীন্দ্রনাথের নূতন নামকরণ হলো নিরালম্ব স্বামী।

সোহং স্বামীর পূর্বজীবনের নাম ছিল শ্রামাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রথম যৌবনে তিনি এক প্রসিদ্ধ কুস্তিগির ছিলেন। অসাধারণ দৈহিক শক্তির সঙ্গে অপরূপ লাবণ্যশ্রী যুক্ত হয়ে তাঁকে করে তুলেছিল দর্শনীয়। শোনা যায় যৌবনে তিনি নাকি কোন সার্কাস পাটিতে বাঘের সঙ্গে খেলা দেখিয়েছিলেন কিছুদিন।

সোহং স্বামীর এই মল্লবীরের জীবন থেকে সাধক জীবনে রূপান্তর যেমন আকস্মিক তেমনি এক অদ্ভুত ঘটনা। একবার শ্রামাকান্ত পথ দিয়ে আপন মনে বীর বিক্রমে হেঁটে চলেছেন। যখন তিনি কোথাও যাওয়া-আসা করতেন অথবা কোন অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করতেন তাঁর দৈহিক শক্তির প্রাচুর্য পথের দুপাশের লোকদের দৃষ্টি

সেদিন কিন্তু পথের সামনে একটি ঘটনা দেখে বেশ আশ্চর্য হলেন শ্রামাকান্ত। কিছুটা রাগান্বিতও বটে। দেখলেন পথের সামনে জটাজুটমণ্ডিত ক্ষীণকায় এক সন্ন্যাসী বসে রয়েছেন। তবে ধ্যান বা জপতপ কিছুই করছেন না। চোখ দুটি খোলা রয়েছে। শ্রামাকান্ত গম্ভীর গলায় সন্ন্যাসীকে পথ থেকে সরে যেতে বললেন। কিন্তু সেকথায় কোন কর্ণপাত করলেন না সন্ন্যাসী। পরপর তিনবার একই অনুরোধ করলেন শ্রামাকান্ত। অবশেষে সন্ন্যাসী বললেন, কে তুমি হে ছোকরা, আমায় বিরক্ত করছ। তোমার যদি এতই অনুবিধা হয় হয় তাহলে তুমি আমায় ধরে তুলে পথ থেকে একটু পাশে সরিয়ে রেখে যাও না। দেখছ না, আমি বুড়ো মানুষ, নড়তে পারছি না। আমি আর কতটুকু ভারী হব।

সন্ন্যাসীর একথার পর আত্মাভিমানে কিছুটা আঘাত লাগল শ্রামাকান্তের। তিনি সঙ্গে সঙ্গে সন্ন্যাসীকে ধরে তুলে পথের পাশে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু আশ্চর্য! বারবার চেষ্টা সত্ত্বেও সন্ন্যাসীকে মাটি থেকে একটুও তুলতে পারলেন না। সন্ন্যাসী শুধু মৃদু হেসে একবার চাইলেন শ্রামাকান্তের দিকে, তারপর বললেন কি হে ছোকরা এতদিন শরীর নিয়ে এত কসরৎ করে কী করলে? আমার মত সামান্য একটা রোগা বুড়োকে তুলতে পারছ না! অথচ চেহারাটা তো বেশই বাগিয়েছ।

শ্রামাকান্ত নিষ্ফল আক্রোশে ফুলতে লাগলেন ভিতরে ভিতরে। কোন উত্তর করলেন না। অবশেষে ভুল ভাঙল তাঁর। তিনি এবার বেশ বুঝতে পারলেন, এ সন্ন্যাসী কোন সাধারণ মানুষ নন; ইনি নিশ্চয় একজন শক্তিমান যোগীপুরুষ। মানুষের আত্মিক শক্তি কত অপরিসীম হতে পারে এবং সেই শক্তির তুলনায় তার দৈহিক শক্তি কত অকিঞ্চিৎকর এবং তুচ্ছ, এই ঘটনাটির মাধ্যমে যোগীবর এই শিক্ষাই তাঁকে দিতে চান।

সন্ন্যাসীর পায়ে লুটিয়ে পড়ে ক্ষমা ভিক্ষা করলেন শ্রামাকান্ত। অবিলম্বে দীক্ষা গ্রহণ করলেন। কাতরকণ্ঠে বললেন, এতদিন আমি অন্ধকারে ছিলাম। এবার দয়া করে আমার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত করুন প্রভু যাতে আত্মা কী বস্তু তা আমি সম্যকভাবে বুঝতে পারি।

এইভাবে সদগুরুর কৃপায় একে একে বেদ বেদান্ত দর্শন স্মৃতি প্রভৃতি দুস্তর জ্ঞানসাগর পার হয়ে তিনি হয়ে উঠলেন মহাপ্রাজ্ঞ সোহং স্বামী। আত্মদেবতাকে দর্শন করে তিনি লাভ করলেন সুবিমল ব্রহ্মানন্দ।

সোহং স্বামী পরে ব্রহ্মজ্ঞ সাধক তিব্বতীবার সংস্পর্শে আসেন। সাধারণ অর্থে মন্ত্রদীক্ষা দান করতেন সোহং স্বামী। তিনি বলতেন, যার মনন করলে ভাববন্ধন হতে ত্রাণ হয় তাকেই মন্ত্র বলে। তার আগে আত্মজ্ঞান লাভ করতে হবে। কিন্তু আত্মজ্ঞান লাভ করতে হলে আবার অনাত্ম বিষয়ের প্রতি আসক্তি হতে আত্মাকে একেবারে মুক্ত করতে হবে। আত্মা এবং আত্মেতর বস্তুর মধ্যে পার্থক্যটি ভালভাবে জানতে হবে। অনাত্ম বা আত্মেতর বিষয়ে আসক্ত ও মোহবদ্ধ হয়ে মন্ত্রের বোঝা বয়ে বেড়ালে কোন ফলই হবে না।

সোহং স্বামীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে তাঁর নির্দেশ মতো সাধনা শুরু করে দিলেন যতীন্দ্রনাথ। সাধনা মানে জপতপ কিছু নয়। একদিকে শাস্ত্রপাঠ এবং অন্যদিকে ইন্দ্রিয় জয়ের চেষ্টাই হলো তাঁর সাধনার লক্ষ্য, হলো আত্মজ্ঞান লাভ। আত্মজ্ঞান লাভ হলেই ব্রহ্মকে জানা যাবে। আত্মাকে বাদ দিয়ে ব্রহ্মের কোন অস্তিত্ব নেই, যেমন আধারকে ছেড়ে আধেয় কখনো থাকতে পারে না।

কিন্তু এই আত্মজ্ঞান লাভ করতে হলে প্রথমে অনাত্ম বিষয়সমূহ হতে ইন্দ্রিয়গণকে প্রতিনিবৃত্ত করতে হবে। ইন্দ্রিয়ের তাড়নায় মানুষ জড়বস্তুর উপর আপন আত্মাকে আরোপিত করে বলে, এটা আমার জিনিস, ওটা আমার জিনিস। এইভাবে বিভিন্ন ইন্দ্রিয় আমাদের প্রতিনিয়ত বাইরের অজস্র অনাত্ম বস্তুর দিকে টেনে নিয়ে চলেছে। আমাদের আসক্ত করে তুলেছে ভোগ-লালসায়।

তাই সোহং স্বামী বললেন, সুললিত যৌবনের সৌন্দর্য তোমার দৃষ্টিকে শ্রলুক করবে বার বার; কিন্তু তুমি তোমার দর্শনেন্দ্রিয়কে এমনভাবে সংযত করবে যাতে সে সৌন্দর্য তোমার কাছে বিষ বলে মনে হয়। সরল সংগীত শুধা তোমার কর্ণকুহরে প্রবেশ করে তোমার শ্রবণেন্দ্রিয়কে বিমোহিত করবে; কিন্তু তোমার শ্রবণেন্দ্রিয়কে এমনভাবে সংযত করে তুলবে যাতে সেই সংগীতের মধুর সুর কর্কশ ও ভৈরব গর্জন বলে মনে হয়। সুগন্ধ ভ্রাণ নাসিকা রন্ধ্রে প্রবেশ করে তোমার ভ্রাণেন্দ্রিয়কে বিবশ করে ফেলবে। কিন্তু তোমার ভ্রাণেন্দ্রিয়কে এমনভাবে জয় করবে যাতে সে আর কোনদিন কোন সুগন্ধে প্রলোভিত না হয়। তোমার স্বাদেন্দ্রিয়কে এমনভাবে দমন করবে যাতে সে সুস্বাদু খাওয়ার জন্তু কখনো লালায়িত না হয়। তোমার স্বগেন্দ্রিয়কে এমনভাবে সতর্ক করে দেবে যাতে কোন কোমল বস্তুর মৃহল স্পর্শে কোন ভাবের আবেশ না জাগে তার মধ্যে।

এইভাবে দেখবে পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ বিভিন্ন বিষয়ের প্রতি যেন তোমার লেশমাত্র স্পৃহা না থাকে।

পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের পর মন। মনকে সংযত না করলে কোন কাজই হবে না। সুখে দুঃখে সব সময় বিচলিত হয়ে ওঠে আমাদের মন।

সোহং স্বামী বললেন, মনকে সব সময় এমনভাবে শান্ত ও সংযত রাখবে যাতে তাতে কখনো রাগ বা দ্বেষ না জাগে। যেন তা কখনো সুখে হরষিত বা দুঃখে বিষাদিত না হয়। যশ-অপযশ বা মান-অপমানকে সে যেন সমান জ্ঞান করে। সম্পদ বা ঐশ্বর্যকে সে ধূলিকণার মতো দেখে।

গুরুদেবের কথা যত্নের সঙ্গে অনুধাবন করতে লাগলেন যতীন্দ্রনাথ। শাস্ত্র পাঠ, চিন্তন ও সংযম সাধনের সঙ্গে সঙ্গে সেবার্কার্যও করে যেতে লাগলেন। অল্পদিনের মধ্যেই শ্রীত হয়ে উঠলেন গুরুদেব। সাধনার কঠোরতা ও একাগ্রতা দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলেন।

সোহং স্বামী একদিন যতীন্দ্রনাথকে কাছে ডেকে বললেন, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, অচিরেই তুমি আত্মজ্ঞান লাভ করবে বৎস। তুমি জ্ঞান, আত্মজ্ঞানলাভই আমাদের সাধনার চরম লক্ষ্য। আত্মার মধ্যেই আছে সব। আত্মাকে জানলেই সব কিছু জানতে পারবে।

সেদিন তখন সন্ধ্যা হয়ে আসছিল। অদূরের পাহাড় সংলগ্ন কুহেলিজাল অন্ধকারে জমাট বেঁধে উঠছিল। যতীন্দ্রনাথ সেই পাহাড়ের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে থাকতে অনুভব করলেন, তাঁর অন্তরেও ওই পাহাড়ের মতো এক অটল অচল প্রতিজ্ঞা অনমনীয় দৃঢ়তায় মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। সাধনায় তিনি সিদ্ধিলাভ অবশ্যই করবেন।

কোন কিছুই টলাতে পারবে না তাঁকে। যদি কোনদিন সংশয়ের কুয়াশা বা হতাশার অন্ধকার জাগে মনে, তাহলে তাঁর গুরুদেবের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত সব কুয়াশা ও অন্ধকার দূরীভূত করে পথ দেখাবে তাঁকে। তিনি ভাবলেন, যদি তাঁর গুরুদেব প্রথম থেকে দেহচর্চা করে এসে সহসা দেহচর্চা ছেড়ে আত্মজ্ঞানের দুরূহ সাধনায় সিদ্ধিলাভ করতে পারেন, তাহলে তিনিও কেন সিদ্ধিলাভ করবেন না সে সাধনায়? তাঁরও সাধনায় তো যত্ন বা চেষ্টার কোন ক্রটি নেই।

তবে একটা প্রশ্ন প্রায়ই তাঁর মনে জেগেছে। প্রশ্নটা অনেক দিন থেকেই গুরুদেবের কাছে তুলবেন ভাবছেন, কিন্তু স্বামীজীর কাছে গেলেই ভুলে যান। তাঁর কত সব অমূল্য উপদেশের অমৃত ধারায় সে প্রশ্ন ভেসে যায়, তলিয়ে যায়।

অবশেষে কিন্তু একদিন প্রশ্নটা তুললেন যতীন্দ্রনাথ। যতদূর সম্ভব বিনীতভাবে বললেন, আচ্ছা গুরুদেব, উপনিষদে ব্রহ্মলাভকেই সাধনার মূল লক্ষ্য বলেছে। অবশ্য সেখানে “আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ আত্মা বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ” এই ধরনের আত্মাকে জানবার কথাও আছে। কিন্তু সেখানে ব্রহ্ম-লাভই বড় কথা। আত্মজ্ঞানলাভ সেখানে ব্রহ্ম-

জাভের সোপান মাত্র। কিন্তু আপনি আত্মজ্ঞানলাভকেই সাধনার মূল লক্ষ্য বলেন কেন ?

শান্ত অথচ দৃঢ়কণ্ঠে সোহং স্বামী বললেন, আমি এর আগেও হয়ত এ বিষয়ে বলেছি, আবার বলছি। কিন্তু আমার একথা তো নতুন নয়। আসলে আত্মাই যে ব্রহ্ম, একথা উপনিষদেই আছে।

যতীন্দ্রনাথ নীরবে উৎকর্ণ হয়ে শুনতে লাগলেন। সোহং স্বামী বললেন, যারা ব্রহ্মের উপাসনা করে তারা নিজেদের অদ্বৈতবাদী বলে প্রচার করলেও আসলে তারা দ্বৈতবাদী। কারণ, একদল ব্রহ্ম মানে আর একদল ব্রহ্ম মানে না—সারা বিশ্বের মানুষকে এই দুইভাগে তারা ভাগ করছে। দ্বিধা দ্বন্দ্বহীন কোন তত্ত্ব যদি থাকে তো সে হচ্ছে আত্মতত্ত্ব। ‘আমি আছি’ একথা পৃথিবীর সব মানুষই জানে। একথা স্বীকার করতে কারো কোন দ্বিধা থাকতে পারে না। আত্মারূপ পরমার্থকেই বিশেষিত করবার জন্য আমরা ব্রহ্ম, বিষ্ণু, ভূমা প্রভৃতি শব্দ প্রয়োগ করি। এইজন্য ব্রহ্মকল্পনা একেবারে ত্যাগ করে আত্মতত্ত্ব নিরূপণ করাই হলো আমার সাধনার লক্ষ্য।

সোহং স্বামী আরও বললেন, বেদের ব্রাহ্মণভাগে নানারকমের স্বর্গের উল্লেখ আছে। উপনিষদের মতে এই স্বর্গে যাবার আশা ত্যাগ করতে হবে। ইন্দ্রলোক, বরুণলোকে গেলেই যে ব্রহ্মদর্শন হয় তা নয় ; বরং এই আত্মার মধ্যেই ব্রহ্মদর্শন সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়ে থাকে। আরসিতে যেমন লোকে আপনার প্রতিবিম্ব পরিষ্কার-ভাবে দেখতে পায় তেমনি আত্মাতে ব্রহ্মদর্শন হয়।

স্বপ্নে যেমন মানুষ নিজেকে অস্পষ্টরূপে অনুভব করে, পিতৃলোকে তেমনি ব্রহ্ম দর্শন হয়। জলে যেমন নিজের রূপ দেখতে পাওয়া যায়, গন্ধর্বলোকে তেমনি ব্রহ্মদর্শন হয়। আলো থেকে ছায়া যেমন পৃথক থাকে, তেমনি ব্রহ্মলোকে ব্রহ্ম ও জগৎ পৃথক থাকে। এইভাবে দেখা যায় পূর্ণ ব্রহ্মদর্শন আত্মা ছাড়া কোথাও হয় না।

বেদান্ত তাই বলে, সর্বোচ্চ স্বর্গ আমাদের নিজের আত্মা। পূজার
জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ মন্দির মানবাত্মা। অতএব আত্মাই ব্রহ্ম।

তদেব শুক্রং তদব্রহ্ম তদেবায়ুতমুচ্যতে
তস্মিলোকাশ্রিতাঃ সৰ্বে তত্নাত্যেতি কশ্চন। এতদ্বৈতং।

তিনি উজ্জ্বল, তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই অমৃতরূপ উক্ত হন। সমুদয়
লোকে তাঁকেই আশ্রয় করে আছে। কেউ তাঁকে অতিক্রম করতে
পারে না! ইনিই সেই আত্মা।

সোহং স্বামী পরিব্রাজন পছন্দ করতেন না। যতীন্দ্রনাথ
একবার দেশ পরিভ্রমণে বার হতে চাওয়ায় তিনি বলেছিলেন. কোন
স্থান কখনো আত্মদর্শনে সহায়তা করতে পারে না। যতক্ষণ না
তুমি মনে-প্রাণে পবিত্র হও, যতক্ষণ না তোমার চিত্ত নির্মল হচ্ছে,
ততক্ষণ, গয়া গঙ্গা, অরণ্য পাহাড়, বারানসী বা স্বর্গে যাওয়ায় কোন
লাভ নেই। তোমার চিত্তদর্পণ নির্মল ও স্বচ্ছ হলে তুমি এখানে
বসেই তার মধ্যে প্রকৃত সত্য উপলব্ধি করবে।

স্বামীজীর হরিদ্বারে একটি আশ্রম ছিল। যতীন্দ্রনাথকে একবার
কিছুদিনের জন্য সেই আশ্রমে পাঠানো হ'ল। সেখানে যাবার অল্প
কিছুদিনের মধ্যেই স্থানীয় সকলের শ্রদ্ধাভাজন হয়ে ওঠেন যতীন্দ্রনাথ
তার আত্মজ্ঞানের গভীরতায় বিচারবুদ্ধির সূক্ষ্মতায় ও ব্যবহারের
মাধুর্যে মুগ্ধ হয়ে যায় সকলে।

এই সব খবর পেয়ে সোহং স্বামী বিশেষ তুষ্ট হন যতীন্দ্রনাথের
উপর। তারপর একদিন নিজে হরিদ্বারের আশ্রমে গিয়ে জন কল্যাণের
জন্য গুরুরূপে অবতীর্ণ হবার অনুমতি দান করেন যতীন্দ্রনাথকে।
এবার থেকে তিনি ভক্তদের কাছে শ্রীমদ্ নিরালম্ব স্বামী নামে পরিচিত
হবেন।

তখন থেকে অবিচ্ছিন্ন ও মোহগ্রস্ত মানুষের মধ্যে আত্মজ্ঞান
সঞ্চারিত করাই হলো নিরালম্ব স্বামীর একমাত্র কাজ। পাঞ্জাবের

বহু উচ্চশিক্ষিত লোক তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তাঁদের মধ্যে অমরনাথ ও লীলাবতী তাঁর বিশেষ স্নেহভাজন হয়ে ওঠেন।

তিনি সকলকে বোঝাতে লাগলেন, তোমরা প্রথমে নিজেকে চেন। নিজেকে চিনলেই দেশকে, ক্রমশঃ বিশ্বকে চিনতে পারবে। আত্মজ্ঞান হলেই আত্মশক্তি বাড়বে। সেই আত্মশক্তি দিয়ে অসাধ্য সাধন করতে পারবে তোমরা।

সোহং স্বামী তাঁর সোহং সংহিতাতে বলেছেন, দেহবোধ বা দেহাভিমানই জীব-লীলার কারণ। এই আত্মজ্ঞান না হলে অর্থাৎ আত্মাকে চিনতে না পারলে এই দেহবোধ যাবে না। আর এই দেহবোধ না গেলে সব মানুষকে সমজ্ঞানে দেখতে পারা যাবে না। বস্তুতে বস্তুতে মানুষে মানুষে সব ভেদজ্ঞান যাবে না।

সোহংস্বামী তাঁর ধর্মতত্ত্বের এই সহজ উপলব্ধিকে ছন্দোবদ্ধ এক সুন্দর কাব্যরূপ দান করে যান তাঁর সোহং সংহিতায় ;

জেনেছি অবিজ্ঞা জাত জীবত্ব দেহাভিমান
দেহ অভিমানে হয় আত্ম আশ্রয়ের জ্ঞান।
সেই জ্ঞান হতে হয় মমত্বাদি বিকশিত
মমত্ব (আমার বোধ) সংসার এ নামাঙ্কিত।
আমি জীব এই জ্ঞান ধর্মের ভিত্তি নিশ্চয়
বিনা জীবত্বাভিমান সাধন সম্ভব নয়।
জাতি বর্ণাশ্রম, ধর্ম, বিধি যাহা দৃষ্ট হয়
সকল হয় প্রবৃত্ত জীবত্ব করি আশ্রয়।
ধার্মিক সাধক সাধু সিদ্ধ ভক্ত যোগীগণ
জীবত্বের গণ্ডী মধ্যে করিছে পর্যটন।
জীবত্ব বিলুপ্ত যথা সহ দেহাত্মক জ্ঞান
নাহি তথা ধর্মার্থ বর্ণাশ্রম অভিমান।

আত্মতত্ত্ব ও ব্রহ্মবিজ্ঞা লাভে নারীরও যে সমান অধিকার আছে পুরুষের মতো, একথা জোরের সঙ্গে প্রচার করতেন নিরালস্য স্বামী।

ব্রহ্মতত্ত্বে আত্মতত্ত্বে ও বেদাদিতে শূদ্র ও স্ত্রীজাতির কোন অধিকার নেই—এই শাস্ত্রবিধি যুক্তিসহ খণ্ডন করেন নিরালস্য স্বামী। এ বিষয়ে তাঁর গুরুদেব সোহং স্বামী যে উপদেশ দান করেছিলেন সেই উপদেশ তিনি ভক্তদের দান করতেন। প্রাচীন বেদ, উপনিষদ, বহু দৃষ্টান্তের উল্লেখ করে রমণীর ব্রহ্মবিद्या লাভের অধিকারকে তিনি প্রতিষ্ঠিত করেন। সন্ন্যাসকালে ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য ভার্যা মৈত্রেয়ীর আত্মা অনাত্মা বিচার করে আত্মতত্ত্ব ও ব্রহ্মতত্ত্ব সম্বন্ধে বহু উপদেশ দান করেন, রাজর্ষি জনকের সঙ্গে সুলভা বহু তত্ত্ববিচার করেছিলেন। ভাগবতে মাতা দেবহুতির প্রতি কপিলের উপদেশের কথার উল্লেখ আছে। ব্রাহ্মণ, শূদ্র, নারী, পুরুষ, শ্লেচ্ছ, যবন নির্বিশেষে সকলকেই বেদবিद्या ও আত্মতত্ত্ব উপদেশ দান করতেন নিরালস্য স্বামী। তিনি তিনি ছিলেন সকলের প্রিয় স্বামীজী।

হরিদ্বারে কিছুকাল থাকার পর হঠাৎ বাংলাদেশের কথা মনে পড়ল তাঁর একদিন। তাঁর মনে হলো, বাংলাদেশে এই ধরনের একটি যোগাশ্রম গঠন করা দরকার। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল তাঁর শৈশবের লীলাভূমি গাঁয়ের শেষে খড়ি নদীর ধারের সেই ছায়া-নিবিড় আমবনের কথা যে বনের পদপ্রান্ত বিধৌত করে নীরবে বয়ে চলেছে ক্ষীণকায়ী খড়ি নদীর নিঃশব্দ স্রোত। বড় শান্ত শীতল ও মনোরম জায়গাটি। ঠিক বন না বলে কুঞ্জ বলা উচিত।

বড় বড় আম বট ও অশথের জটিল শাখা-প্রশাখাগুলি পরস্পরে ঘন সন্নিবিষ্ট হয়ে সত্যিই এক বিরাট কুঞ্জ রচনা করে রেখেছে যেন। নিচের বনস্থলীটি যেমন ছায়াশীতল, তেমনি পরিষ্কার। অবাস্তিত আগাছার দল দুর্গম করে রাখেনি তার কোন অংশকে।

সব কিছুর বিবরণ দিয়ে সোহং স্বামীর কাছে প্রসঙ্গটা উত্থাপন করতেই সানন্দে রাজী হয়ে গেলেন স্বামীজী।

হরিদ্বার থেকে নৈনিতাল হয়ে বাংলাদেশের পথে রওনা হলেন নিরালম্ব স্বামী।

বহুদিন পর বাড়ি ফিরছেন বলে এমন কিছু বিশেষ আনন্দ অনুভব করলেন না নিরালম্ব স্বামী। বিশ্বের সব জায়গা তাঁর এখন সমান প্রিয়। তিনি এখন সর্বভূতের অন্তরে ও বাইরে এক আত্মাকে দেখতে পেয়েছেন।

সেই এক আত্মা আকাশবাসী সূর্য, অন্তরীক্ষবাসী বায়ু, বেদিবাসী অগ্নি ও কলসবাসী সোমরস। তিনি জলে পৃথিবীতে যজ্ঞ ও পর্বতে উৎপন্ন হন। তিনি মনুষ্য, দেবতা, যজ্ঞ ও আকাশে অবস্থান করেন। তিনি সত্য ও মহান।

যেমন একই অগ্নি ও বায়ু ভুবনে প্রবিষ্ট হয়ে নানা বস্তুভেদে বিভিন্ন বস্তুরূপ ধারণ করেন, সেইরূপ সর্বভূতের এক অন্তরাত্মা নানাবস্তুভেদে সেই বস্তুরূপ ধারণ করেছেন; আবার তাদের বাইরেও আছেন। আত্মার একত্ব উপলব্ধিই হলো প্রকৃত সুখবাদ।

বহুদিন পর গাঁয়ের লোক তাঁকে দেখে খুব খুশি হলো। তাদের সেই যতীন আজ প্রশান্ত গম্ভীর এক স্বামীজী হয়ে উঠেছে। যখন তারা শুনল, যতীন্দ্রনাথ গাঁয়েই থাকবেন তখন থেকে তাদের আনন্দ আরও বেড়ে গেল।

ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই স্ত্রী কেঁদে উঠলেন সন্তান শোকে। তাঁদের একমাত্র সন্তান সেই কণ্ঠাটি মারা গেছে। সন্ন্যাসধর্ম অবলম্বনের কথা পত্র মারফত স্ত্রীকে আগেই জানিয়েছিলেন নিরালম্ব স্বামী। তাই সাংসারিক শোক দুঃখে তাঁর ওদাসিত্বের কথা ভেবেই কণ্ঠার মৃত্যু সংবাদ জানাননি তাঁর স্ত্রী।

সত্যিই সমস্ত দুঃখ-সুখের উর্ধ্ব উঠে গেছেন, নিরালম্ব স্বামী।

আজ্ঞানের অনাবিল আনন্দে বিভোর হয়ে আছেন সব সময়।
মৃত্যুশোক তাঁকে স্পর্শ করেছে কোন্ সাহসে।

চোখ থেকে এক ফোঁটা জলও গড়িয়ে পড়ল না নিরালস্য স্বামীর।
নিতান্ত সহজ ও নির্বিকারভাবে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন স্ত্রীকে।

শান্ত হবার পর স্ত্রী বললেন, সংসারের সুখ-দুঃখের সব
বোঝা আমার উপর চাপিয়ে দিয়ে মুক্তির আনন্দে একা তুমি
ঘুরে বেড়াবে?

হাসিমুখে নিরালস্য স্বামী বললেন, ইচ্ছা করলেই যে কোন
মুহুর্তে এ-বোঝা নামিয়ে ফেলতে পার। আমি তো তোমায় মুক্তই
করতে চাই। মুক্তি ও আনন্দের যে অমৃত ভাণ্ড আমি বহু-
সাধনার দ্বারা আহরণ করে এনেছি তার অর্ধাংশ তোমায় আমি
দিতে চাই। তুমি আমার কাছে এস। আমার সত্যিকারের
সহধর্মিণী হয়ে ওঠ। এই গায়ের শেষপ্রান্তে খড়ি-নদীর ধারে
আশ্রয় স্থাপন করে সেখানেই বাস করব। সংসারের সব বোঝা
ফেলে দিয়ে তুমিও আমার সঙ্গে বাস করবে।

কথাটা শুনে লজ্জায় সংকুচিত হয়ে উঠলেন স্ত্রী। লজ্জা
পাওয়া স্বাভাবিক। দেশে প্রচলিত সংস্কারের ফলে একথা তিনি
ভাবতেই পারেন না। তাঁর ধারণা, আশ্রমবাসী সাধকের পক্ষে
স্ত্রীসঙ্গ সাধনার পরিপন্থী। দেশের সব সাধু-সন্ন্যাসীরাই স্ত্রীসঙ্গ
ত্যাগ করে চলে ন।

নিরালস্য স্বামী প্রাচীন শাস্ত্র থেকে দৃষ্টান্তের উল্লেখ করে
বুঝিয়ে দিলেন স্ত্রীকে। তারপর বললেন, আমার গুরু শ্রীমদ সোহং
স্বামীরও এই অভিমত। স্মৃতরাং এতে কোন বাধা থাকতে
পারে না।

অবশেষে স্ত্রী মত দিলেন।

প্রথমে জায়গা সংগ্রহ হলো। তারপর পুরোদমে আশ্রম
নির্মাণের কাজ আরম্ভ হয়ে গেল। এরই মধ্যে দু-চারজন ভক্ত

এসে জড়ো হয়েছে। তারাও সবাই প্রাণপণ খাটছে। তাদের মধ্যে আছেন গ্রাম সম্পর্কীয় ভাই ধর্মদাস রায় ও যুগেন সামন্ত। এঁরা দু'জনেই যতীন্দ্রনাথকে ছোট থেকেই আপন অগ্রজের মত জ্ঞান করতেন। যতীন্দ্রনাথও তাঁদের ছোট ভাই-এর মত ভালবাসতেন।

আশ্রমের মধ্যে ঘর নির্মাণের আগে প্রথমে একটি উঁচু বেদীর উপর প্রাচীন উপনিষদের যুগের ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য ও তাঁর স্ত্রী মৈত্রেয়ীর মূর্ত্তয় প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত হলো। তারপর শুরু হলো আশ্রম জীবন।

ক্রমে লোকমুখে ছড়িয়ে পড়তে লাগল চান্নার আশ্রমের কথা আর নিরালম্ব স্বামীর খ্যাতি। এ আশ্রম যে দেখে সেই মুগ্ধ হয়ে যায়। দেখে আর প্রাচীন ভারতের মুনি-ঋষিদের তপোবনের কথা মনে পড়ে যায়। তবে তিনি কাউকে কানে কানে মন্তব্যদীক্ষা দান করতেন না। দান করতেন শুধু নীতি-উপদেশ।

কিছুদিনের মধ্যে একথা কলকাতায় নিরালম্ব স্বামীর অতীত জীবনের অনেক বিপ্লবী সহকর্মীর কানে গিয়ে পৌঁছাল। তাঁদের মধ্যে দু'চারজন গোপনে দেখা করতে এলেন। তাঁরা বিশ্বাসের সঙ্গে লক্ষ্য করলেন, নিরালম্ব স্বামী রাজনৈতিক জীবন ত্যাগ করে সাধক জীবন ঘাপন করলেও বিপ্লবীদের প্রতি দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের বীর যোদ্ধাদের প্রতি এখনো পূর্ণ সমর্থন আছে তাঁর। নিরালম্ব স্বামীর এই সমর্থন পেয়ে উৎসাহিত বোধ করলেন বিপ্লবীরা। পরে তাঁদের অনেকে কলকাতা থেকে পুলিশের ভয়ে পালিয়ে এসে চান্নার আশ্রমে আত্মগোপন করে থাকতেন।

আশ্রমে বিপ্লবীদের অবোধে আসা-যাওয়া দেখে নিরালম্ব স্বামীর কয়েকজন ঘনিষ্ঠ ভক্তের মনে প্রশ্ন জাগল। স্বামীজী কেন যে বিপ্লবীদের হিংসাপূর্ণ কার্যাবলীকে সমর্থন করছেন এটা তারা কিছুতেই বুঝতে পারলেন না।

একদিন একজন ভক্ত কথাটা তুলতেই স্বামীজী শান্তকণ্ঠে বললেন, কেন সমর্থন করব না, এ হচ্ছে ধর্মযুদ্ধ। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে কৃষ্ণ নিজে যুদ্ধ করেননি; কিন্তু তিনি আয়ের খাতিরে ধর্মের খাতিরে পাণ্ডবদের সমর্থন ও সাহায্য করেছিলেন। অধর্ম ও অত্যাচারের মূর্ত প্রতীক পররাজ্যলোভী অত্যাচারী ইংরেজদের তাড়ানো মানাই অধর্মকে সরিয়ে ধর্মকে সংস্থাপন করা। এ-কাজ যারা করছে তাদের সমর্থন করব না ?

তাছাড়া আত্মার স্বরূপ কী তা জানিস না বলেই তোরা একথা বলছিস। আত্মা হচ্ছে নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত। এই আত্মা কখনো কাউকে হনন করতে পারে না বা কারো দ্বারা নিহত হতে পারে না।

আর একজন ভক্ত তখন প্রশ্ন করলেন, সমস্ত জীবের মধ্যে যদি একই আত্মা বিরাজ করে তাহলে এক জীব আর-এক জীবের উপর অত্যাচার করে কেন, একজন মানুষ অণু মানুষের ছুঃখ-কষ্ট নিজের অন্তরে অনুভব করে না কেন ?

নিরালম্বস্বামী বললেন, এ প্রশ্ন আমিও একদিন আমার স্বামীজীকে করেছিলাম। কিন্তু ভেবে দেখ্ আসলে ব্যাপারটা কত সহজ। মনে কর, একই জল কতকগুলো পাত্রে ঢেলে রাখলি। তারপর পাত্রগুলিকে পৃথক পৃথক জায়গায় সরিয়ে রেখে তাদের মধ্যে একটিকে যদি নাড়াতে থাকিস তাহলে অপর কোন পাত্রের জল তাতে নড়বে কি ? তেমনি একই আত্মা সব মানুষের মধ্যে থাকলেও দেহভেদে তার রূপ বদলে যায় এবং দেহের অভিমান ও মায়ায় বদ্ধ থাকার ফলে একে অপরের ছুঃখ বুঝতে পারে না।

আশ্রম জীবন যাপন করলেও কোনরূপ আত্মনিগ্রহ পছন্দ করতেন না নিরালম্ব স্বামী। পরিধানে সব সময় দামী রেশমী বস্ত্র ব্যবহার করতেন। ভোজনে তাঁর রুচি ছিল বড় মৃদু ও চড়া স্বপ্নে বাঁধা। রোজ টাটকা ঘিয়ের লুচি খেতেন। তাছাড়া ছিল দুধ,

ক্ষীর, ছানা মাখন। প্যাকেটে করে ভাল ভাল সন্দেশ আসত বাইরে থেকে। আসত বাস্ক বোঝাই ভাল ভাল ফল।

খাওয়ার পর পান এবং তামাক দুই-ই খেতেন। তাও আসত বাইরে থেকে। গয়া থেকে আসত পান আর বিক্യാচলের কাছাকাছি অরোড়া রোড থেকে আসত ভাল তামাক। কে কখন কোথা হতে কী পাঠাচ্ছে তাঁর কোন ঠিক ছিল না। তিনি কাউকে কখনো অনুরোধ করতেন না কোন কিছু পাঠাবার জন্ত। অথচ সবই আপনা থেকে জুটে যেত।

কিন্তু এই সব আরাম উপভোগের সঙ্গে সঙ্গে চলত ধ্যান সাধন ও সমাধি। এই মহাপ্রাজ্ঞ জ্ঞানতপস্বীর জ্ঞান-সাধনার বিরাম ছিল না একটি দিনের জন্তও। তিনি তাঁর অহংকার চিত্ত বুদ্ধি ও মনকে এমন ভাবে সংযত করে রেখেছিলেন যার ফলে এত আরাম এত স্বাচ্ছন্দ্য এত প্রাচুর্য কখনো বিন্দুমাত্র ভোগাসক্ত করে তুলতে পারেনি তাঁকে।

একদিকে তিনি ছিলেন মহাযোগী; অত্ৰদিকে তিনি ছিলেন মহাভোগী। একদিকে তাঁর সাধনার কঠোরতা ও গভীরতা; অত্ৰদিকে আহার-বিহারে বিলাসপ্রিয়তা। তাঁর সাধক জীবনের মধ্যে এই আপাতদৃষ্ট বৈপরিত্য দেখে অনেক ভক্ত আশ্চর্য হয়ে যান।

এ বিষয়ে একদিন তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি বলেন, এসব হচ্ছে আমার সাধনার অঙ্গ। ভোগ সুখের বিচিত্র উপাদান আমার চারিপার্শ্বে ছড়ানো থাকবে সব সময়; তারই মধ্যে এগিয়ে চলব আমি সাধনার ক্ষুরধার পথে। আমি ভোগ করব; কিন্তু ভোগের কোন অভিমান থাকবে না আমার মধ্যে। পদ্বপত্রে পয়ঃপ্রায় নির্মল নির্লিপ্ত আমার চিত্ত। নিত্যশুদ্ধ চিরমুক্ত আমার আত্মা।

নিরালস্য স্বামী গভীরভাবে আরও বললেন, আমার মায়াময় দেহেন্দ্রিয় যা-কিছু করছে তাতে আমার কোন অভিমানই নেই।

আমার ত্যাজ্য বা গ্রাহ্য বলে কোন কিছু নেই। হেয় বা উপাদেয় বলে কোন বস্তু নেই; অনুরাগ বা দ্বেষ বলে কোন অনুভূতি নেই। কর্মাকর্ম, ধর্মাদর্ম ও শুভাশুভের মধ্যে সমস্ত ভেদজ্ঞান লুপ্ত হয়ে গেছে আমার কাছে।

এক বিস্ময় বিমিশ্রিত শ্রদ্ধায় ভরে উঠল উপস্থিত ভক্তদের চিত্ত। তাঁরা বুঝলেন, অনেক উর্ধ্বে উঠে গেছেন তাঁদের স্বামীজী। সাধনার যে-স্তরে উঠে সাধকেরা আত্মার একত্বকে অনুভব করে অর্থাৎ বিশ্বের সর্বভূতের মধ্যে নিজের আত্মাকে ও নিজের আত্মার মধ্যে বিশ্বের সর্বভূতকে দেখেন, নিরালস্য স্বামী এখন সে স্তরও পার হয়ে গেছেন। এই স্তরেও আত্মার প্রকৃত স্বরূপ দর্শন হয় না। কারণ এখানেও অভিমান থাকে, বিশ্বের সঙ্গে এক মায়িক সম্পর্কে ছড়িয়ে থাকে আত্মা।

একমাত্র নির্বিকল্প সমাধির মধ্য দিয়েই আত্মার স্বরূপ দর্শন হয়। একথা সোহং স্বামীর কাছ থেকে শিখে ছিলেন নিরালস্য স্বামী।

তাই মাঝে মাঝে নির্বিকল্প সমাধিতে ডুব দিতেন নিরালস্য স্বামী। নির্বিকল্প সমাধির অনন্ত সিদ্ধুসলিলে দীর্ঘকাল অবগাহন করার পর যখন আবার এই মর্তলোকে উঠে আসতেন, তখন অস্বাভাবিক রকমের প্রশান্তগম্ভীর দেখাত তাঁকে। মনে হ'ত অদৃশ্য অলৌকিক জলকণায় সিক্ত শীতল হয়ে উঠেছে তাঁর দেহগাত্র। এই বিশ্বজগৎকে তিনি নূতন রূপে দেখছেন।

এই সময় একদিন তাঁর স্ত্রী দেহত্যাগ করেন। নিতান্ত সহজ ও নির্বিকারভাবে পত্নীশোক সহ্য করলেন, যেমন একদিন সন্তান-শোক সহ্য করেছিলেন।

কিছুদিন ধরে শরীরটা ভাল যাচ্ছিল না নিরালস্য স্বামীর। তাই জল হাওয়া পরিবর্তনের জন্তু কয়েকজন ভক্তের চেষ্টায় তাঁকে তদানীন্তন পুরুলিয়া জেলার অন্তর্গত গোমোতে এক শিশুর বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে কিছুদিন থাকার পর তাঁর স্বাস্থ্যের

উন্নতি হয়। কিন্তু যখন যেখানেই থাকুন না, ভক্ত ও শিষ্যদের প্রতি অগ্নুগ্ন থাকত তাঁর স্নেহ। তাদের শুভাশুভ ও ভালমন্দের কথা চিন্তা করতেন। গোমো থেকে চান্নার ধর্মদাস রায়কে যে একখানি পত্র লেখেন তাতে মন ও প্রাণের সম্পর্ক এবং মনঃসংযম সম্বন্ধে তাঁর অমূল্য উপদেশ নিহিত আছে। পত্রখানি লেখেন ১৯১৯ সালের ১১ই নভেম্বর তারিখে।

শুভাশীর্বাদ

তোমার পত্র পাইলাম। লীলাবতীর নিকট তোমরা সমস্মানে গৃহীত হইয়াছে শুনিয়া সুখী হইলাম। তাহার পত্রও পাইয়াছি। তাহার এখানে আসিবার ইচ্ছা আছে। যদি তোমাদের নিকট আসিতে ইচ্ছা প্রকাশ করে ও তাহার যদি কোন অশুবিধা না হয় তবে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবে, পরে তাহার নিকট খরচের টাকা না থাকিলে আমি এখান হইতে টাকা পাঠাইয়া দিব। আমি তাহাকে পত্রের উত্তর দিয়াছি। তবে এসব কথা কিছু লিখি নাই। আমরা উপস্থিত ভাল আছি ও শরীর ভাল হইতেছে। দুর্গাদাস এখানে আছে। তোমরা কেমন থাক লিখিবে।

তোমাদের প্রশ্নের জবাব অনেকবার শুনিয়াছ—তোমার মনে নাই। প্রাণ স্থির হইলে মন কতকটা স্থির হয় বটে, কিন্তু যখন মন সম্যক স্থির না হইলে আত্মস্থ হইতে পারে না তখন প্রাণ স্থিরীকৃত করিয়া মন স্থির করার চেষ্টাকে গোণ উপায় বলা যাইতে পারে; এই রাস্তাকেই অধুনা লোকে যোগমার্গ কহে। প্রাণ স্থির করিতে হইলেও মনের সংকল্প বা চেষ্টা ব্যতীত হইবে না। পক্ষান্তরে মন স্থির করিবার চেষ্টা করিলে প্রাণ বা অজ্ঞাত যাবতীয় ক্রিয়মান পদার্থ বিনা আয়াসেই স্থির হইয়া আসে। সুতরাং বিচার দ্বারা বা নিরোধের চেষ্টা দ্বারা মনকে স্থির করার চেষ্টাকে মুখ্য উপায় বলা যায়।

সুষুপ্তিতে মন অজ্ঞানে লয় হয়। এই অজ্ঞানই জগৎ দর্শনের কারণ। কার্য হইতে কারণ সূক্ষ্ম। সেইজন্য যখন সুষুপ্তিতে মন

নাই বলিয়া বোধ হয় তখন মন সূক্ষ্ম নিজ কারণে স্থিরপ্রায় হইয়া থাকে কিন্তু এসব সময়ে নির্বিকার আমি (আত্মা) তাহার জ্ঞাতা স্বরূপ হইয়া থাকি। আমি সর্ব সময়ে সকল অবস্থায় দ্রষ্টা, জ্ঞাতা বা সাক্ষী।

বিশ্ব মায়ার ক্রিয়ার দ্বারা পরিচালিত হইতেছে। সেই মায়াকে গীতাকার দুইভাগে ভাগ করিয়া পরা ও অপরা এই দুই নাম দিয়াছে। কিন্তু পরের শ্লোকেই আমাকেই (আত্মাকে) জগৎ কারণ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছে। মায়াতে স্বল্প গুণের আধিক্য থাকায় তাহাকে জগৎধাত্রী বলা হয় আর মনে রজো ও তমো গুণের আধিক্য থাকায় মনকে মায়ার ব্যষ্টিভাব বলা যায়। এই ত্রিগুণময়ী মায়ার কর্তৃত্বে কখন মন প্রাণের পরিচালক আবার কখন (যেমন সুষুপ্তিতে অজ্ঞান অবস্থায় ও সমাধিতে) মুখ্যভাবে মায়ার অধীন অর্থাৎ মনের বিনা কর্তৃত্বে নিয়তি (মায়া) সাপেক্ষ হইয়া ক্রিয়া করে। প্রকৃতি বা মায়া, পরাই হোক আর অপরাই হোক অচেতন। একমাত্র চৈতন্য আমাকে আশ্রয় করিয়া আছে বলিয়া সান্নিধ্যবশতঃ উহাকে সচেতনের মতো বলিয়া বোধ হয়। বাস্তবিক পরমার্থতঃ আমি ব্যতীত আর কিছুই নাই। ব্যবহারে জগৎ কারণ নির্ণয় করিতে যাইয়া লোককে বুঝাইবার জন্ত আত্মশক্তি মায়া প্রকৃতি ইত্যাদি কল্পিত। পরা প্রকৃতিকে যে-প্রাণ বলে সে-প্রাণ বা প্রকৃতিতত্ত্ব কিছুই জানে না। মন (ব্যষ্টিভাব) আছে বলিয়া সমষ্টি মায়া আছে। অর্থাৎ ইহার আবেশিক; সুতরাং মন যখন সম্পূর্ণভাবে আত্মসংস্থ হয় তখন মায়া বা প্রকৃতি থাকে না। সেইটি মনের সাম্যাবস্থা আর জগৎ দর্শন বা ভোগ মনের বৈষম্য অবস্থা। সমাধিতে মনের সাম্যভাব থাকে। তাকে মনের না থাকা বলা যায়। পাক্ষভৌতিক দেহের ক্রিয়া প্রাণ নয়। প্রাণ পাক্ষভৌতিক দেহ ব্যতিরিক্ত কখনও কখনও থাকিতে পারে। মনের ও প্রাণের সম্বন্ধ রাজা ও মন্ত্রীর সম্বন্ধ। তবে মনের অজ্ঞাতে মায়ার অধীনে প্রাণের স্বাধীন ক্রিয়াও দেখা

যায়। সূত্ৰপিপাসাময় ইচ্ছাশক্তিবিশিষ্ট দেহ হইতে সূক্ষ্মতর একটি কোষ আছে দেহমধ্যে। তাহার নাম প্রাণময় কোষ। সেইটি লিঙ্গ, দেহের একটি স্থূল অঙ্গ।

শেষ কথা—মন না থাকিলে কিছুই থাকে না। মনের সাম্য-ভাব বা স্থিরভাব সমাধি—সেই অবস্থায় যাই থাকুক তাহা অবস্থ। মনের নিরোধই কর্তব্য। সোহং-গীতার যোগটি একবার ভাল করিয়া পড়িবে। যখনই কোন বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হইবে তখনই নিজে যাহা শুনিয়াছ তাহার বিচার দ্বারা এবং সোহং গীতা ও সোহংসংহিতায় পাওয়া উপদেশের দ্বারা মীমাংসা করিবার চেষ্টা করিবে। সোহংসংহিতার উপসংহার ইত্যাদি পুনঃ পুনঃ পড়িবে ও বিচার করিবে।

সোহং স্বামী সোহংগীতা ও সোহংসংহিতা নামে দুটি গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থ দু'টিতে আত্মতত্ত্ব ও ব্রহ্মতত্ত্ব প্রাচীন শাস্ত্র থেকে দৃষ্টান্ত সহযোগে আলোচনা ও ব্যাখ্যা করেছেন এবং করণীয় কর্তব্য সম্পর্কে বহু নীতি-উপদেশও দান করেছেন। নিরালস্য স্বামী এই অমূল্য গ্রন্থ দু'টি ভক্ত ও শিষ্যদের সকলকে বারবার পড়তে অনুরোধ করতেন। তবে বিচার বিশ্লেষণের উপর জোর দিতে বলতেন। অন্ধভাবে কোন জিনিস মেনে নিতে বা অনুসরণ করতে নিষেধ করতেন।

গোমো থেকে চান্নার আশ্রমে ফিরে আসেন নিরালস্য স্বামী। এই সময় যজ্ঞেশ্বর চট্টোপাধ্যায় নামে একজন পণ্ডিত ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। যজ্ঞেশ্বরবাবু বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনের অধ্যাপক ছিলেন। কিছুদিন আগে হঠাৎ চাকুরি ছেড়ে চান্নায় এসেছেন।

বয়স এমন কিছু বেশী হয়নি তবু এরই ভেতর শরীর কেমন যেন ভেঙ্গে পড়েছে স্বামীজীর। অথচ আশ্চর্য! দেহটা দিনে দিনে

যত অশক্ত হয়ে পড়ছে তাঁর আত্মশক্তি যেন ততই বেড়ে চলেছে। স্বামীজী যেবার তিপান্ন বছরে পদার্পণ করলেন সেবার বহুমূত্র রোগটা বেশ কষ্ট দিতে লাগল তাঁকে।

কিছুদিন চিকিৎসার পর রোগটা কমল। ভক্ত শিষ্যরা ভাবল বিপদ কেটে গেছে।

একদিন বিকালবেলায় তিনি আশ্রমে কয়েকজন লোকের সঙ্গে গল্প করছেন। অনুজপ্রতিম চান্নাগ্রাম নিবাসী যুগেন সামন্তও রয়েছেন। সহসা গড়গড়ার নলটি পায়ে পড়ে গিয়ে একটি জায়গা সামান্য একটু ছড়ে যায়।

যন্ত্রণায় সে-রাত্রিতে ঘুমোতে পারলেন না নিরালম্ব স্বামী। পরদিন যুগেনবাবু আশ্রমে তাঁর খবর নিতে এলে বললেন, খবর ভাল নয়। কলকাতায় বরানগরে তার করে দাও, আমি যাচ্ছি।

বরানগরে স্বামীজীর একজন প্রিয় শিষ্য ছিলেন। তিনি তখন চিকিৎসার জন্তু তারই কাছে যাবার মনস্থ করলেন।

তারপর আশ্রমের শিষ্যদের বললেন, যুগেনই আমার সঙ্গে যাবে।

গোরুর গাড়ি করে খানাজংশনে গিয়ে ট্রেন ধরা হলো। হাওড়া স্টেশনে পৌঁছে দেখা গেল, গঙ্গার পুল খুলে দিয়েছে। তখন কাঠের ভাসা পুল ছিল এবং মাঝে মাঝে তা খুলে দেয়া হ'ত। তাই বাধ্য হয়ে অপেক্ষা করতে হলো স্টেশনে বসে। বরানগর থেকে তাঁর শিষ্য গাড়ি নিয়ে আসতে পারেননি।

পুল ঠিক হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই শিষ্য এসে হাজির হলেন। বাড়িতে নিয়ে গিয়ে পরম যত্নে সেবা করতে লাগলেন। চিকিৎসার কোন ক্রটি হলো না। সবচেয়ে বড় ডাক্তার ডাকা হলো। কিন্তু কোন ডাক্তারই আশা দিতে পারলেন না। বললেন, বহুমূত্র থেকেই এ-রোগের উৎপত্তি। তবে পাটা হাঁটু পর্যন্ত কেটে বাদ দিলে রোগীকে বাঁচানো যেতে পারে।

নিরালম্ব স্বামী কিছুতেই তা করতে রাজী হলেন না। বললেন,

আমি দেহত্যাগ করতে প্রস্তুত আছি, এভাবে বেঁচে থাকতে চাই না।

শিষ্যরা কান্নাকাটি করে তাঁকে রাজী হবার জন্য অহুন্নয়-বিনয় করল। কিন্তু কারু কোন কথা শুনলেন না তিনি। অগত্যা যেখানে যত শিষ্য ছিল সব জায়গায় টেলিগ্রাম করে স্বামীজীর অবস্থার কথা জানানো হলো।

একে একে সবাই এসে হাজির হলেন। কিন্তু স্বামীজী শুধু একজনদের খোঁজ করতে লাগলেন। মৃত্যুর সময় যত ঘনিয়ে আসতে লাগল ততই বারবার শুধু বলতে লাগলেন, যোগেশ এলো না ?

যোগেশবাবু ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে বিছানায় উঠে বসলেন স্বামীজী। ডান হাত বাড়িয়ে দিতেই যোগেশবাবু ছুটে এসে তা ধরে ফেললেন। যোগেশবাবুর সারা শরীর কঁপে উঠল।

দেখতে দেখতে ধ্যান-সমাধিতে মগ্ন হয়ে পড়লের নিরালস্য স্বামী। জীবিত অবস্থায় সমাধির সময় যোগীরা ছাঁটি অবস্থা প্রাপ্ত হন। একটি বিরাটাবস্থা ও অপরটি ব্যুত্থান। সমাধিতে মগ্ন হওয়ার পর ধ্যেয় বস্তুর সঙ্গে যখন একাত্ম হয়ে যান যোগীরা তখন তাঁরা বিরাটাবস্থা প্রাপ্ত হন। তার পরের অবস্থা ব্যুত্থান অর্থাৎ তখন সমাধি থেকে আনন্তে আনন্তে জেগে ওঠেন।

ঘরের মধ্যে উপস্থিত সবাই বুঝতে পারলেন, এবার স্বামীজীর সমাধি আর ভাঙ্গবে না। প্রজ্ঞাদীপ্ত তাঁর যে যোগেন্দ্রহুটি মুদ্রিত হয়ে পড়ল তা আর কোনদিন উন্মীলিত হবে না। চিত্ত বুদ্ধি মনকে ব্রহ্ম করে অহংকারের আবরণ ভেদ করে তুরীয় সংজ্ঞার যে অবিজ্ঞাত অন্তঃপুরে তিনি এইমাত্র চলে গেলেন সেখান থেকে আর কোনদিন ফিরবেন না।

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডব্যাপী বিশাল আত্মচেতনার নির্বিশেষ গভীরে তাঁর জৈব চেতনার ক্ষীণ ধারাটি একেবারে বিলীন হয়ে যেতেই নীরব নিষ্পন্দ হয়ে উঠল তাঁর মরদেহটি।

স্বামীজীর মরদেহ ত্যাগের পর প্রধান প্রধান শিষ্যরা চান্নার আশ্রমের ভার কার উপর দেওয়া যায় তা নিয়ে আলোচনা করতে লাগলেন। কিন্তু কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারলেন না। অবশেষে সবাই মৃগেনবাবুর মত চাইলেন।

মৃগেনবাবু তখন বললেন, যতীনদা অবশ্য এ-বিষয়ে স্পষ্ট করে কিছু বলে যাননি। কিন্তু দেহরক্ষার আগে যোগেশবাবু সম্পর্কে তার উদ্বেগ এবং আকুলতা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ নয় কি? আমার মনে হয় এ সমস্যার সমাধান ওই ঘটনার মধ্যেই নিহিত রয়েছে।

শিষ্যেরা একথা সবাই মেনে নিলেন। সর্বসম্মতিক্রমে সেইদিন যোগেশবাবুকেই চান্নার আশ্রমের ভার দেওয়া হলো।

যোগেশবাবু বছরের বেশীরভাগ সময় কাশীতে বাস করলেও মাঝে মাঝে চান্নার আশ্রমে এসে বাস করেন। তারই যত্ন চেষ্টা ও তত্ত্বাবধানে এই আশ্রমের অস্তিত্বটি মর্যাদার সঙ্গে টিকে আছে। নিরালস্য স্বামীর স্নযোগ্য শিষ্যরূপে সোহং স্বামী প্রবর্তিত জ্ঞান তপস্যার ধারাটিকে আজও তিনি আশ্চর্য দক্ষতার সঙ্গে বাঁচিয়ে রেখেছেন।



মোহনানন্দ স্বামী

শ্রীশ্রীমোহনানন্দ স্বামী

রক্তগিরিসন্নিভ তাঁর অঙ্গচ্ছটা ; ভাস্কর্য্যলিপিত গাত্রচর্ম ; ত্রিপুণ্ডক অঙ্কিত বিশাল ললাট ; মস্তকে সর্পাকৃতি জটাজাল ; পরিধানে সামান্য কোঁপীন । এ এক অদ্ভুত সন্ন্যাসী । ইনি যেন কোন মানুষ নন, যেন সাক্ষাৎ কৈলাসপতি মহাদেব ।

কিন্তু ইনি মানুষ বা দেবতা যেই হোন, একটি ছয়মাসের শিশুর পক্ষে এঁকে এমন মুগ্ধভাবে চেয়ে দেখাটা সত্যিই এক অস্বাভাবিক ঘটনা । শিশুর বাবা মা এ ঘটনা দেখে আশ্চর্য্য না হয়ে পারেন নি । ভীষণাকার কোন সাধুসন্ন্যাসী দেখে শিশুরা সাধারণতঃ ভয় পায় । কিন্তু এ শিশু ভয় পাওয়া তো দূরের কথা, অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে তাঁর দিকে । ভীতিবিহ্বলতার চিহ্নমাত্র নেই চোখেমুখে ; চললে কাঁচা লাবণ্যভরা মুখখানি জুড়ে রয়েছে এক স্নিগ্ধ বিমুগ্ধতা ।

শুধু শিশু মনোমোহনই সন্ন্যাসীকে দেখছে না, সন্ন্যাসী নিজেও মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন তার দিকে । সরকারী পরিদর্শক হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর স্ত্রী বিনয়নী দেবী গুরুদর্শন করতে গিয়ে আশ্চর্য্য হয়ে গেলেন । এই ঘটনাটির কোন তাৎপর্য্য খুঁজে পেলেন না । শুধু ভাবলেন, তাঁদের গুরুদেবের দেহ সাধারণ মানুষের মত নয় বলে শিশু এমনভাবে দেখছে, আবার তাঁদের সন্তানটিও দেখতে খুব সুন্দর বলে হয়ত গুরুদেব এমন করে খুঁটিয়ে দেখছেন ।

অনেকক্ষণ দেখার পর গুরুদেব বিনয়নী দেবীকে প্রশ্নভাবে বললেন, মায়ী তেরা লেড়কা বহুৎ সজ্জন হোগা ।

শিশু মনোমোহনের জন্মসংবাদ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যদিও আশীর্বাদ পাঠিয়ে দিয়েছিলেন গুরুদেব তথাপি গুরুদেবকে একবার ছেলে দেখিয়ে তাঁর আশীর্বাদ নেয়ার কথাটা অনেকদিন থেকেই

ভাবছিলেন বিনয়নী। আজ তাঁর সে আশা পূরণ হলো। গুরুদেব শুধু দায়সারা গোছের আশীর্বাদ করলেন না, ছেলের ভবিষ্যত সম্পর্কে এক উজ্জল আশ্বাস দিলেন। ছেলে তাঁদের সচ্চরিত্র হবে। এর থেকে তাঁদের গৌরবের আর কি থাকতে পারে।

শুধু ধর্মপ্রাণা সরলহৃদয়া বিনয়নী দেবী নন, ইংরাজি শিক্ষায় শিক্ষিত হেমচন্দ্রও ভালভাবে জানেন, তাঁদের গুরুদেব বালানন্দ ব্রহ্মচারী একজন সাধারণ সাধক নন; তিনি সিদ্ধবাক্ মহাপুরুষ। তাঁর কথা মিথ্যা হবার নয়। ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির ইতিহাসে যা কিছু শ্রেষ্ঠ ঐতিহ্য তার সম্বন্ধে গড়ে উঠেছে তাঁর আশ্রয়। তিনি দধিচির মত ত্যাগী, বশিষ্ঠের মত ক্ষমাশীল, বিশ্বামিত্রের মত কঠোরতপা। তিনি একাধারে জ্ঞান ও ভক্তিব্যোগে সিদ্ধ। তিনি ছিলেন সমস্ত সঙ্কোচ হতে মুক্ত। সমস্ত মত ও পথের উর্ধ্বে উঠে গিয়ে ধর্মসাধনার সারসভ্যটিকে উপলব্ধি ও আয়ত্ত করে ফেলেছিলেন তিনি যেন। তাই তিনি শৈবমার্গের সাধক হয়েও হরিনাম সংকীর্তন শোনার সঙ্গে সঙ্গে পরম বৈষ্ণবের মতো বিগলিত হয়ে উঠতেন এক গভীর ভক্তিভাবে।

নাড়াজোলের রাজা নরেন্দ্র খাঁ ছিলেন বালানন্দ ব্রহ্মচারীর একজন পরম ভক্ত। নরেন্দ্র খাঁর অনুরোধে বালানন্দ মহারাজ মাঝে মাঝে মেদিনীপুরের নিকটে কর্ণগড়ে এসে মাঝে মাঝে বাস করতেন। হেমচন্দ্রের পিতৃব্য কৃষ্ণচন্দ্র নরেন্দ্র খাঁর রাজ এস্টেটের ম্যানেজার ছিলেন। তিনি সস্ত্রীক বালানন্দজীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। কাত্যায়নী দেবীও অসাধারণ গুরুভক্তিপরায়ণা নারী ছিলেন। শৈশবে বাবা-মাকে হারিয়ে হেমচন্দ্র পিতৃব্যের কাছেই মানুষ হন। কৃষ্ণচন্দ্র পরম যত্নের সঙ্গে ভ্রাতৃপুত্রের উপযুক্ত শিক্ষা ও দীক্ষার ব্যবস্থা করেন এবং যথাসময়ে বিবাহ দিয়ে তাঁকে সংসারী করে তোলেন।

আদি বাড়ী নদীয়া জেলায় শিবনিবাস হলেও চাকরির খাতিরে

মেদিনীপুরে বাড়ি করে বসবাস করতে থাকেন কৃষ্ণচন্দ্র। সরকারি ইনস্পেক্টর হেমচন্দ্রকে প্রায়ই এখানে-সেখানে বদলি হয়ে ঘুরে বেড়াতে হত। দ্বিতীয় পুত্র মনোমোহনের জন্মের কিছুকাল আগেই স্বামীর চাকরীর জায়গা থেকে মেদিনীপুরে শাণ্ডি়র কাছে চলে আসেন বিনয়নী দেবী। এই সময় তাঁদের গুরুদেব বালানন্দজী কিছুদিনের জন্য কর্ণগড়ে এসে থাকেন। কৃষ্ণচন্দ্র ও কাত্যায়নী দেবীর সঙ্গে বিনয়নী দেবীও প্রায়ই মেদিনীপুর থেকে কর্ণগড়ে যেতেন গুরুদর্শনের জন্য। গুরুদর্শন করে মনে প্রাণে এত আনন্দ পেতেন যে গর্ভাবস্থাজনিত কোন ক্লেশ বা ক্লান্তিই অনুভবই করতেন না। গুরুদেবও তাঁকে স্নেহ করতেন, তাঁর ভক্তিভাবের নিবিড়তা দেখে আশীর্বাদ করতেন প্রাণ খুলে। পরে বিনয়নী দেবীর গর্ভকাল পূর্ণ হওয়ায় গুরুদেব একদিন ব্যস্ত হয়ে কৃষ্ণচন্দ্রকে বললেন, বধূমাতাকে নিয়ে তোমাদের আর কষ্ট করে আসতে হবে না। আমিই মাঝে মাঝে তোমাদের ওখানে গিয়ে দর্শন দেব।

দেহবিজ্ঞানীদের মতে গর্ভাবস্থায় মা যা গভীরভাবে চিন্তা করেন সেই চিন্তা পরবর্তীকালে সন্তানের চরিত্রগত উপাদানে পরিণত হয়। এ কথার সত্যতা বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয় মনোমোহনের জীবনে। তিনি যখন মাতৃগর্ভে অণুরূপে বিরাজ করতেন তখন যেন গুরুভক্তির এক স্বতঃসিদ্ধ ভাবরস তাঁর দেহের প্রতিটি রক্ত-কণিকায় ও অস্থিমজ্জার প্রতি অনুপরমাণুর সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মিশে যায়। এই স্বতঃসিদ্ধ ভক্তিভাবের নিগূঢ় তাড়নাতেই হয়ত ছয়মাসের অবলা শিশু মনোমোহন কুলগুরু বালানন্দ ব্রহ্মচারীর প্রতি এক আশ্চর্য নিবিড় কৌতূহলে ফেটে পড়েছিলেন।

কুলগুরুর প্রতি এই অকৃত্রিম ও অলৌকিক কৌতূহল বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কমার পরিবর্তে দিনে দিনে বেড়ে যেতে থাকে মনোমোহনের। মার মুখে কখনো কোন ভাবে গুরুদেবের কথা উঠলেই হলো। বালক মনোমোহন অমনি একরাশ প্রশ্নের বোঝা

চাপিয়ে দেবেন মার উপর। তিনি কোথায় থাকেন, কেমন তাঁর
ঘর, সঙ্গে কে কে থাকে এইসব অজস্র শিশুসুলভ প্রশ্ন।
বিনয়নী দেবী কিন্তু সেদিন ভাবতে পারেননি, এই সব সহজ সরল
প্রশ্নের ঘাত-প্রতিঘাতের ভিতর দিয়ে ধীরে ধীরে এক জটিল
আধ্যাত্মিক প্রশ্নের মেঘ জমে উঠছে শিশুর নির্মল অন্তরাকাশে।
তিনি বুঝতে পারেননি সেই মেঘ থেকে একদিন যে আবহাওয়াতী বড়ের
সৃষ্টি হবে, সেই বড় তাঁর সন্তানকে সংসার জীবন থেকে চিরতরে
উৎপাটিত করে বিশ্বাত্মবোধ ও ঈশ্বরোপলব্ধির অনন্ত সমুদ্রে নিক্ষেপ
করবে। সেই সমুদ্র মন্থন করে পরমানন্দের যে অমৃতভাণ্ড উদ্ধার করে
আনবেন মনোমোহন, তা অকাতরে অজস্র মানুষের মধ্যে বিসিয়ে
দিয়ে মঞ্জীবিত করে তুলবেন তাদের।

জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই কোণ্ঠী তৈরী হয়েছিল। কৃষ্ণচন্দ্র ভাল
জ্যোতিষী দিয়ে কোণ্ঠী তৈরি করিয়ে এনে বললেন, এ ছেলে সোজা
ছেলে হবে না। এ বড় হলে এর পিছনে বহুলোক ঘুরবে। বিনয়নী
দেবী মনে করলেন, তাঁর ছেলে খুব ধনী হবে। কাত্যায়নী দেবী
মনে করলেন, তাঁর নাতি খুব সূত্রী ও স্বাস্থ্যবান হবে। যেমন ফর্সা
রঙ তেমননি গোলগাল চেহারা, ঠিক যেন কাবুলিদের ছেলে। তাই
সখ করে ডাক নাম দিলেন, কাবু।

ছেলেবেলায় কথা খুব কম বলতেন মনোমোহন। কিন্তু
যখন যা বলতেন তা প্রত্যেকের মনে রেখাপাত করত। পড়াশুনো-
তেও বেশ ভাল ছিলেন। বিদ্যালয়ের পড়ার শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে
কলকাতায় হোস্টেলে থেকে উচ্চশিক্ষা লাভ করার ব্যবস্থা হলো
মনোমোহনের। ছোট ভাইও সঙ্গে রইল। তাছাড়া বহুবাজার
অঞ্চলে তাঁদের বড় দিদির বিয়ে হয়েছে। ছুটির দিন হলেই ছুভাই
বড়দিদির কাছে গিয়ে থাকেন।

মনোমোহন যে হোস্টেলে থাকতেন সেখানে থাকত যত ধনী
ঘরের ছেলেরা। ভোগ সুখ ও আরাম উপভোগের প্রচুর উপকরণ

চাইতে না চাইতেই হাতের কাছে পাওয়া যেত। ফরমাস খাটবার জ্ঞান কি চাকরেরা তৈরি থাকত সব সময়।

কিন্তু ওসব দিকে কোন খেয়াল ছিল না মনোমোহনের। ভোগ সুখ আরাম স্বাচ্ছন্দ্য আনন্দ উৎসব কিছুই ভাল লাগত না তাঁর। দূরবর্তিত প্রত্যয়ের এক অস্পষ্ট সুর অলৌকিক গীতধ্বনির মত বেজে উঠত তাঁর অন্তরের শূণ্যতার মাঝখানে। ক্রমে ওই ব্যাকুলতা দিনে দিনে আরও গভীর হয়ে উঠল। আরও দৃঢ় হয়ে উঠল তাঁর প্রত্যয়।

মনোমোহন তখন কলেজে আই, এস, সি পড়তেন। এই সময় প্রায়ই তাঁর মনে হত, এই পার্থিব জগতে যে জীবন তিনি যাপন করছেন সে জীবন মিথ্যা। এত কষ্ট করে যে-বিদ্যা তিনি লাভ করবার চেষ্টা করছেন, তা প্রকৃত বিদ্যা নয়, অবিদ্যা। সেই পরম অমৃতময় পরমার্থকে লাভ করাই হলো জীবনের প্রকৃত অর্থ। তাঁকে জানাই হলো প্রকৃত বিদ্যা। তাঁকে পাওয়াই হলো প্রকৃত আনন্দ।

মনোমোহনের আরও মনে হত এই জগতের সবখানে সব কিছুর মধ্যেই তিনি ছড়িয়ে রয়েছেন। কিন্তু কোথাও তাকে দেখতে পাচ্ছেন না তিনি। অবিদ্যার মায়াজালে লিপ্ত চোখ ছুটিতে অনুভব করছেন যেন এক দুঃসহ অন্ধত্ব।

সহসা যেন একদিন আলো দেখতে পেলেন মনোমোহন। তাঁর পরিচিত জনকতক ছাত্র মিলে একটি হরিসভা স্থাপন করে তাঁকে তারা নিয়ে যায়। মনোমোহন সেখানে গিয়েই প্রাণভরে হরিনাম সংকীর্তন শুরু করে দেন। এক অলৌকিক ভক্তিতাবে বিভোর মনোমোহন যখন নাচতে নাচতে কীর্তন করতেন সেই সভায়, তখন তাঁকে দেখে দর্শকদের মনে হত, এ যেন নূতন গৌরাঙ্গ। তেমনি গৌরবরণ অঙ্গ, তেমনি দীঘল নয়ন। কুঞ্চিত ঘনকৃষ্ণ কেশপাশ, তেমনি দিব্যভাবে মাতোয়ারা মন-প্রাণ। যে দেখত সেই মুগ্ধ হয়ে যেত।

যতক্ষণ এইভাবে কীর্তন করতেন মনোমোহন ততক্ষণই তিনি ভাল থাকতেন। তিনি আশ্চর্য হয়ে অনুভব করতেন, তখন আর কোন অন্ধকার নেই তাঁর চোখে। এক অলৌকিক আলোর প্রস্রবণ খেলে যাচ্ছে যেন ছোচোখের সামনে। সেই আলোর অতুজ্জ্বল বিভায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে এই জগত ও জীবনের প্রকৃত স্বরূপটি।

হরিসভায় যতক্ষণ থাকেন ভাল থাকেন মনোমোহন। কিন্তু হরিসভা থেকে হোস্টেলে ফিরে এসেই অত্যন্ত খারাপ লাগে। ছোচোখে আবার সেই অবিচার অন্ধকার নেমে আসে। মনে হয় তিনি চোখ থাকতে অন্ধ! ছোট ভাই মনোমোহন একই সঙ্গে থাকে। তবু তাকে হরিসভার কথা কিছু জানান না। হরিসভা যেন তাঁর ব্যক্তিগত আনন্দ বিনোদনের স্থান।

কিন্তু এ আনন্দ বড়ই সাময়িক। মনোমোহনের তৃপ্তি হয় না। এই ধরনের স্থায়ী আনন্দের জন্ম দিনে দিনে ব্যাকুল হয়ে উঠতে লাগল তাঁর মন। চকিত বিদ্যুতের আলো যেমন চোখের আঁধারকে আরো ঘন করে দিয়ে যায় তেমনি হরিসভার ক্ষণস্থায়ী আনন্দ তার মনের আঁধারকে বাড়িয়ে দিয়ে যায় মনোমোহনের।

এই সময় কুলগুরু বালানন্দ ব্রহ্মচারীর কথা মনে পড়ে গেল মনোমোহনের। জ্ঞান হওয়ার পর থেকে আর তাঁকে চোখে না দেখলেও মার কাছে তাঁর কথা বহুবার শুনে শুনে তাঁর সব কথা মুদ্রিত হয়ে গেছে মনের উপর। দেওঘরের আশ্রম চোখে না দেখলেও তার ছবিও যেন ভাসছে চোখের সামনে। ক্রমে একটা বিশ্বাস দিনে দিনে দানা বেঁধে উঠতে লাগল তাঁর মনে। দেওঘরের আশ্রমে গিয়ে বাস করলে তিনি পরমানন্দ লাভ করবেন। জীবন তাঁর ধন্য হয়ে উঠবে।

মনোমোহন তখন আই, এস, সি পাশ করে বি, এস, সিতে ভর্তি হয়েছেন। এমন সময় একদিন তাঁর মনের সঙ্গে সংসারের শেষ বন্ধনটুকু চিরদিনের মত ছিঁড়ে গেল। কাপড় জামা, বাস,

বইপত্র টাকা কড়ি হোস্টেলে রেখে দিয়ে একদিন শুধু দেওঘর যাবার ট্রেনভাড়াটি নিয়ে এক কাপড়ে বেরিয়ে পড়লেন মনোমোহন। ভাই-এর কাছে শুধু একটি চিঠি লিখে রেখে গেলেন। তাতে লেখা ছিল : আমি যে পথে যাইতেছি সে পথে গেলে আর ভাবনার কিছু থাকে না।

দেওঘরে বাগানন্দ ব্রহ্মচারীর আশ্রমের নাম জানে না এমন কোন লোক নেই। একদিন সকালের ট্রেনে রওনা হয়ে বিকালে দেওঘর স্টেশনে পৌঁছে আশ্রমের খোঁজ করতে লাগলেন মনোমোহন। আশ্রমের তোরণদ্বারে গিয়ে লজ্জায় একপাশে দাঁড়িয়ে রইলেন। একজন আশ্রমবাসী শিষ্য গিয়ে স্বামীজীকে খবর দিতে স্বামীজী ডেকে পাঠালেন মনোমোহনকে।

সারা দেশ জুড়ে তখন চলছিল প্রবল স্বাধীনতার আন্দোলন। অনেক বিপ্লবী যুবক যখন-তখন আশ্রমে এসে আশ্রয় চাইত। এজ্ঞা অনেকে স্বামীজীকে নিষেধ করলেন এই নতুন আগন্তকের সঙ্গে দেখা না করার জ্ঞা। কিন্তু স্বামীজী শুধু একজন সিদ্ধ যোগীপুরুষ ছিলেন না, তিনি ছিলেন করুণা ও মমতার অবতার ; আশ্রমে আগত কাউকেই তিনি কখনো বিফল মনোরথ করে ফিরিয়ে দেননি।

মনোমোহনের কাছ থেকে তাঁর নাম-ধাম প্রভৃতি যাবতীয় পরিচয় জেনে নিলেন স্বামীজী। যখন তিনি শুনলেন, মনোমোহন তাঁর প্রিয় শিষ্য হেমচন্দ্রের ছেলে তখন তাঁর বিশ্বয় ও আনন্দের এক মিশ্র অনুভূতি জাগল মনে। তিনি শান্তভাবে অনেক করে ফিরে যেতে বললেন। কিন্তু মনোমোহন তখন বললেন, আমি সংসার ত্যাগ করে ব্রহ্মচারীর জীবন যাপন করবার জ্ঞা আপনার চরণে আশ্রয় নিতে এসেছি। আপনি আশ্রয় না দিলে আমি হরিদ্বারে গিয়ে অগ্নি সাধুর আশ্রয় নেব।

তখন সন্ধ্যার শান্ত অন্ধকার নেমে এসেছে আশ্রমে। পূজা-

প্রদীপের মেহুর আলোয়, আরতির ঘণ্টাধ্বনিতে ও ধূপধূনোর গন্ধে এক অপূর্ব ভাবরসঘন পরিমণ্ডল গড়ে উঠেছে সেখানে। অবিচার সমস্ত অন্ধকার বিভিন্ন অভাবের বিষাদখিন্ন গুরুতা মন থেকে মুহূর্তে দূর হয়ে যায়। আত্মা আপন স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়; ভূমার নিরবচ্ছিন্ন আনন্দে সারা মন ভরে ওঠে।

মনোমোহনের খাওয়া খাকার সব ব্যবস্থা হয়ে গেল। গুরুদেবের স্নেহের অন্ত নেই। মনে মনে স্থিরপ্রতিজ্ঞ হয়ে উঠলেন মনোমোহন। তিনি আর সামান্য বিছা অভ্যাস করে বৃথা সময় নষ্ট করবেন না; এবার থেকে তিনি এই তপোসিদ্ধ গুরুদেবের চরণে ব্রহ্মবিছা শিক্ষা করবেন। মনোমোহন আরও ভাবলেন, তাঁর গুরুদেব শৈব না শাক্ত না বৈষ্ণব—এ বিচার বা প্রশ্ন তিনি কোনদিন করবেন না। যদিও তিনি পরম বৈষ্ণবের মতো শ্রীহরির চরণে সমস্ত প্রাণমন সমর্পণ করেছেন, মেঘবর্ণাঙ্গ গগনসদৃশ বিশ্বাধার বিষ্ণুর ধ্যানে বিধ্বত করেছেন সমস্ত অন্তরাত্মা, তথাপি এবার থেকে মহাযোগী বালানন্দব্রহ্মচারিকেই গুরুরূপে বরণ করে নেবেন অকুণ্ঠচিত্তে। মনে মনে বলতে লাগলেন মনোমোহন : গুরুব্রহ্মা, গুরুবিষ্ণু, গুরুদেবো মহেশ্বর। এবার হতে গুরুদেবই হবেন তাঁর জীবনের একমাত্র ধ্রুবতারা। তাঁকে লক্ষ্য করেই জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে চলবেন তিনি। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের মিলিত ও মূর্ত প্রতীক রূপে গুরুই এবার থেকে অবিরাম বিরাজ করবেন তাঁর চিন্তপক্ষে।

পরদিন আবার কথাবার্তা হলো। তারযোগে বাড়িতে বাবা মাকে খবর দিয়ে মনোমোহনকে অনেক করে বোঝালেন স্বামীজী। বললেন, তোমার বাবা-মার অনুমতি ছাড়া তোমাকে সংসার-আশ্রম ত্যাগ করার কথা বলতে পারি না।

মনোমোহন এক গভীর আত্মবিশ্বাস ও দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন, আমার বাবা ধর্মপ্রাণ, তিনি কখনই ধর্মপথে অগ্রসর হতে আমায়

বাধা দেবেন না। আপনার দয়া হলে আমার মা-ও নিশ্চয় অনুমতি দেবেন।

স্বামীজী আবার বললেন, এ পথে বহু কষ্ট ও তিতিকার দরকার হয়। তুমি আদর যত্নে পালিত হয়েছ। কখনো কোন কষ্ট কর নি। সুতরাং এ পথ তোমার নয়।

তেমনি দৃঢ়তার সঙ্গে উত্তর দিলেন মনোমোহন, এ পথে আসবার বাসনা মনে জাগবার সঙ্গে সঙ্গে আমি নানারকমের তিতিকা সকলের অলক্ষ্যে অগোচরে করে দেখেছি। যেমন, ভিজে কাপড় গায়ে শুকিয়ে নেয়া, ভাল শয্যা ত্যাগ করে মাটিতে শোয়া, ভৃত্যদের জন্ত তৈরি অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট খাদ্য খাওয়া প্রভৃতি কষ্টকর কাজগুলি আমি আগেই অভ্যাস করে ফেলেছি।

মোহনানন্দের কথা শুনে আশ্চর্য হয়ে গেলেন বালাানন্দ মহারাজ। জন্মের পর থেকে ভোগ-সুখের প্রাচুর্যের মধ্যে লালিত-পালিত হয়েছেন মনোমোহন; তবু তাঁর মধ্যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে জেগেছে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা। এটা সত্যিই আশ্চর্যের কথা।

খবর পেয়ে বাবা মা এসে মনোমোহনকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্ত চেষ্টা করতে লাগলেন। প্রথমে অনুরোধ, পরে অনুনয়, সর্বশেষে কান্নাকাটি। কিন্তু কোন ফলই হলো না। একেবারে যেন পাথর হয়ে গেছেন মনোমোহন। জগৎপিতার সন্ধানে ব্যাকুল হয়ে উঠেছে তাঁর সমস্ত অন্তরাঙ্গা, তাই পার্থিব পিতামাতাকে চোখে চেয়ে একবার দেখছেন না।

অবশেষে বাবা বুঝলেন। কিন্তু মা বুঝেও বুঝলেন না। হেমচন্দ্র স্বভাবতঃই ধর্মপ্রবণ। সংসারে থাকলেও মন তাঁর কখনো কোন বিষয়াসক্তিতে জড়িয়ে পড়েনি। কারণ যে জীবন নলিনী দলগত ৩-লের মত চপল সে জীবনের প্রকৃত স্বরূপ জানতে বাকি ছিল না তাঁর। যে-মুক্তির একটি গোপন আকাঙ্ক্ষা তার সংসার জীবনের অন্তরালে সূক্ষ্মভাবে বয়ে চলেছে তাঁর অন্তরে সেই মুক্তির জন্ত তাঁর পুত্র যদি সংসার ত্যাগ করে তবে কোন্ মুখে তাকে প্রতিনিবৃত্ত

করবেন। কিন্তু মা বিনয়িনী দেবী অতশত বোঝেন না। মনোমোহনের প্রতি তাঁর অন্তরের টান যেন একটু বেশী। তাঁর আরও দুটি পুত্রসন্তান থাকলেও অঙ্গকান্তির কমণীয়তা ও স্বভাবের স্নানধূর্ষের জন্ত মনোমোহন তাঁর স্নেহবিধৌত মনোভূমির এক বিরাট অংশ দখল করেছিলেন। তাঁর আদরের মোহনকেই তিনি তাঁর গর্ভের শ্রেষ্ঠ ফল বলে গণ্য করতেন।

মনোমোহন কিন্তু অটল। অনেক কান্নাকাটি করেও কোন ফল হলো না। তখন বিনয়িনী দেবী গুরুদেবকে বললেন, আমার ছেলেকে কিরিয়ে দিন।

কিন্তু গুরুদেবের কথাতেও কোন কাজ হলো না। মনোমোহনের সেই এক কথা। গুরুদেব এখানে আশ্রয় না দিলে তিনি হরিদ্বার চলে যাবেন। তখন বিনয়িনীদেবী ক্ষোভে হুঃখে গুরুদেবকে একটি কঠোর কথা বলে ফেললেন। তিনি বললেন, আপনি শেষে আমার ছেলেধরা গুরু হলেন?

কথাটা শুনে মর্মাহত হলেন বালানন্দ স্বামী। ভাল কথায় যখন কোন মতেই বোঝাতে পারলেন না বিনয়িনী দেবীকে, তখন তাঁকে একটি ভয়ানক কথা বলবার জন্য প্রস্তুত হয়ে উঠলেন। তিনি বললেন, তোমার বড় ছেলে মনিকে তো আমি কেড়ে নিই নি, সে আজ কোথায় গেল? যিনি তোমার মনিকে কেড়ে নিয়েছেন, তিনি যদি তোমার মোহনকেও কেড়ে নেন, তবে তুমি কী করতে পার? তুমি যদি জোর করে মোহনকে আবার সংসারে টেনে নিয়ে যাও, তাহলে কিছুতেই তার জীবন রক্ষা হবে না।

গুরুদেবের কাছ থেকে এই ভয়ানক কথা শুনে ভয়ে শিউরে উঠলেন বিনয়িনী দেবী। তিনি নিজের ভুল বুঝতে পেরে গুরুদেবের পা ধরে বললেন, আজ থেকে আমি আমার মোহনকে আপনার চরণে সমর্পণ করলাম।

শাস্ত্রবাক্য প্রকৃতি অনুসারে তিন ভাগে বিভক্ত। মানুষকে

বোঝাবার জন্ত সাধুরা এই ভিন রকমের বাক্য ব্যবহার করে থাকেন। এই ত্রিবিধ বাক্যের নাম হলো যথার্থ, রোচক এবং ভয়ানক। কোন সত্য কথা যথাযথভাবে বলা হলে তাকে বলা হয় যথার্থ বাক্য। কোন কথাকে হৃদয়গ্রাহী বা মধুর করে বললে তা হয় রোচকবাক্য। কেউ কোন সত্যবাক্য না মানলে তার ভয়াবহ পরিণামের সঙ্গে যখন বাক্যটি বিবৃত করা হয় তখন তাকে ভয়ানক বাক্য বলে। বালানন্দ স্বামীর এই ভয়ানক কথাটিতে কাজ হলো।

সেদিন শারদীয় মহাষ্টমী! ঘটে পটে দেবী ভগবতীর পূজা বসেছে আশ্রমে। আজ আনুষ্ঠানিক ভাবে ব্রহ্মচর্যে দীক্ষিত হয়ে সাধুজীবন শুরু করবেন মনোমোহন। হোমাগ্নির তাপে ও নানারকমের ফুলের গন্ধে এক পবিত্র ভাবের পবিবেশ গড়ে উঠেছে। স্নান করে মুণ্ডিত মস্তকে ও গৈরিক বসনে শংকর মন্দিরের দ্বারের কাছে গুরুদেবের পাশে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছেন মনোমোহন। মুণ্ডিত মস্তক ও শান্ত উদার দৃষ্টি যেমন তাঁর মুখের উপর এক স্থিতধী প্রজ্ঞাকে ফুটিয়ে তুলেছে, পরিধানের গৈরিক বসন ভেমনি বাড়িয়ে তুলেছে তাঁর গৌরবর্ণের উজ্জলতা। ওদিকে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে আশঙ্কা জাগছে মনোমোহনের মনে। কেমন করে তিনি সেবা ও সততার দ্বারা তুষ্ট করবেন তাঁর গুরুকে, কেমন করে সিদ্ধিলাভ করবেন তাঁর সাধক জীবনে সেবিষয়ে উদ্বিগ্ন না হয়ে পারছেন না তিনি।

বেদযন্ত্রের সঙ্গে প্রজ্জ্বলিত হোমাগ্নিতে কেমন করে আহুতি দিতে হয় গুরুদেব তা হাতে ধরে শিখিয়ে দিলেন মোহনানন্দকে। সেইদিন হতে অগ্নিতে আহুতি না দিয়ে জলগ্রহণ করেন না তিনি।

অবশেষে মনোমোহনের দীক্ষাকাল সম্পন্ন হয়ে গেলে। গুরুদত্ত নাম হলো মোহনানন্দ। বাবা-মা আশ্রম থেকে বিদায় নেবার জন্ত প্রস্তুত হলেন। বাবা মাকে ভক্তিভরে প্রণাম করলেন মনোমোহন। হেমচন্দ্র বললেন, তুমি যে-পথে যাচ্ছ, তার শীর্ষস্থানে গিয়ে যেন

স্থানলাভ করতে পার। এর চেয়ে বড় আশীর্বাদ আর আমি কিছু করতে পারি না। মা বিনয়িনী দেবী অনেকটা শক্ত হয়ে বললেন, আশীর্বাদ করি প্রকৃত সাধুজীবন লাভ কর। আজ হতে তুমি আর আমার মোহন নও ; তুমি ত্রীশ্রীগুরু মহারাজের। আমার গুরু সোজা গুরু নন ; একেবারে কৈলাসের শিব। এই জীবন্ত শিবের তুমি সেবা করবে। তুমি নিশ্চয়ই সিদ্ধিলাভ করবে ; তোমার আর কোন সাধনার দরকার করবে না। তবে আমার একটি শেষ আশা ও প্রার্থনা তোমার উপর রাখলাম, আমার মৃত্যুকালে তুমি আমার মুখে এক গণ্ডুষ গঙ্গাজল দেবে আর গীতাপাঠ করে শোনাবে।

শান্তভাবে মাথা নেড়ে মনোমোহন বললেন, তাই হবে মা।

মোহনানন্দের বয়স তখন মাত্র সতের। বিদায়কালে তাঁর স্বর্ণকান্তি সতের বছরের পুত্রের সন্ন্যাস বেশ দেখে সহসা বৈরাগ্যবাসনা জেগে উঠল হেমচন্দ্রের মনে। গুরুদেবকে কাতর কণ্ঠে বললেন, এরপর আর আমি হ্যাট কোট পরে চাকরি করে টাকা রোজগার করতে পারব না। আপনি আদেশ করুন, আমি চাকরিতে জবাব দিয়ে এসে আপনার চরণে আশ্রয় নিই।

কিন্তু গুরুদেব তাতে সম্মত হলেন না। বললেন, না এখনো তোমার সংসারধর্ম যাপন করতে হবে। তোমার কর্তব্য এখনো শেষ হয়নি। তোমার আরও দুটি সন্তান আছে, তাদের মানুষ করে তুলতে হবে।

মোহনানন্দের বাবা মা চলে গেলে নিশ্চিত হলেন বালানন্দ স্বামী। শুধু মোহনানন্দ নয়, তারপর পর পর তিনজন যুবক শিষ্যের আবির্ভাব ঘটল আশ্রমে। তাঁদের নাম যথাক্রমে তারানন্দ, সত্যানন্দ ও পরমানন্দ।

কিছুকাল আগে আশ্রমে একদিন ভক্তদের কাছে বালানন্দস্বামী বলেছিলেন, এতবড় আশ্রমে ছ চারজন সাধুছেলের দরকার। পরমাত্মাদেওকা মর্জিসে কোই সাধু লেড়কা আয় যায়েঙ্গে। এই

প্রসঙ্গে গীতার রাজবিদ্যা-রাজগুহ্যযোগের অন্তর্গত একটি শ্লোক আবৃত্তি করে তার অর্থটি বুঝিয়ে দিলেন।

অনন্তাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্যুপাসতে।

তেবাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম ॥

শ্রীভগবান অর্জুনকে বলেছেন, যাঁহারা অন্ত চিন্তা বা কামনা ত্যাগ করে একমনে আমারই কথা ভাবেন আর সর্বদা আমারই উপাসনা করেন, সেই ভক্তদের অলঙ্ক বস্তুর প্রাপ্তি ও লঙ্ক বস্তুর রক্ষণ-কার্য আমি সম্পাদন করে থাকি।

বালানন্দ স্বামীর অকুণ্ঠ ঈশ্বর বিশ্বাস ও ভক্তির ফলেই তাঁর মনের মধ্যে বাসনা জাগতে না জাগতেই ঈশ্বর তা পূরণ করে দিলেন।

সাধনমার্গের দিক থেকে বালানন্দ স্বামী শাক্ত। তিনি বালেশ্বরী দেবীর সাধক ও সেবাইত। কিন্তু মোহনানন্দের অন্তরটি আগে থেকেই কৃষ্ণভক্তির রসে আগ্নুত। বিষ্ণুর ধ্যানে বিধ্বত তাঁর চিত্ত! অবশ্য সব দেব দেবীর স্তব ও ধ্যান তিনি জানতেন; তবু হরিনামে আখরগুলি সময়ে সময়ে কণ্ঠে তাঁর অনুরণিত হয়ে উঠত আপনা হতে। মাঝে মাঝে কোন কাজ করতে করতেই মোহনানন্দ অনুভব করতেন তাঁর দেহের ভিতরে প্রতিটি অস্থিমজ্জা ও স্নায়ুতন্ত্রী স্পন্দিত হয়ে উঠছে হরিনাম গানের অশ্রুত ধ্বনিতে।

নিজে হরিভক্ত হলেও বালেশ্বরী দেবীর আশ্রমে শাক্ত গুরুদেবের অধীনে ব্রহ্মচর্য জীবন যাপন করতে কোন অসুবিধা হত না মোহনানন্দের। দেবদেবী সম্পর্কে কোন দিন কোন ভেদজ্ঞান ছিল না তাঁর মনে। উচ্চকোটি সাধক হিসাবে তাঁর গুরুদেবও ছিলেন ধর্মগত সমস্ত গৌড়ামি ও সংস্কার থেকে মুক্ত।

আশ্রমের সব সাধুছেলেদের মধ্যে মোহনানন্দ ও তারানন্দের কণ্ঠ ছিল খুব মিষ্টি। যা কিছু গাইতেন বা পাঠ করতেন তাই মধুর লাগত সকলের। গুরুদেব তাই সামবেদ শেখাতেন তাঁদের এবং

স্তোত্রগান করবার জন্তু সখ করে একটি হারমোনিয়াম কিনে দিয়েছিলেন। মাঝে মাঝে আশ্রমের মধ্যে সভা হত। সেই সভায় মোহনানন্দ ও তারানন্দ গুরুদেব ও ভক্তবৃন্দকে বিভিন্ন দেবদেবীর স্তবগান শোনাতেন।

কিন্তু তাতেও মনে তৃপ্তি পেতেন না মোহনানন্দ। প্রাণভরে আপন মনে হরিনাম সংকীর্তন না করলে তাঁর মনে হত দিনটা বুথাই গেল। সারাদিন ধরে তাঁকে মন্দিরের কাজ, ঠাকুরসেবা ও গুরুসেবা করতে হত। সন্ধ্যা থেকে রাতপর্যন্ত সারতে হত অনেক কাজ। মাঝখানে বিন্দুমাত্রও অবকাশ পেতে না। তারপর গুরুদেবের খাওয়া শোয়ার পর কিছুক্ষণ তাঁর পদসেবার পর পূর্ণ অবকাশ পেতেন মোহনানন্দ। কিন্তু তখন তিনি অত্যাশ্র গুরুভাইদের মতো বিছানায় যেতেন না। খঞ্জনিটি হাতে করে হরিনাম গাইতে গাইতে আশ্রম থেকে পাহাড় ও বনের দিকে চলে যেতেন। তারপর একটি উঁচু পাথরের উপর বসে প্রাণভরে হরিনাম গান করতেন।

নিশীথ রাত্রির বাতাস স্তব্ধ এবং নিস্তরঙ্গ থাকায় বহু দূর ছড়িয়ে পড়ত সেই গানের সুর। আশ্রমবাসীদের কানে গিয়েও তা লাগত। একদিন স্বয়ং গুরুদেবও তা শুনতে পেলেন। পরদিন মোহনানন্দকে ডেকে বললেন, তুমি গভীর রাত্রিতে গাছপালাকে হরিনাম শোনাও। কিন্তু আমি কী পাপ করেছি যে আমাকে শোনাও না ?

মোহনানন্দ স্বভাবতই লাজুক। মাথা নিচু করে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন। সেদিন থেকে রোজ ভোর না থেকেই গুরুদেবের ধ্যান কুটিরের রোয়াকের পিছন ধারে খঞ্জনি বাজিয়ে হরিনাম গান করতেন মোহনানন্দ আর সেই গানের মধুর প্রভাবী সুর ধ্যানরত গুরুদেবের ধ্যান ভাঙ্গিয়ে দিত। এইভাবে ধীরে ধীরে গুরুদেবও মেতে উঠলেন হরিনামে।

একদিন গুরুদেব মোহনানন্দকে বললেন, আমাকেও তোমার সামিল করে নাও। আমিও তোমার সঙ্গে হরিনাম করব।

একদিকে জ্ঞান, অত্ৰদিকে ভক্তি। একই সঙ্গে দুটি শিক্ষাই চলতে লাগল মোহনানন্দের। একদিকে চলছে চতুর্বেদ শিক্ষা, শাস্ত্রপাঠ ও শাস্ত্র আলোচনা! অত্ৰদিকে ভক্তিরসাম্বতস্বরূপ হরিনাম সংকীৰ্তন। গুরুদেব বলতেন, জ্ঞান ভক্তি একই কথা। জ্ঞান যদি ফল হয়, ভক্তি হবে ফলের রস। ফল থেকে রস যেমন পৃথক হয় না, তেমনি জ্ঞান হতে ভক্তিও পৃথক হতে পারে না।

বেদ-বেদান্ত প্রভৃতি জটিল ধর্মতত্ত্ব যিনি অকাট্য যুক্তির দ্বারা জলের মত সহজ করে বুঝিয়ে দিতে পারেন, সেই মোহনানন্দ হরিনাম শোনার সঙ্গে সঙ্গে বিগলিতচিত্ত হয়ে পড়েন। অবিরল আনন্দাশ্রু ঝরে পড়ে ছুচোখে। অলৌকিক পুলকের রোমাঞ্চ জাগে সারা অঙ্গে।

মোহনানন্দ শুধু একজন সুগায়ক নন, তিনি একজন সুকবি। কীর্তনের বেশীর ভাগ পদই শ্রীমুখ হতে আপনা থেকে বেরিয়ে আসে। স্বরচিত পদ নিজের মুখে নিজের কণ্ঠে গানে পরিণত হয়।

মোহন স্বামীর কণ্ঠের নাম শুনে মনে হয়, ভগবানকে না পাওয়ার আৰ্ত্তি, বিগলিত অন্তর্বেদনা গান হয়ে ঝরে পড়ছে। যে গান শুনে একই সঙ্গে চিত্তে জাগে পুলক, নয়নে ঝরে অশ্রু এবং মুখ হয়ে ওঠে রুদ্ধবাক।

হরিভক্তিবিসয়ক কতকগুলি সংস্কৃত পদের সুন্দর বাংলা পদ্যানুবাদ করেছেন মোহনস্বামী। এই স্বচ্ছ সুন্দর অনুবাদগুলিতে তাঁর কবিত্ব শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। এই পদগুলি কীর্তনরূপেও গীত হয় স্বচ্ছন্দে! ‘তৃণাদপি সুনীচেন’ এই অতিপ্রচলিত সংস্কৃত পদটি অনুবাদ করে মোহন স্বামী—গেয়েছেন,

তৃণসম অকিঞ্চন দীনতম হয়ে
তরুসম চিত্তে ধৈর্য ধারণ করিয়ে
মানহীন মানীজনে করি মান দান
সদাই মুখেতে লহ শ্রীহরির নাম।

মোহনস্বামী মনে করেন, যে ঈশ্বরকে আমরা সং চিৎ ও আনন্দ রূপে দেখি, কৃষ্ণনাম হচ্ছে সেই নামেরই স্বরূপ। নাম এবং নামী হচ্ছে অভিন্ন। অখিল রসামৃতের মূর্ত প্রতীক কৃষ্ণ স্বয়ং এবং তাঁর নাম পৃথক নয়। এই কৃষ্ণকে পেলে পৃথিবীর সব কিছুকে পাওয়া হবে কারণ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সব কিছু তাঁরই মধ্যে আছে। হাততালির শব্দে যেমন করে পাখি পালিয়ে যায় ভয়ে, তেমনি হরি হরি বলে হাততালি দিলে বাসনারূপ যত সব বিহঙ্গ নিমেষে পালিয়ে যায়। হরির ধ্যানে মত্ত হয়ে এক জায়গায় নিশ্চল হয়ে বসে থাকলেও পরমানন্দ লাভ হবে।

মোহন স্বামী আরও মনে করেন, কলিযুগে মানুষে মানুষে ভেদজ্ঞান যখন প্রবল হয়ে উঠছে দিনে দিনে তখন জ্ঞানের চেয়ে ভক্তির দরকার বেশী। ভক্তিরসাম্প্রিত যে বৈষ্ণব ধর্মের ধারাটি উপযুক্ত ভক্ত বা সাধকের অভাবে লুপ্ত হয়ে যেতে বসেছিল, যেই লুপ্তপ্রায় ধারাটির মধ্যে এক নূতন গতিবেগ সঞ্চারিত করে দিলেন মোহন স্বামী। জ্ঞানের দ্বারা মানুষ সকল বস্তু ও জীবের অন্তঃস্থলে নিহিত নিগূঢ় কেন্দ্রগত ঐক্যটির কথা বুঝতে পারে; কিন্তু কার্যতঃ সকলের সঙ্গে এক হতে পারে না। জ্ঞানী কখনো অন্তর দিয়ে অপরকে ভালবাসতে পারে না, পরের মত প্রাণ খুলে কাঁদতে পারে না; সব কিছু জেনে শুনে ও বুঝে বসে থাকে। কিন্তু ভক্তির প্লাবন একবার অন্তরে জাগলেই ব্যক্তিসীমানার সমস্ত প্রাচীর ভেঙ্গে দিয়ে এক করে দেয় আমাদের সকলের সঙ্গে।

গৌরাজ মহাপ্রভুর নদীয়া ত্যাগের দৃশ্যটির কথা আলোচনা করলেই জ্ঞান ও ভক্তির পার্থক্যটি ভালভাবে বুঝতে পারা যাবে। গৌরাজ মহাপ্রভু নদীয়া ত্যাগ করে চলে যাবার সময় সব ভক্ত শিষ্য শোকে আকুল হয়ে মাটিতে পড়ে কাঁদতে লাগল। একমাত্র অদ্বৈত প্রভুর চোখের জল নেই। একমাত্র তিনিই শুধু শুকনো চোখে নির্বিকারভাবে পাথরের মত দাঁড়িয়ে রইলেন। হৃদয়ে কিন্তু একটা

আলোড়ন অনুভব করলেন তিনি। নীরব দর্শকরূপে এই সক্রিয় দৃষ্টি দেখে একটি বিশেষ উপলব্ধি জাগল তাঁর অন্তরে। তিনি তখন আর থাকতে না পেরে গৌরাজ মহাপ্রভুর পা দুটো ধরে বললেন, আর সকলকে ভক্তিশিক্ষা দিয়ে আমায় কেবল শুকনো জ্ঞান দিয়ে নিষ্ঠুরের মতো চলে যাচ্ছ? আমি তোমায় কিছুতেই যেতে দেব না। আমাকেও ভক্তি দাও প্রেম দাও যাতে আমি আর পাঁচজনের মত 'হা গৌরাজ' বলে আকুল হয়ে কাঁদতে পারি।

গৌরাজ মহাপ্রভু তখন বললেন, সকলেই যদি শ্লোকে অভিভূত হয়ে অজ্ঞান হয়ে গড়াগড়ি যায়, তাহলে কে কার মুখে জল দেবে। কে কাকে দেখবে? তাই তোমায় শুধু জ্ঞান দিয়ে অবিচলিত রাখতে চেয়েছিলাম।

কিন্তু অদ্বৈত প্রভু তাঁর দাবী আদায় না করে ছাড়বেন না। তিনি গৌরাজ মহাপ্রভুর পা দুটি তেমনিই আকড়ে ধরে রইলেন। তখন মহাপ্রভু বললেন, তুমি যখন একান্তই ছাড়বে না, তখন এই নাও তোমার প্রেমভক্তি যা আমি আমার বহির্বাসের আঁচলে বেঁধে নিয়ে যাচ্ছিলাম। এই বলে মহাপ্রভু সেই আঁচলের গ্রন্থিটি খুলে দিলেন আর সঙ্গে সঙ্গে 'হা গৌরাজ, 'হা গৌরাজ' বলে শ্লোকে আকুল হয়ে কাঁদতে কাঁদতে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন অদ্বৈত প্রভু।

আশ্রমে থেকে ভোগ এবং যোগ একই সঙ্গে শিখতে নাগলেন মোহন স্বামী। তখন বালেশ্বরী দেবীর মন্দিরের মাসিক আয় পাঁচ-হাজার টাকা। আশ্রমে ভোগ্য বস্তুর অভাব নেই। কিন্তু প্রথম থেকেই বৈবাগ্যের চড়া সুরে মনটি বাঁধা বলে কোন বস্তুর প্রতি কোন আসক্তিই অনুভব করেন না তিনি। আজ যাঁরা মোহন স্বামীকে দশটি আঙ্গুলে দশটি হীরের আংটি পরে থাকতে দেখে আশ্চর্য হয়ে যান তাঁরা জানেন না, এও এক অদ্ভুত যোগসাধনা। ভোগ্য বস্তু অঙ্গের সঙ্গে যুক্ত হয়ে থাকবে সব সময়। তবু সে বস্তুর স্পর্শ-জনিত কোন ইন্দ্রিয়ানুভূতি জাগবে না। সাধনার দ্বারা সে

অনুভূতিকে জয় করতে হবে ধীরে ধীরে। দীর্ঘদিনের সাধনায় এ অনুভূতিকে জয় করেছেন মোহন স্বামী।

তবে সব সোনাই খাঁটি নয়। কোন সোনা খাঁটি কিনা তা চারটি পরীক্ষার দ্বারা স্বর্ণকার জানাতে পারে। স্বর্ণকারের কাছে সোনাকে যেমন চারটি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়, তেমনি সব শিষ্যকেই গুরুদেবের কাছে চারটি কঠোর পরীক্ষা দিতে হয়।

সোনার প্রথম পরীক্ষা হচ্ছে ঘর্ষণ অর্থাৎ কোষ্ঠি পাথরে ঘষা; দ্বিতীয় ছেদন অর্থাৎ কেটে ভিতরটা দেখা; তারপর তাপ আর চোট অর্থাৎ তাপ দিয়ে গলানো ও হাতুরী দিয়ে পেটা। এই ভাবে সোনাকে খাদশূন্য করে তাই দিয়ে গয়না তৈরি করে স্বর্ণকার। গুরুর কাছে সব শিষ্যকেও যে চারটি পরীক্ষা দিতে হয় তা হলো গুরুকে সেবা গুণ্ধবার দ্বারা তুষ্ট করা; গুরুর কাছে কাছে থাকা; কঠোর তিতিক্ষা ও আত্মনিগ্রহের মধ্য দিয়ে চলা এবং গুরুর কাছ থেকে লঘুদোষে গুরুদণ্ড পেয়েও গুরুভক্তি অটুট রাখা।

শেষের দুটি পরীক্ষা সত্যিই বড় কঠিন। কখনো গ্রীষ্মের প্রচণ্ড রোদে আগুনের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। কখনো বর্ষার জলে ভিজতে হয়, কখনো প্রবল শীতে বাইরে রাত কাটাতে হয়। কখনো অসহ ক্ষুধার তাড়না নীরবে সহ্য করতে হয়। মোহন স্বামী অনায়াসেই উত্তীর্ণ হলেন এ পরীক্ষায়। তিনি জন্মসাধক। ত্যাগ আর তিতিক্ষা যেন তাঁর অস্থিমজ্জার সঙ্গে মিশে আছে।

তারপর শেষ পরীক্ষাটিও কম কঠিন নয়। এই পরীক্ষার সময় শিষ্যের সামান্যতম ত্রুটিবিচ্যুতি অনেক বড় করে দেখেন গুরুদেব। কঠোর ভ্রমসনাও তীক্ষ্ণ বাক্যবাণে জর্জরিত করে তোলেন তাকে। দেখে মনে হয় কোন মানুষ কখনো অথবা কোন মানুষকে এই ধরনের লঘুদোষে এতখানি শাস্তি দিতে পারে না। একবার উত্তর ভারতের পার্বত্য অঞ্চলে কোন এক তরুণ সাধক শীতের রাত্রিতে ধুনী জালিয়ে তার সামনে ধ্যান করছিল। তার গুরুদেব কুটরে বিশ্রাম কর-

ছিলেন। সাধকটি বয়সে তরুণ ; তার উপর নিদারুণ ক্লান্তি। তাই তার চোখে তন্দ্রা এসে গিয়েছিল এবং তার ফলে ধূনীর আগুন গেল নিবিয়ে। যখন তার হুঁস হলো তখন কোন উপায় নেই। এদিকে আগুন নিবে যাওয়ায় শীতে তার সারা শরীর হিম হয়ে যেতে লাগল। অবশেষে সমস্ত ভয় সংকোচ ত্যাগ করে কুটিরে গুরুদেবের কাছে সে আগুন চাইতে গেল। প্রথমে সে তার ভুলের জন্য মাফ চাইল গুরুর কাছে। কিন্তু গুরুদেব ভীষণভাবে রেগে গেলেন তার উপর। তারপর অনেকক্ষণ ধরে ভীষণভাবে ভৎসনা করার পর এক টুকরো আগুন কুটিরের ভিতর থেকে ছুড়ে দিলেন।

মোহন স্বামীকেও অনেক সময় লঘু দোষে গুরুদণ্ড পেতে হয়েছে গুরুদেবের কাছে। একদিন তিনি গুরুদেব বালানন্দ ব্রহ্মচারীর ধ্যান কুটিরের বারান্দা পরিষ্কার করছিলেন। বাঁট দেবার সময় হঠাৎ তাঁর হাতের বাঁটা হতে কয়েকগাছি কাঠি পড়ে যায়। তাঁর উচিত ছিল কাঠি কয়টি যত্ন করে কুড়িয়ে বাঁটাটি শক্ত করে বেঁধে নেয়া যাতে আর এমনি করে খুলে না যায়। কিন্তু তা না করে তিনি কাঠিগুলি ফেলে দিলেন। গুরুদেব তখন অদূরে বসে ভক্ত শিষ্যদের উপদেশ দান করছিলেন। তিনি মোহন স্বামীর এই কাজটি লক্ষ্য করে অত্যন্ত রেগে গেলেন। কাজটি নিতান্ত ছোট হলেও দুটি বড় রকমের ত্রুটি প্রত্যক্ষ করলেন গুরুদেব তার মধ্যে। প্রথমত ছোট বস্তুকে তুচ্ছ ভেবে অবহেলা করেছেন মোহন স্বামী এবং দ্বিতীয়তঃ কর্তব্যকর্মে উপযুক্ত নিষ্ঠা দেখাতে পারেননি। গুরুদেব তাই উপস্থিত সকলের সামনেই কঠোরভাবে তিরস্কার করতে লাগলেন। বললেন, তোম বোকা ছায়া, মুর্খ ছায়া, এয়ায়সা বোকাপনা মাং করনা।

এত তিরস্কারের কথা শুনেও চোখ মুখের উপর ভাবের কোন পরিবর্তন হলো না মোহন স্বামীর। অবিচলিত হয়ে তিনি আপন

হরির মহিমা প্রকট হয়ে উঠতে লাগল চারিদিকের জলে স্থলে অন্তরীক্ষে। শঙ্খঘণ্টাসম্বিত অসংখ্য সম্মিলিত কণ্ঠের হরিক্ষনি শুনতে লাগলেন নিজের কানে। পথের দুপাশের বৃক্ষপত্রে ও শস্যশীর্ষে দেখতে পেলেন শ্রীহরির ঘনশ্যাম অঙ্গশোভা। অমৃতের আশ্বাদ পেলেন যেন জিহ্বায়; সর্বত্র যেন মধু ঝরে পড়ছে আর সেই মধুর আশ্বাদ আপনা হতে তার জিহ্বায় এসে লাগছে। শ্রীহরির চন্দনবিভূষিত চরণপদ্মের গন্ধে আমোদিত হয়ে উঠছে বাতাস। এক অলৌকিক স্পর্শের দিব্যানুভূতি জাগছে সারা দেহে।

এইভাবে নামের মধ্য দিয়ে পঞ্চ-ইন্দ্রিয়ের আশ্বাদই পেয়ে গেলেন মোহন স্বামী। তবু মন তাঁর ভরল না। একদিন বা দু দিনের বেশী কোথাও রইলেন না। অবশ্য পরিব্রাজনরত সাধুদের কোথাও তিনদিনের বেশী থাকা নিষেধ।

এবারও ভিত্তিকায় উদ্ভীর্ণ হয়ে ফিরে এলেন মোহন স্বামী। তাঁকে দেখে গুরুদেবের আনন্দ আর ধরে না। এদিকে শুধু হাতে আসেন নি তিনি। গুরুদেবের আশ্রমের প্রত্যেকের জন্ত একটি করে ভাল মোয়েটার কিনে এনেছেন।

এসব কেনবার টাকা কোথায় কোথায় পেয়েছেন গুরুদেব তা জিজ্ঞাসা করায় মোহন স্বামী বললেন, একজন ধনী শেঠজী আমায় কিছু টাকা দিতে চান। আমি তখন তাঁকে ঐ টাকায় কিছু উপহারের জিনিস কিনে দিতে বলি। তারই ফলে এই সব জিনিস আনা সম্ভব হলো।

সবার জন্ত এনেছেন। কিন্তু নিজের জন্ত কোন শীতবস্ত্রই আনেন নি মোহন স্বামী।

একবার পৌষ মাসের শেষে বহু শিষ্য নিয়ে গঙ্গাসাগর মেলায় যান মোহন স্বামী। তিনি যখন যেখানেই যান দুইবেলা

কীর্তন ঠিকই নিয়মমত হয়ে থাকে। জাহাজ ক্রমশই ডায়মণ্ড হারবার ছাড়িয়ে যাচ্ছে। গঙ্গার বুকও ক্রমশ প্রশস্ত হয়ে সাগর সঙ্গমের জন্ত উদ্বেল হয়ে উঠছে। জাহাদের মাঝখানে কীর্তনের সভা বসল। স্বামীজী মাঝখানে বসলেন আর তাঁকে ঘিরে বসল দোহারের দল। মেয়েরাও সেই কীর্তনে যোগ দিল।

সঙ্গমের কাছটি পার হওয়া সত্যিই খুব বিপজ্জনক। উদ্বেলিত অজস্র বিশালকায় ঢেউ একের পর এক করে উঠছে আর ফেটে পড়ছে। স্বামীজী নিজে একবার সকলকে সাবধান করে দিলেন, একটি বড় রকমের তুফান আসছে।

ঢেউএর অবিরাম গর্জন আর জাহাজের আন্দোলনে যাত্রীরা সকলে ভীত হয়ে স্বামীজীর কাছে গিয়ে ভিড় করতে লাগল। দুই একটি বিরাট ঢেউ জাহাজের উপর উঠে এসে তার উপর দিকে বায়ে গেল। অনেকের কাপড় ভিজে গেল। তখনো জাহাজটি প্রবলভাবে ছলছে। স্বামীজী খুব জোরে হরিনাম করতে লাগলেন। অল্প সময়ের মধ্যেই সব বিপদ কেটে গেল।

দুই তিন-দিন গঙ্গাসাগরের উপর জাহাজে কাটানোর পর চরে নামলেন স্বামীজী। সকলে কপিলমুনির আশ্রম দর্শনের জন্ত ব্যগ্র। সংক্রান্তির দিন স্বামীজি বললেন, সত্যনারায়ণের পূজা হবে। নিরুপমা দেবীর উপর পূজার ভার দিলেন।

ষোড়শোপচারে ঠিকই পূজা হলো। কোথা হতে এত জিনিস যোগাড় হয়ে গেল কেউ তা ঠিক বুঝতে পারল না। পূজার পর থিঁচুড়ি ভোগ। প্রকাণ্ড পিতলের হাঁড়িতে থিঁচুড়ি রান্না করে ভোগ দেয়া হবে। তারপর সেই ভোগ সকলে প্রসাদ পাবে। কিন্তু সেই প্রকাণ্ড থিঁচুড়ির হাঁড়ি উনোন থেকে দুই তিনজন মিলেও নামাতে পারছে না। স্বামীজি তা দেখে তাড়াতাড়ি গিয়ে অনায়াসেই নামিয়ে দিলেন। তাঁর অস্থিচর্মসার দেহের এই শক্তি দেখে বিস্ময়ে অবাক হয়ে গেল সকলে। একমাত্র শক্তিমান সাধকেরাই

কুস্তক যোগের বলে বায়ুনিরোধ করে অণিমারূপ বিভূতি লাভ করেন । শরীরটিকে হালকা করে তা দিয়ে যা ইচ্ছা করতে পারেন ।

গঙ্গাসাগরের অত্যাশ্রয় যাত্রীরাও প্রসাদ পাবার জন্য ছুটে আসতে লাগল । হিন্দুস্থানী যাত্রীরা স্বামীজীর দিকে পয়সা ছুড়ে দিয়ে বলতে লাগল, উনি মানুষ নন, কপিল মুনির বেটা । স্বর্গ হতে মর্তে নেমে এসেছেন । অবশেষে জোয়ার আসতে সকলে জাহাজে উঠে গেল ।

সংগীতই সাধনার একমাত্র পদ্ধতি মোহন স্বামীর । যোগ নয়, যজ্ঞ নয়, কেবলমাত্র গান আর গান । অপূর্ব কাব্যমৌল্যমণ্ডিত সে গানের বাণী । মনোহর সুললিত তার সুর । অনবদ্য তার ভাব । সে গান একবার কোন রকমে কারো কানের ভিতর গেলেই মর্গকে তা স্পর্শ করে । ভক্তিরসে বাণ ডেকে যায় অন্তরে ।

গানের ভাব ও ভাষা কি রকম হওয়া উচিত তার প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে একটি কবিতায় সুস্পষ্ট মন্তব্য করেছেন মোহন স্বামী ।

ভাব যেখানে গভীর সেথায় ভাষায় থাকে প্রাণ

প্রেম সেতুতে বাঁধা আছে দুটির ব্যবধান ॥

অরূপ যিনি লুকিয়ে থাকেন আপন গুঞ্জে

ভাবুক তাঁরে বাইরে আনেন ভাবের লিখনে ॥

যাত্রা পথে জীবন মরণ যমজ দুটি তায়

অসীম হতে জন্ম লভি অসীম পানে ধায় ॥

কাব্যতত্ত্ব ও জীবনতত্ত্বের এমন গভীর উপলব্ধি এবং সেই উপলব্ধির এমন স্বচ্ছ সুন্দর প্রকাশ খুব কমই দেখা যায় । কবিত্বশক্তি মোহন স্বামীর যেন একটি সহজাত বৃত্তি । অফুরন্ত কাব্যভাবে পরিপূর্ণ তাঁর অন্তর । সেই ভাবের প্লাবনে যখন-তখন অন্তর তাঁর ভেসে যায় আর আপনা হতে অজস্র সুললিত শব্দ ছুটে আসে তাঁর মনের চারিপাশে । শুধু সামান্য একটু প্রেরণা হলেই হলো ।

শুধু হরিনামের পদ নয়, যে কোন দেবদেবীর পদ রচনাতেই সিদ্ধহস্ত মোহন স্বামী । সপ্তমী পূজোর দিন দুর্গা প্রতিমা দেখে যিনি দুর্গাদেবী

স্মৃতিবিষয়ক পদ রচনা করেন, তিনিই আবার গঙ্গাসাগর যাবার পথে ভক্তিভাবে উদ্বেল হয়ে গঙ্গাদেবীর গুণগান রচনা করে সঙ্গে সঙ্গে গান গেয়ে ওঠেন। গঙ্গাদেবীর পদটি অধিকতর কবিত্ব-সুলভ ভাবানুভূতিতে ভরা। অগণিত মনিরঞ্জিত নীল নভোমণ্ডলের নীচে শ্রামবর্ণা ধরণীর বুকের উপর দিয়ে চন্দ্রকিরণে উদ্ভাসিত হয়ে গঙ্গা পুলকিতভাবে বয়ে চলেছে। তাই দেখে মোহনস্বামীর অন্তরে জেগে উঠেছে ভক্তিভাবের সঙ্গে কবিত্বভাব। শুধু সাধকরূপে নয়, কবিরূপেও প্রত্যক্ষ করেছেন চন্দ্রালোকিত গঙ্গার শোভা।

ধায় মত্ত হরষে সাগর পদ পরশে

কূলে কূলে করি পরিবেশন মঙ্গলময় বরষা।

ফিরে দিশি দিশি মলয় মন্দ কুসুম গন্ধ বাহিয়া

আর্য গরিমা কীর্তি কাহিনী মুগ্ধ জগতে কহিয়া।

একদিন ধ্যান কুটিরের বারান্দায় গুরুদেব বালানন্দ স্বামী বসে ছু একজন শিষ্যের সঙ্গে কথা বলছেন। মোহন স্বামী সংকোচের সঙ্গে কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন। এমন সময় গুরুদেব হাসতে হাসতে বলে উঠলেন, হামারা মোহন ত আর বালক নেহি হায়, ওতো বড়া হোয় গয়া ; আভি উনকা মোচ বাহার হয়।

উপস্থিত শিষ্যদের কেউ এই রসিকতার কারণ বুঝতে পারল না ! কিন্তু মোহন স্বামী তা পারলেন। মোহন স্বামী স্পষ্ট বুঝতে পারলেন তাঁর গুরুদেবের এ কথার অর্থ। বয়স হয়েছে। বেশ কিছু দিন আগে হতেই দেহটি অপটু হয়ে পড়েছে গুরুদেবের। এবার কৈলাস গমনের দিন প্রায় সমাগত। তাই তাঁর প্রিয় বিশ্বস্ত শিষ্য মোহনের উপর এই আশ্রমের গুরুভার গ্রস্ত করে নিশ্চিত হয়ে যেতে চান। মোহন স্বামী এতদিন ছেলেমানুষ ছিলেন ; তাই এ ভার এতদিন চাপিয়ে দিতে পারেননি তাঁর উপর। এবার তিনি বড় হওয়ায় গুরুদেব খুশি।

মোহন স্বামী আশ্রমের এতবড় গুরুভার নিতে চাননি। কিন্তু

উপায় নেই। গুরুদেবের ইচ্ছা পূরণ করতেই হবে। গুরুদেবের প্রতি ভক্তি তাঁর অপরিসীম। তাঁর একান্ত বিশ্বাস, সাধন-পথে আজ যতটুকু অগ্রসর হয়েছেন সে শুধু গুরুর কৃপায়। একটি স্ব-রচিত পদে গুরুর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন মোহন স্বামী।

তমোরাশি নাশি জ্ঞানের আলোকে যে করেছে পরকাশ।

যে হরেছে মোর আকুল পিয়াসা বাসনারে করি নাশ ॥

যাঁহার কৃপায় আরাধ্য আমার পাইয়াছি আজ আমি।

সে মোর আনন্দ সে মোর দেবতা মোহন হৃদয় স্বামী ॥

যাঁহার চরণ সরোজ পরশে লভিয়াছি মহা প্রাণ।

সে যে কল্পতরু বালানন্দ গুরু সেই মোর ভগবান ॥

মোহন স্বামীর গুরুভক্তি শুধু অপরিসীম নয়, অতুলনীয়। সিদ্ধিলাভের পরম ক্ষণটিকে তিনি গুরুপ্রশস্তির দ্বারা এমনি করে চিহ্নিত করে রেখেছেন। যে গুরু তাঁকে সংসারের অষ্টপাশ থেকে মুক্ত করে সব বাসনাকে নাশ করে অবিচার অন্ধকার দূর করে জ্ঞানের আলোকের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করেছেন তাঁর আত্মাকে, যাঁর কৃপায় তিনি তাঁর আরাধ্যকে লাভ করেছেন, যাঁর চরণপদ্ম স্পর্শ করার সঙ্গে সঙ্গে এক মহাজীবন লাভ করেছেন সেই কল্পতরুসদৃশ গুরুদেব বালানন্দ স্বামী তাঁর কাছে পরম দেবতা।

ভক্তি আর প্রেমই হচ্ছে মোহন স্বামীর সাধনার মূলমন্ত্র। ভক্তি ত প্রেমেরই এক প্রকার রূপ। ভালবাসার সঙ্গে কিছু শ্রদ্ধা মিশিয়ে দিলেই তা হয়ে উঠবে ভক্তি। মোহন স্বামীর আরাধ্য দেবতা হরিকে তিনি ভালবাসেন আবার ভক্তিও করেন। যিনি উপনিষদের ব্রহ্ম, যিনি পরম পিতা, যিনি এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি বিকাশ ও লয়ের কারণ, তিনিই আবার মোহন স্বামীর সখা। অখিলরসামৃত ব্রহ্মস্বরূপ মোহনরূপে ধরা দিয়েছেন তাঁকে।

তাঁর হরিকে তিনি যে আজ চিনতে পেরেছেন, ভগবানের প্রকৃত স্বরূপটি যে বুঝতে পেরেছেন, তার একমাত্র কারণ, তাঁর গুরুদেব তাঁকে

দান করেছেন এক তৃতীয় চক্ষু। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে ঈশ্বর দর্শন সম্বন্ধে বলেছেন :

ন তু মাং শক্যসে জষ্টুমেনৈব স্বচক্ষুষা ।

দিব্যাং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্যতে যোগমৈশ্বরম্ ॥

হে অর্জুন, তুমি তোমার এই চক্ষু দ্বারা আমায় দেখতে সমর্থ হবে না। এজন্য আমি তোমায় এক দিব্য জ্ঞানাত্মক চক্ষু দেব যার দ্বারা তুমি আমার অনন্ত যোগবিভূতি দেখতে পারবে।

মোহন স্বামীকে সেই দিব্য জ্ঞানাত্মক চক্ষু দান করেছেন তাঁর গুরুদেব।

ঈশ্বর সবার মধ্যে সব জায়গায় আছেন। মোহন স্বামী বলেছেন, ‘তুমি সবার হয়ে আপনার, সে কথা বুঝিতে বাকি নাহি আর।’ ঈশ্বরের এই সর্বব্যাপকতা তাঁর অচ্যুতম বিভূতি। মোহন স্বামী তাঁর দিব্য চক্ষুর দ্বারা ঈশ্বরের এই বিভূতি দেখতে পেয়েছেন বলেই ঈশ্বরের প্রতি তাঁর সখ্যভাবটিকে আরোপিত ও প্রসারিত করে দেন সর্বভূতে ও সর্বজীবের উপর। মোহন স্বামী বিশ্বের সকলকেই সবার মত ভালবাসেন। সকলেই তাঁর বন্ধু। জীবপ্রেম ও ঈশ্বরপ্রেম একাত্ম হয়ে উঠেছে তাঁর কর্ম ও ভাবজীবনে।

কিন্তু হৃৎকের বিষয় তবু তাঁর নিন্দুষ্কের অভাব নেই।

মোহন স্বামীর হরিসভায় শুধু মুমুকু বয়স্ক ব্যক্তিরাই আসেন না। অনেক অল্পবয়স্ক তরুণ তরুণী আসেন। হরিসভায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে যোগদান করে; স্বামীজীর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে। যুবতী মেয়েদের দলে দলে আসা নিয়ে অনেক নিন্দুক লোক মনে করতে থাকে মোহন স্বামী স্ত্রী, তাই তাঁর রূপে মুগ্ধ হয়েই মেয়েরা যাতায়াত করে।

একদিন কয়েকজন প্রবীন ভক্ত এই সব কথা শুনে স্বামীজীকে বললেন, বাবা, যত সব অল্পবয়স্ক মেয়েরা এসে আপনার চরণ স্পর্শ করে। এতে আমরা ব্যথা পাই।

স্বামীজী আশ্চর্য হয়ে বললেন, আপনাদের ব্যথা পাবার কারণ কী ?

ভক্তগণ তখন বললেন, কারণ আমাদের মনে হয়, এই সব মেয়েদের চিত্ত শুদ্ধ হয় নাই। অশুদ্ধ চিত্তেই তারা আপনাকে স্পর্শ করে।

স্বামীজী তখন জোরের সঙ্গে বললেন, আমার বিশ্বাস, কোন মেয়ে কুমতি নিয়ে আমার চরণ স্পর্শ করতে পারে না।

ভক্তগণ বললেন, তাহলেও যখন-তখন আপনাকে স্পর্শ করা ভাল নয়। আপনি ওদের নিষেধ করে দেবেন।

স্বামীজী তখন ব্যথিত হয়ে বললেন, আহা, আমি ওদের না দেখলে কে ওদের দেখবে ?

ভক্তগণ বললেন, এর জন্ত আপনাকে লোকে নিন্দা করে।

স্বামীজী বললেন, আমার নিন্দা হয় হোক, কিন্তু তাতে মেয়ে-গুলির ত কল্যাণ হবে।

স্বামীজীর এই উদারতা ও দয়া দেখে ভক্তগণ আশ্চর্য হয়ে গেলেন। তাঁরা বুঝতে পারলেন, সাধুসঙ্গে ও হরিনাম শ্রবণে যথার্থই আত্মার কল্যাণ হয়। চিত্ত আপনা থেকেই শুদ্ধ হয়। যদি কোন নরনারী কুভাব কুমতি নিয়ে সাধুসকাশে আসে তাহলে সাধকের পুণ্য অঙ্গ স্পর্শ করার সঙ্গে সঙ্গেই সেই কুভাব বা কুমতি মুহূর্তে অন্তর্হিত হয়ে যায়।

মোহনানন্দ স্বামীর সাধক জীবনের আর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো, কর্মেন্দ্রিয় ও অন্তরেন্দ্রিয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য সাধন করে চলা। সাধন ভজনের সঙ্গে সঙ্গে সব সময় কাজ করে যেতে হবে হরিপদে মতি রেখে।

সারাদিন শুধু কাজ আর কাজ। মুখে হরিনাম মনে সৎ চিন্তা আর হাতে কাজ। প্রথমে রাত চারটায় উঠে নিজের হাতে ঘর ছুয়ার ঝাট দিয়ে পুজোর বাসন মেজে আশ্রমের পুকুরে স্নান করেন। তারপর

সকাল সাতটা পর্যন্ত জপ, তপ, গীতা চণ্ডী প্রভৃতি পাঠ করেন। সাতটা থেকে নটা পর্যন্ত বালেশ্বরী দেবীর মন্দিরে শিবপূজা, নারায়ণ শীলা পূজা, গুরুদেবের প্রতিমূর্তির পূজা প্রভৃতি কাজগুলি করেন। নটা হতে দশটা পর্যন্ত সমবেত ভক্ত শিষ্যদের প্রণাম নিয়ে থাকেন। তারপর কুকারে নিজের হাতে রান্না চাপিয়ে দিয়ে ভক্তগণ দ্বারা আয়োজিত কীর্তনে যোগ দেন।

কীর্তন শেষ হতে বেলা বারোটা বেজে যায়। কীর্তন শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে বাহুজ্ঞান হারিয়ে ফেলেন স্বামীজী। বাহু-চৈতন্যহীন নিথর নিম্পন্দ দেহটি শায়িত অবস্থায় থাকে এবং সেই দেহ থেকে প্রসারিত পাদপদ্মটিকে কোনরূপে একবার স্পর্শ করবার জন্তু ব্যাকুল হয়ে ওঠে অজস্র ভক্তের দল। স্বামীজীর কিন্তু কোন খেয়ালই থাকে না কে তাঁর চরণ স্পর্শ করল বা না করল। এইভাবে কিছুক্ষণ থাকার পর বাহুজ্ঞান ফিরে পাবার সঙ্গে সঙ্গে নিজের ঘরে চলে যান স্বামীজী। তারপর কুকারে সিদ্ধ শাকসজ্জির যুস ও তার সঙ্গে কিছু ভাত আহার করেন। আহার শেষ হলে নিজের হাতেই থালা বাটিগুলি ও ছুটি বড় জলের ঘড়া বেশ চকচকে করে মাজেন। বাসন মাজবার সময় তাঁর হীরের আংটি-গুলি ঘষা খেয়ে মুহু আওয়াজ তোলে। অনেকে মনে করেন রেশম কাপড় আর হীরের আংটি পরে বাসন মাজা মোহন স্বামীর কষ্ট-বিলাস ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু তাঁদের বোঝা উচিত, এ বিষয়ে ভারতের সাধক জীবনের ইতিহাসে এক নূতন আদর্শ ও উজ্জল বৈশিষ্ট্য স্থাপন করিছেন মোহন স্বামী। সাধারণতঃ দেখা যায়, সাধক জীবনে প্রবেশ করার পর থেকে সিদ্ধিলাভের আগে পর্যন্ত সব সাধকই কঠোর তিতিক্ষা সাধন করে চলেন। কিন্তু সিদ্ধিলাভ ও দীক্ষাগুরুরূপে অবতীর্ণ হবার পর থেকে তাঁরা সে তিতিক্ষা ভুলে যান; তাঁদের প্রাত্যহিক জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই শিষ্যদের কাছ থেকে সেবা গ্রহণ করেন

তারা। ফলে কোন কাজই নিজের হাতে করতে হয় না তাঁদের।

কিন্তু মোহনস্বামী এসব পছন্দ করেন না। তাঁর মতে সাধকদের জীবনে তিতিক্ষার শেষ নেই। জীবন, জীবিকা, আহার, বিহার সকল ক্ষেত্রেই স্বাবলম্বনই তাঁদের ধর্ম। তাই নিজের জীবন ধারণের জন্ত প্রয়োজনীয় যাবতীয় কাজ তিনি নিজের হাতেই সব করতে ভালবাসেন। তাছাড়া জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্ত সব মানুষকেই যতদিন বাঁচতে হবে তার কর্মেন্দ্রিয়গুলিকে অবশ্যই কাজে লাগাতে হবে। গীতায় কর্মযোগে শ্রীভগবান অর্জুনকে বলেছেন,

যস্তিহ্রিয়ানি মনসা নিয়ম্যারভতেহর্জুন।

কর্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্মযোগমসক্ত স বিশিয্যতে ॥

নিয়তং কুরু কর্ম ত্বং কর্ম জ্যাযো হ্যকর্মণঃ।

শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিধ্যদকর্মণঃ ॥

হে অর্জুন! যিনি মানসিক শক্তির বলে ইন্দ্রিয়গুলিকে বশে রেখে কোন বিষয়ে আসক্ত না হয়ে শুধু কর্মেন্দ্রিয়গুলি দ্বারা কাজ করে যান, তিনিই শ্রেষ্ঠ। তুমি সর্বদাই কর্ম করে চল, কারণ কর্ম না করা অপেক্ষা কর্ম করা খুব ভাল। কর্ম না করলে তোমার জীবনযাত্রাও চলবে না।

পিতলের ঘড়া দুটি মাজার পর ছই ঘড়া জল নিয়ে আসেন। একটি ঘড়া কাঁধে ও আর একটি হাতে বুলিয়ে। কঙ্কালসার ক্ষীণ দেহে এত শক্তি কোথায় পান স্বামীজি, তা কেউ বলতে পারে না। এই সব কাজ ভক্তদের চোখের সামনে করলে তারা ব্যথা পাবে ভেবে সকলের অলক্ষ্যে অগোচরেই কাজগুলি তিনি সেরে ফেলেন। ইঠাৎ যদি কোন ভক্ত প্রণাম জানাতে এসে পড়েন ত তিনি দেখতে পান।

জল তোলা হয়ে গেলে মোহন স্বামী চলে যান আশ্রমের অফিস ঘরে। আশ্রমের ম্যানেজার ও সেক্রেটারী হিসেবে

কাগজ-পত্র দেখাবার জন্ত আগে হতেই তৈরি হয়ে আছেন। এই সময় বেলা ছোটো থেকে চারটে পর্যন্ত আশ্রমের বৈষয়িক কাজকর্ম সারতে হয় মোহন স্বামীকে। খরচের যত সব খাতাপত্র বুঝে নিয়ে সই করে দিতে হয়। তারপর শুরু হয় ভক্তগণের চিঠি পড়া ও তার উত্তর দানের ব্যবস্থা করা।

কত সব টাকা-পয়সার হিসেব। কত পার্থিব বস্তুর দর কষাকষি। এই সব কাজগুলিই বৈষয়িক ও রাজস্বিক। কিন্তু এ সব কাজ করেও রজ গুণের কোন রঙ ধরে না তাঁর অন্তরের আকাশে; বিষয়-বাসনার কোন ঢেউ জাগে না তাঁর প্রশান্ত হৃদয় সমুদ্রে। কোন পার্থিব ভাববিকার ফুটে ওঠে না মুখে। ভূমার ব্যঞ্জনাটি সদাসর্বদাই লেগে থাকে তাঁর শ্রীমুখে।

শেষ বিকেলে আবার কিছু দূরের ভক্ত আসে দর্শনের আশায়। কাউকেই বিমুখ করা চলবে না। সকলের জন্তই তাঁর প্রাণ কাঁদে। এর পর স্বামীজি চলে যান আশ্রমের নর্মদা পুকুরের পাড়ে। পুকুরটিকে পাঁচ থেকে সাতবার প্রদক্ষিণ করার পর পুকুরঘাটে চৌকিতে বসে সন্ধ্যাবন্দনা সেরে নেন।

আসন্ন সন্ধ্যার এই শোভাটি বড় চমৎকার। পৃথিবীর সব রঙ সব চঞ্চলতাকে স্তব্ধ করে দিয়ে অন্ধকার নেমে আসছে আকাশে বাতাসে। কিন্তু সন্ধ্যা পৃথিবীর এই প্রশান্ত সৌন্দর্য দেখবার সময় নেই মোহন স্বামীর। তা'না থাক। অন্তরে যাঁর অফুরন্ত সৌন্দর্য ও আনন্দের প্রস্রবণ খেলে যাচ্ছে অবিরাম, আলো অন্ধকার, প্রদোষ প্রত্যুষ যাঁর কাছে সমান, শ্রীহরির পরমসত্তার আশ্চর্য বিকাশ দেখতে পান যিনি সব কিছুর মধ্যে, বাইরের জগতের কোন শোভা না দেখলেও তাঁর কিছু আসে যায় না।

সন্ধ্যাবন্দনা সেরে যুগল মন্দিরে গিয়ে শ্রীকৃষ্ণের গোপাল মূর্তি ও গুরুদেব বালানন্দ মহারাজের শ্বেত পাথরের মূর্তিটিকে প্রণাম করেন।

আরতি সেরে স্বামীজি চলে যান বালেশ্বরী দেবীর মন্দিরে। সেখানে বালেশ্বরী দেবী ও রামেশ্বর শিবকে প্রণাম করে যান সন্তোষ আশ্রমে। যেখানে তাঁর সংসার আশ্রমের মামা প্রাণগোপাল মুখোপাধ্যায়ের কাছে এক ঘণ্টা বেদপাঠ করেন।

প্রাণগোপালবাবু গৃহী হয়েও পরম ধার্মিক। সকল ধর্মশাস্ত্র তাঁর কণ্ঠস্থ। সংসার-আশ্রমে থেকে ধর্মের সার তত্ত্বগুলিকে পরম শ্রদ্ধা ও যত্নের সঙ্গে মেনে চলেন। প্রতিদিন একবার করে তাঁর সঙ্গে ধর্ম আলোচনা না করলে তৃপ্ত হয় না মোহন স্বামীর মন। মনে হয়, সব কাজ সেরেও কি একটা কাজ যেন করা হলো না। একই সঙ্গে ভক্তি ও জ্ঞানের সাধনায় সিদ্ধ হয়েও স্বামীজির জ্ঞানের কোন অভিমান বা অহংকার নেই। ধর্মশাস্ত্রের প্রতি কৌতূহল তাঁর আজও অন্তহীন। এমন কি ইংরাজি ভাষা ও সাহিত্যে তিনি যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছেন।

সন্তোষ আশ্রম হতে ধর্ম আলোচনা করে আসার পর হরিমণ্ডপে কীর্তনে যোগ দেন মোহন স্বামী। তারপর গভীর রাত্রি পর্যন্ত চলে এই হরিনাম সংকীর্তন। এই সময় আলো নিবিয়ে দেওয়া হয়। দিব্যোন্মাদ অবস্থায় নৃত্য করতে থাকেন মোহনানন্দ। নিঝুম নিস্তব্ধ রাত্রির এই শান্ত নিবিড় অবকাশে যেমন প্রাণখুলে কীর্তন করেন স্বামীজি, এমন আর কখনো যেন পারেন না, কীর্তনের এমন আনন্দ আর কখনো তিনি পান না।

এই সময় কীর্তন করতে করতে তাঁর মনে হয় তাঁর সহস্র অন্তরটি হয়ে উঠেছে এক অদ্ভুত বৃন্দাবন। গুট গহন সেই অন্তর প্রদেশের নিভৃত প্রাণকুঞ্জে তাঁর জীবাত্মা স্বরূপিনী রাধার সঙ্গে এসে মিলিত হয়েছেন পরমাত্মারূপী শ্রীকৃষ্ণ। রাধাকৃষ্ণের এই অলৌকিক প্রেমলীলা প্রত্যক্ষ করবার জন্য এক-একটি ব্রজবৃক্ষের রূপ ধরে সজাগ ও সতৃষ্ণ হয়ে উঠেছে তাঁর দেহের প্রতিটি লোম ও মাথার প্রতিটি কেশপাশ। দেহের প্রতিটি অণুপরমাণু হয়ে উঠেছে

রাধাকৃষ্ণের শ্রীচরণলাঞ্ছিত ব্রজধূলি। শিরা-উপশিরার মধ্যে প্রবাহিত রক্তশ্রোতকে মনে হয় পুণ্যযমুনার জল।

যে হরিনামের গুণে শুষ্ক মৃত তরু মঞ্জরিত হয়ে ওঠে, সেই হরিনামের গুণেই অন্ধকার আলো হয়ে ওঠে। রাত্রিতে যতক্ষণ কীর্তন চলতে থাকে ততক্ষণই মোহনস্বামীর মনে হয়, এত আলো কখনো তিনি দেখেন নি। এমন আলো কোন সূর্য বা চন্দ্র দান করতে পারে না। কোন পার্থিব আলো কখনো মানুষের অন্তরে প্রবেশ করতে পারে না। সব আলোই কেবল মানুষের দেহটিকে করে আলোকিত। কিন্তু এই দিব্য আলোর পরমাশ্চর্য দ্ব্যতিতে সমস্ত প্রাণমন উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে মোহন স্বামীর।

রাত্রি বারোটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে যখন ঢং ঢং শব্দে বড় ঘণ্টা বাজে এবং তার সঙ্গে যখন আলো জ্বলে ওঠে তখন বড় খারাপ লাগে স্বামীজির। মনে হয় সব অন্ধকার। সব মিথ্যা অসার। সেই চির আনন্দময় ব্রজভূমি থেকে কে যেন জোর করে তাঁকে টেনে এনেছে এই প্রাকৃত জগতে।

এর পর শয়ন ও বিশ্রাম। আবার রাত্রি চারটের সময় অর্থাৎ ব্রাহ্মগৃহুর্থে উঠে পড়েন।

হরিনামই পরম যোগ-সাধনা। তাই আলাদা করে যোগসাধনা করতে হয় না মোহনানন্দকে। হরিনামের সঙ্গে সঙ্গেই নামীর সঙ্গে নামকারী এক হয়ে যান। নামীর ঐশী শক্তির আশ্চর্য বিভূতি আপনা হতেই সঞ্চারিত হয় নামকারীর মধ্যে। কিন্তু সেই আশ্চর্য বিভূতির অধিকারী হয়েও সে বিভূতির বিকাশ কখনো দেখাতে চান না মোহন স্বামী।

সব সাধকেরই প্রাত্যহিক জীবনে বহু অলৌকিক যোগ-বিভূতির বিকাশ ঘটে থাকে। কিন্তু কোন অলৌকিক যোগ-বিভূতির বিকাশ কখনো দেখা যায় না মোহন স্বামীর দৈনন্দিন

জীবনে। তাঁকে দেখে মনে হবে তিনি যেন কিছু জানেন না। তিনি একজন আমাদের মত সাধারণ মানুষ। বিনয়ে মধু ঝরে পড়ে শুধু তাঁর ভক্তিময় চিত্ত হতে।

তবে নিজে কিছু দেখাতে না চাইলেও কখনো কখনো দু-একটি ঘটনায় লোক-চক্ষে প্রকাশিত হয়ে পড়ে স্বামীজির অলৌকিক মহত্ত্ব। আশ্রমে অনুষ্ঠিত যে কোন মহোৎসবের সময় যখন বহু লোক একসঙ্গে খেতে বসে তখন তাদের নিজের হাতে পরিবেশন করে আনন্দ পায় স্বামীজি। বহুবার দেখা গেছে, জিনিসপত্র কম থাকা সত্ত্বেও স্বামীজির কুপায় শেষ পর্যন্ত কোন জিনিসই কম পড়ল না। তৃপ্তির সঙ্গে অসংখ্য লোক খাওয়ার পরও অনেক জিনিস বাড়ল। আরও দেখা গেছে, বহু লোক সাধ্যের অতিরিক্ত খেয়েও কখনো কোন অসুখের কবলে পড়েনি।

স্বামীজির অলৌকিক শক্তির বিকাশ দেখা গেছে আরও একটি ঘটনায়। প্রতি বছর ফাল্গুন মাসে বৈদিক প্রথামত যজ্ঞ হয় আশ্রমে। কোন বার রুদ্র যজ্ঞ, কখনো লক্ষ্মী যজ্ঞ, কখনো বিষ্ণু যজ্ঞ। কাশী হতে বড় বড় নামকরা ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আসেন। বেদমন্ত্রের সম্মিলিত কণ্ঠ ধ্বনিতে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে থাকে আশ্রমের আকাশ বাতাস।

যজ্ঞকুণ্ডে আগুন জ্বালানোর কাজটি বড় কঠিন এবং অদ্ভুত। প্রাচীন বৈদিক যুগের প্রথামত এখনও যজ্ঞের আগুন কাঠে কাঠে ঘষে জ্বালতে হবে। দিয়াশলাই দিয়ে বা কোন তৈরি আগুনের সহযোগে জ্বালানো চলবে না। প্রথমে কাশীর পণ্ডিতরা কাঠে কাঠে ঘষতে থাকেন। তাতে যদি না জ্বলে, তাহলে আশ্রমের শক্তিশালী ব্রাহ্মণরা এসে আরও জোরে ঘর্ষণ শুরু করেন। অনেক সময় তাতেও আগুন জ্বলে না। কিন্তু আশ্চর্য! মোহন স্বামী এসে কাঠগুলি একবার স্পর্শ করে একটু চেঁচা করতেই আগুন জ্বলে ওঠে। তারপর স্বামীজিকে মধ্যস্থলে রেখে কমপক্ষে পঁচিশ জন ব্রাহ্মণ বেদকণ্ঠে অগ্নিকে আবাহন করেন।

এই সময় পনের দিন ধরে আশ্রমে অহরহ হরিনাম সংকীর্তন হয়।

হাতে কাজ যাই থাক মুখে তো হরিনাম লেগেই আছে। মনে হরিচিন্তার ত বিরাম নেই। অন্তরে সর্বক্ষণই তো বিরাজ করছেন শ্রীহরি। তবু কেন তৃপ্ত হয় না মোহন স্বামীর মন। কৃষ্ণবিরহের জ্বালায় অনুক্ষণ জ্বলতে থাকে কেন তাঁর দেহ মন।

চিরচঞ্চল বাতাসের মত ধাবমান জলপ্রবাহের মত মোহন স্বামীর মন এক পরম সত্যের সন্ধানে নিয়ত ছুটে চলেছে অসীমের পানে। সে চলার বিরাম নেই, ক্লান্তি নেই। তিনি জানেন কৃষ্ণই এই পরম সত্য। কিন্তু শুধু জানলেই হবে না। তাঁকে পেতে হবে। ক্ষণিকের জ্ঞান পাওয়া নয়, একেবারে চিরদিনের জ্ঞান পাওয়া।

তবে কি ডাকার মধ্যে কোন ভুল আছে? সংশয় জাগে মনে। তা না হলে কেন তিনি দেখা দিয়ে চলে যান। অন্তরে প্রচ্ছন্ন থেকে বাইরে কেন তিনি প্রকটিত হন না মোহন বেশে।

এক-এক সময় তাই মোহন স্বামীর মনে হয় তিনি আর গান গাইবেন না। কীর্তন গানের জ্ঞান কোন পদ রচনাও করবেন না। এবার আর গান দিয়ে নয়, প্রাণ দিয়ে ডাকবেন তাঁর হরিকে। তাই তিনি বলেছেন :

পরানে তোমারে ডাকি নি হে হরি, ডেকেছি শুধুই গানে।

তাইতে তোমারে পাই নি জীবনে, ফিরেছি শূন্য প্রাণে ॥

তুমি চাহ প্রাণ নাহি চাহ ভাষা চাহ দীন বেশ নাহি চাহ ভাষা।

আমি গাহিবি সে গান তুমি যাহা শোন, আর কেহ নাহি শোনে ॥

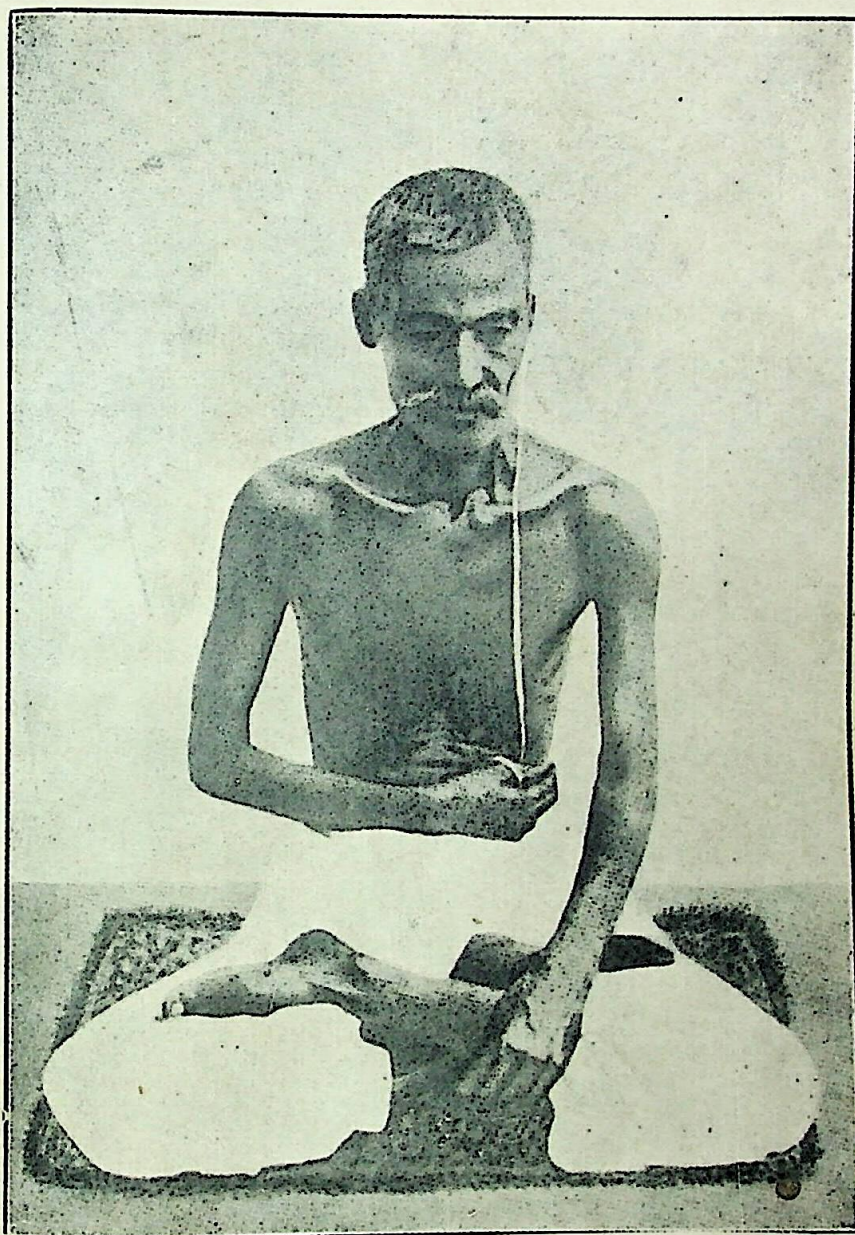
এইভাবে একজন পরম ভক্তকবি তাঁর অন্তরের সমস্ত ভাষাগত উপচার নিঃশেষে উজাড় করে দিয়ে এবার নীরব হতে চেয়েছেন চিরতরে। এবার এক ভাষাহীন নীরবতার মধ্যে সমস্ত প্রাণমনকে সংহত ও সংবদ্ধ করে পরিপূর্ণ হরিনামের জ্ঞান আকুল হয়ে উঠেছেন তিনি।

দেবমানব মহাত্মা গুরুনাথ

আজ থেকে একশো কুড়ি বছর আগে বঙ্গাব্দ ১২৫৪ সনের ২২ শে অগ্রহায়ণ মঙ্গলবার অমাবস্তা তিথিতে যশোহর জেলার বেন্দানিবাসী সাধু রামনাথের ঘরে একটি শিশু ভূমিষ্ঠ হলো। কোন ঘরে ছেলে হলেই গাঁয়ের মেয়েরা দেখতে আসে। কিন্তু সেদিন একটি আশ্চর্য ব্যাপার ঘটল। একজন অতিবৃদ্ধা প্রতিবেশিনী ভিড় থেকে স্মৃতিকা গৃহের দিকে এগিয়ে গিয়ে নবজাত শিশুটিকে একবার ভাল করে দেখে নিয়েই প্রস্মৃতিকে বললেন, ওগো এই ছেলেটির নাম তোমরা গুরুনাথ রেখো।

ছেলে হতে-না-হতেই নাম রাখা না সবাই। বৃদ্ধার একথার অর্থ অনেকে বুঝতে পারল না। অনেকে ঝোঁতুক বোধ করল। সাধু রামনাথ এবং তাঁর স্ত্রী সাধ্বী মহিলা গৌরীদেবী একথার অর্থ ঠিক বুঝতে না পারলেও কথাটাকে অগ্রাহ্য করতেও পারলেন না। বৃদ্ধার কথামত ছেলের নাম তাঁরা গুরুনাথই রাখলেন। সাধারণতঃ দেখা যায়, নামের অর্থের সঙ্গে নামীর জীবনের কোন মিল থাকে না। খুব কম লোকই গুণের অনুশীলনের দ্বারা তার নামটিকে সার্থক করে তুলতে পারে। সেদিন কিন্তু কেউ ভাবতে পারেন নি একদিন সত্যধর্ম প্রবর্তক ও একজন পরম দীক্ষাগুরুরূপে তাঁর নামটিকে এক অপূর্ব সার্থকতায় মণ্ডিত করে তুলবেন গুরুনাথ।

যশোহর শহর থেকে প্রায় তিরিশ মাইল দূরে বেন্দা নামক একটি ছোট্ট গাঁয়ে সিদ্ধপুরুষ রামনাথ সেন উনিশ শতকের প্রথম পাদ হতেই বাস করে আসছেন। ধর্মপ্রাণ এই গৃহীতপন্থী তাঁর চির আরাধ্যা ঈষ্টদেবী মা ভগবতীর দর্শন লাভ করেন বলে



দেব মানব মহাত্মা গুরুনাথ

অনিল ব্রহ্ম

লোকে তাঁকে সাধু রামনাথ বলত। তাঁর সুন্দর গলদেশে রুদ্রাক্ষের মালা সব সময় শোভা পেত। তেজস্বী সরল স্বভাব সর্বত্র সমভাবযুক্ত, সকলে সমদর্শী, সংসারী হয়েও উদাসীন এই গৃহী-তপস্বীর প্রতি গাঁয়ের সকলেরই শ্রদ্ধা ছিল অপরিসীম। তা ছাড়া আয়ুর্বেদশাস্ত্রে তাঁর পারদর্শিতা ছিল অসামান্য এবং চিকিৎসা নৈপুণ্যে তিনি ছিলেন ধ্বংসরীকল্প। তাঁর যা হাতযশ ছিল তাতে তিনি বহু টাকা রোজগার করতে পারতেন। কিন্তু অর্থের চেয়ে পরমার্থই ছিল তাঁর কাম্য। তিনি চাইতেন কেবল মাত্র ধর্মধনে ধনী হতে। সারাদিন কেবল সাধন ভজন জপ তপ নিয়েই থাকতেন। সব আয় ফুরিয়ে গিয়ে সংসার যখন অচল হয়ে উঠত, একমাত্র তখনি নামাবলীখানা ও ওষুধের পুঁটলিটা নিয়ে বেরিয়ে যেতেন ঘর হতে। এ-গাঁ ও-গাঁ করে কিছু রোগী দেখে যা উপার্জন করে নিয়ে আসতেন, আবার তাতে দিনকতক চলে যেত। এর মধ্যে পরম গুণশীলা স্ত্রী গৌরীদেবী আর তাঁকে বিরক্ত করতেন না। রামনাথের পৈত্রিক ভদ্রাসন বাড়ি তাঁর জ্ঞাতিশত্রুরা কেড়ে নেয়। তবু তিনি কোন বিবাদ না করে গাঁয়ের অগ্ন এক ভদ্রলোকের বাড়িতে গিয়ে আশ্রিতরূপে বাস করতে থাকেন এবং পরে ছেলেদের রোজগারে নিজের বাড়ি তৈরি করেন। এই বাড়ির পাশ দিয়ে একটি নদী বয়ে গেছে।

একবার রামনাথের অলৌকিক ক্ষমতার পরিচয় পেয়ে আশ্চর্য হয়ে যায় গাঁয়ের সবাই। রামনাথের নতুন বাড়িটির পাশ দিয়ে যে নদীটি বয়ে গেছে সেটি এদিকের কূল ভেঙ্গে ভেঙ্গে ক্রমশই এগিয়ে আসতে থাকে। অবশেষে রামনাথের বাড়িটি ধ্বংসে যাবার উপক্রম হয়। তাঁর বাড়িটি গেলে গাঁয়ের অনেকের বাড়িই এভাবে নদীর করাল গ্রাসে পড়ে যাবে। সহসা গাঁয়ের অনেকেরই একটা কথা মনে হলো। জীবনে যিনি

কোন পাপ করেন নি, কোন মিথ্যা কথা বলেন নি, সারা জীবন কেবল ধর্মচর্চা নিয়ে আছেন, সেই ধর্মপ্রাণ পুণ্যাত্মা রামনাথ যদি তাঁর আরাধ্য দেবতাকে এই বিপদের কথা জানান তাহলে নিশ্চয়ই তিনি এ বিপদ থেকে তাঁদের রক্ষা করবেন। এ-বিষয়ে এক গভীর ও অটল বিশ্বাস নিয়ে তাঁরা সকলে রামনাথকে এসে ধরলেন।

প্রথমে কথাটায় তেমন আমল দিলেন না রামনাথ। নিজের কোন স্বার্থের জ্ঞাত দেবীকে কখনই কিছু জানান নি। আজ তিনি একথা কী করে জানাবেন। কিন্তু পরক্ষণেই ভাবলেন, এ স্বার্থ তাঁর একার নয়। তাঁর এ স্বার্থের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে গাঁয়ের অনেকের স্বার্থ। সুতরাং জনস্বার্থ ও জনকল্যাণের জ্ঞাত দেবীর কাছে তাঁকে প্রার্থনা জানাতেই হবে। দেবী তার ডাকে সাড়াও দিয়েছিলেন সঙ্গে সঙ্গে। বেশ কিছুক্ষণ ইষ্টদেবীর ধ্যানে নিমগ্ন থাকার পর রামনাথ সকলকে আশ্বাস ও অভয় দিয়ে বললেন, আর কোন ভয় নেই। নদী আর এ কূল ভাঙবে না।

বাকসিদ্ধ মহাপুরুষ রামনাথের কথা অক্ষরে অক্ষরে ফলেছিল। সে দিন থেকে নদী আর এ কূলের কণামাত্র মাটিও গ্রাস করে নি। গাঁয়ের কারো কোন বাড়িরও কোন ক্ষতি হয় নি।

গুরুনাথের বয়স যখন পাঁচ তখন তাঁকে বেন্দা গাঁয়েই কালাচাঁদ সরকারের পাঠশালায় প্রথম বিদ্যাভ্যাসের জ্ঞাত পাঠানো হয়। অল্প কিছুদিনের মধ্যে তাঁর স্মরণশক্তি ও মনীষা দেখে আশ্চর্য হয়ে যান পাঠশালার গুরুমশায়। মাত্র আট বছর বয়সেই পাঠশালায় যা-কিছু শেখার সব শিখে ফেলেন।

এরপর কিছুকাল তাঁর জ্যাঠামশাই রামরতন সেনের কাছে জমিদারি সেরেস্টার কাজকর্ম শিক্ষা করেন গুরুনাথ। তারপর আবার বেন্দা সার্কেল স্কুল। সেখানকার পড়া শেষ না করেই বাবার অনুরোধে বেন্দা গাঁয়েরই টোলে ভর্তি হয়ে কলাপ ব্যাকরণ পড়তে শুরু করেন তিনি।

ছোট থেকেই বড় ভাবুক প্রকৃতির ছিলেন গুরুনাথ। পড়াশুনো করতে বেশী সময় লাগত না তাঁর। একবার কি হবার কোন পড়া পড়লেই তা তাঁর আয়ও হয়ে যেত। কিন্তু বাকি অবসর সময় তিনি খেলাধুলো করে কারো সঙ্গে গল্পগুজব করে কাটাতেন না; কোন একটি নির্জন নিরালা জায়গা বেছে নিয়ে সেখানে একা বসে কী সব ভাবতেন।

চারিদিকে খাল, বিল, নদী গাছপালায় ভরা বেন্দা গ্রামের প্রাকৃতিক শোভা কত মনোরম। কিন্তু বাইরের শোভা যত মনোরমই হোক না কেন সে শোভা দেখে কখনো তৃপ্ত হয় না গুরুনাথের মন। তাঁর কেবলি মনে হয় সৌন্দর্য-অসৌন্দর্য বস্তুর বাইরের আবরণ—সে আবরণ ভেদ করে বস্তুর অন্তর্লোকে যেতে না পারলে তার স্বরূপ বা সত্যকে জানবার কোন উপায় নেই। ছোটবেলা থেকেই সত্য জিজ্ঞাসা ও আত্মজিজ্ঞাসার একটা অস্পষ্ট আবেগ প্রায়ই গুঞ্জরিত হয়ে উঠত গুরুনাথের মনে।

বেন্দার টোলটি হঠাৎ ভেঙ্গে যাওয়ায় গুরুনাথ মামারবাড়ি চলে যান বরিশালের কীর্তিপাশা গাঁয়ে। পরে সেখান থেকে খলিসাকোটায় কবিভূষণ মহাশয়ের টোলে গিয়ে কলাপ ব্যাকরণ শিক্ষা সমাপ্ত করেন। তারপর শারীরিক অসুস্থতা ও সাংসারিক গোলযোগের জ্ঞা কিছুদিন পড়া বন্ধ করে বাড়িতে বসে থাকতে হয় গুরুনাথকে। দু-তিন বছর পর আবার বেন্দা সার্কেল স্কুলে ভর্তি হয়ে মাত্র চার মাস পড়ে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হন তিনি। তখন তাঁর বয়স চোদ্দ।

তবু জ্ঞানের পিপাসা তৃপ্ত হয় না গুরুনাথের। উত্তরোত্তর বেড়ে চলে সে পিপাসা। উচ্চশিক্ষার পিপাসাকে নিবৃত্ত করবার জ্ঞা কলকাতায় এসে নর্ম্যাল স্কুলে ভর্তি হলেন গুরুনাথ। পড়ার খরচের জ্ঞা তাঁর বাবাকে একটি পয়সাও দিতে হয় নি। ভর্তি হবার সময় নির্বাচনী পরীক্ষাতেই কৃতিত্ব দেখিয়ে পাঁচটাকা

বৃত্তি পান। প্রথম বার্ষিকী পরীক্ষাতেও ছয় টাকা বৃত্তি পান।
 রুগ্ন শরীরে বেশী পরিশ্রম করতে না পারলেও ১৮৬৭ সালে
 নর্ম্যাল ত্রৈবার্ষিক পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান
 অধিকার করে সর্গোরবে উত্তীর্ণ হন তিনি। সাহিত্য, ব্যাকরণ, গণিত
 ও দর্শনে বিস্ময়কর প্রতিভা ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় দান করে শ্রীত ও
 বিমুগ্ধ করে তোলেন অধ্যাপকমণ্ডলীকে। মেকালে নর্ম্যাল স্কুলের
 পাঠ্যনুচী অত্যন্ত কঠিন ছিল। বিভিন্ন বিষয়ে যে-সব কঠিন জ্ঞানগর্ভ
 বইগুলি পড়ানো হত সেগুলি পড়ে কোনরকমে উত্তীর্ণ হওয়াই
 সাধারণ ছাত্রের পক্ষে অসম্ভব ব্যাপার ছিল। এক্ষেত্রে গুরুনাথের
 অনন্যসাধারণ কৃতিত্ব দেখে তাঁর দুইজন অধ্যাপক স্বেচ্ছায় তাঁকে
 কবিরত্ন উপাধি দান করেন। তখন গুরুনাথের বয়স মাত্র উনিশ।

এবার অর্থ উপার্জনের চেষ্টা করতে হবে। বিদ্যা অর্জনের
 পর অর্থ উপার্জনই সংসারের রীতি। সংসারের অবস্থা স্বচ্ছন্দ
 নয়! সংসার প্রতিপালনে বাবাকে সাহায্য করা একান্ত কর্তব্য
 বলে মনে করলেন পিতৃভক্ত গুরুনাথ। নর্ম্যাল পাশ করার সঙ্গে
 সঙ্গে অর্থাৎ ১৮৬৮ সালের মার্চ মাসে আহিরীটোলা বঙ্গ বিদ্যালয়ে
 গণিতের শিক্ষক নিযুক্ত হন গুরুনাথ। গণিত ছাড়া বাংলা,
 ইতিহাসও তাঁকে পড়াতে হত। তাঁর গভীর পাণ্ডিত্য ও চরিত্রগত
 মহত্ত্বের দ্বারা অল্পদিনের মধ্যেই শিক্ষক হিসাবে অসামান্য সাফল্য
 লাভ করেন গুরুনাথ। এই সাফল্যের প্রধান কারণ এই ছিল
 এই যে, গুরুনাথ প্রথমে ছাত্রের শারীরিক ও মানসিক অবস্থার
 পরিজ্ঞান লাভ করে তার মেধা ও মানসিক অবস্থার উপযোগী
 শিক্ষা দান করতেন। পরে তিনি প্রধানশিক্ষকের পদে উন্নীত হন।

সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে গুরুনাথের অসাধারণ ব্যুৎপত্তির
 কথা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। বিভিন্ন কলেজ থেকে
 আসে অধ্যাপনা কাজের ভার নেবার ডাক। ডাক কলেজে
 কিছুদিন অস্থায়ীভাবে সংস্কৃতের অধ্যাপকরূপে কাজ করেন। কিন্তু

আহিরীটোলা বঙ্গ বিদ্যালয়টিকে তিনি অন্তর দিয়ে ভালবাসতেন। তাই তা ছেড়ে কোথাও যেতে চাইতেন না তিনি।

সেকালে ছেলেমেয়ের অল্প বয়সেই বিয়ে হত। বিশেষ করে ছেলে উপার্জনক্ষম হলেই বাপ-মা উঠে পড়ে লাগতেন ছেলের বিয়ের জন্ত। গুরুনাথ শিক্ষকতার চাকরিতে ঢোকান সঙ্গে সঙ্গেই বাবা তাঁর বিয়ের জন্ত চেষ্টা করছিলেন। অবশেষে তাঁরা মনের মতো মেয়ে খুঁজে পেলেন। বরিশাল জেলার অন্তর্গত গৈলা গাঁয়ের রামচন্দ্র দাসের জ্যেষ্ঠা কন্যা আদরিনীর সঙ্গে শুভ পরিণয়সূত্রে আরন্ধ হলেন গুরুনাথ। সেটা বাংলা ১২৭৪ সাল অর্থাৎ গুরুনাথের বয়স তখন মাত্র কুড়ি।

কিন্তু দেহের বয়স মাত্র কুড়ি হলে কী হবে মনের বয়স এরই মধ্যে অনেক বেড়ে গেছে গুরুনাথের। বিয়ের আগে তিনি অনেক ভেবে-ছেন তাঁর বিয়ে করা উচিত কি না এবং সংসারধর্ম তাঁর সত্যানুসন্ধানের পথে কোন অন্তরায় সৃষ্টি করবে কি না।

অনেক ভেবে গুরুনাথ উপলব্ধি করলেন, গৃহধর্ম ও সন্ন্যাস পরস্পর বিরোধী নয়। একজন আদর্শ গৃহী ও একজন সন্ন্যাসীর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। গার্হস্থ্য আশ্রমে থেকেও প্রকৃত সন্ন্যাসধর্ম পালন করা যায়। সন্ন্যাসের প্রকৃত অর্থ হলো সৃষ্টিবস্তু হতে মন ও প্রাণকে স্রষ্টার প্রতি সমর্পণ। তা যদি হয় তাহলে গৃহীও উঠতে পারে সার্থক সন্ন্যাসী।

সুদূর শৈশব থেকে বাবার প্রতি একটি অদ্ভুত আকর্ষণ অনুভব করতেন গুরুনাথ। বাবার কথা মনে হতেই ধ্যাননিষ্ঠ জপতপ পরায়ণ, প্রেমভক্তিবিশ্বল একটি মানুষের ছবি ফুটে উঠত অন্তরে। যখন দেখতেন বাবাকে তখন দেখা যেত তিনি কোন না কোন দেব-দেবীর-পূজা অর্চনায় ব্যস্ত।

বাবাকে দেখতে দেখতে হয়ত বাবার মতই হতে চেয়েছিলেন গুরুনাথ। ধর্ম-সাধনার একটি অতি সূক্ষ্ম বীজ কখন যে আপনা:

হতে উপ্ত হয়ে গিয়েছিল অন্তরে তিনি তা বুঝতেও পারেন নি। সেই বীজ আবার কখন অঙ্কুরিত হয়ে উঠেছিল আপনা থেকেই তাও বুঝতে পারেন নি। প্রথম যখন টের পেলেন তখন তাঁর বয়স মাত্র এগারো। এই এগারো বছর বয়সেই তাঁর মধ্যে জাগে নিত্য নিত্য বিবেক। বেদান্তের সাধন চতুষ্টয়ের এটা হলো প্রথম স্তর।

ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যেত্যেবংরূপো বিনিশ্চয়ঃ ।

সোহয়ং নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকঃ সমুদাহৃতঃ ॥

ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা এইরূপ যে নিশ্চিত জ্ঞান তাকেই বলা হয় নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক। ত্রিকালের আরাধিত অপরোক্ষস্বরূপ অখণ্ড অদ্বিতীয় সচ্চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্ম বা আত্মাই সত্যবস্তু। তাছাড়া কার্য-কারণাত্মক সমস্ত জগৎ ও তার অন্তর্গত যাবতীয় বস্তুই অনিত্য।

না জানি কেমন করে সেই সুদূর বাল্যেই গুরুনাথ বুঝেছিলেন এই জগৎ সংসার অনিত্য এবং একমাত্র সেই পরমাত্মাই নিত্য ও সারবস্তু। তিনিই হচ্ছেন একমাত্র পরমার্থ। যেমন করে হোক তাঁকে লাভ করতেই হবে।

ক্রমে বয়স বেড়ে চলল। বাল্য হতে কৈশোর জীবনে প্রবেশ করলেন গুরুনাথ। ছাত্রজীবনের ব্যবহারিক জ্ঞানসাধনার সঙ্গে সঙ্গে চলতে লাগল আধ্যাত্মসাধনা।

এই সময় বেদান্তের সাধন চতুষ্টয়ের দ্বিতীয় সাধনটিও আপনা হতে আয়ত্ত হয়ে যায় গুরুনাথের। এই সাধনের নাম ইহামুক্তফলভোগ-বিরাগ অর্থাৎ পঞ্চইন্দ্রিয়ের ভোগজনিত যে সুখভোগ তাকে তুচ্ছবোধ করতে শেখা।

তদ্বৈরাগ্যং জুগুপ্সা যা দর্শনশ্রবণাদিভিঃ ।

দেহাদিব্রহ্মপর্যন্তে হনিত্যে ভোগবস্তুনি ॥

দর্শন ও শ্রবণাদি দ্বারা দেহ থেকে ব্রহ্মলোক পর্যন্ত অনিত্য ভোগ্য পদার্থ সমূহে যে ঘৃণাবুদ্ধি তাই বৈরাগ্য। এই আসক্তি শূন্যতাকে ইহামুক্তফলভোগবিরাগ বলে। সমস্ত বিষয়-বাসনার রঙ একে একে

যুছে গেল গুরুনাথের মন হতে । এক ধূসর-সুন্দর বৈরাগ্যের আয়ত উদার ছায়া ধীরে ধীরে আচ্ছন্ন করে ফেলল তাঁর জৈবচেতনাকে । মানুষের দৃষ্টি সাধারণতঃ বাইরের দিকে যায় । কিন্তু গুরুনাথ যেন বাইরের জগতের কিছুই দেখতে পাচ্ছেন না । কে যেন চর্মচক্ষু ছ'টিকে চেপে ধরে তাঁর সমস্ত দৃষ্টি ব্যক্তিকে অন্তরের দিকে ফিরিয়ে দিয়েছে । বলছে, ওইখানে দেখ, সব দেখতে পাবে ।

ষোল বছর-পার হতে না হতেই দেবদেবীর সঙ্গে কথা বলা ও সূক্ষ্ম জগৎ দর্শন করবার দুর্লভ ক্ষমতা লাভ করলেন । তবু তাঁর মনে হলো এখনো পরমার্থ লাভের অনেক দেরী । তাই অন্তরাগ্না তাঁর তৃপ্ত হলো না তখনো ।

তখন ব্রাহ্মধর্ম দেশের প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে । মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনার জন্ত প্রচার কার্য চালিয়ে যাচ্ছেন পুরোদমে । নর্ম্যাল স্কুলে পড়বার সময় এই প্রচারের দ্বারা কিছুটা প্রভাবিত হয়ে পড়েন গুরুনাথ । সাকার ঈশ্বরের উপাসনার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ছিলেন ধীরে ধীরে । এবার নিরাকার পরব্রহ্মের উপাসনাকেই ব্রত রূপে গ্রহণ করলেন জীবনে ।

এই সময় গুরুনাথের থেকে তিন বছরের ছোট মহিমচন্দ্র নামে একটি ছেলে নিত্য সহচর হয়ে ওঠেন তাঁর । একসঙ্গে উপাসনা করতেন দুজনে । একসঙ্গে ধর্মালোচনা, জপ, তপ, সাধন, ভজন, সব কিছুই করতেন ।

একদিন তাঁরা দুজনে গুনলেন আমেরিকার স্পিরিচুয়ালিস্ট নামে একটি ধর্ম-সম্প্রদায় আছে । তারা নাকি পরলোকগত আত্মাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে পারে । একথা শোনার পর থেকে গুরুনাথও পারলৌকিক জীবনের প্রতি কৌতূহলী হয়ে উঠলেন এবং মৃত আত্মাদের সঙ্গে কথা বলার জন্ত সাধনা শুরু করে দিলেন । পরে তিনি উপলব্ধি করলেন, পরলোক থেকে আত্মাদের আকর্ষণ

করতে হলে প্রেম, ভক্তি, সরলতা, পবিত্রতা, ঈশ্বরজ্ঞান প্রভৃতি গুণগুলি আয়ত্ত করতে হবে আগে।

তখন ১৮৬৫ সাল। গুরুনাথের বয়স তখন মাত্র আঠারো এবং তাঁর অনুজপ্রতিম মহিমচন্দ্রের বয়স পনের। একদিন মহিম এবং আরও কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে সাধনা করে চলেছেন গুরুনাথ। এমন সময় মহিমের দেহ আশ্রয় করে একজন পারলৌকিক আত্মার আবির্ভাব হলো। আত্মাটি আবির্ভূত হয়ে বলল, আমি একজন ঈশ্বরাদিষ্ট পারলৌকিক আত্মা। আমি যা বলছি কাগজে লিখে রাখ এবং সেইমত কাজ করতে থাক। তারপর গুরুনাথকে লক্ষ্য করে বলল, আজ আমি যার দেহ আশ্রয় করেছি তাকে সাধকরূপে প্রস্তুত করে তুমি উত্তর সাধক হয়ে সত্যধর্ম আবিষ্কার কর এবং আর যারা এখানে আছ তারা সবাই এ কাজে সহায়তা কর। আমরা কয়েকজন ঈশ্বরাদিষ্ট পারলৌকিক আত্মা প্রতি সপ্তায় তোমাদের সাধনার মাত্রা যেদিন পূর্ণ হবে সেদিন আসব। তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে যে বেশী উপযুক্ত তার দেহকে আশ্রয় করে এই ধর্মের সারতত্ত্ব বুঝিয়ে দিয়ে যাব।

এইভাবে কয়েকজন ঈশ্বরাদিষ্ট আত্মার সাহায্যে সত্যধর্ম সম্বন্ধে যা কিছু জানবার সব জেনে ফেললেন গুরুনাথ। এই ধর্ম অনুসারে গুণ সাধনাই সবচেয়ে বড় কাজ এবং গুণের মধ্যে প্রেমই হচ্ছে গুরু এবং রাজা। এবার মন-প্রাণ দিয়ে সাধনা করতে লাগলেন গুরুনাথ। প্রথমে প্রেম ও পরে অত্যান্ত গুণগুলির অভ্যাস করতে লাগলেন। তাঁর দেখাদেখি মহিম ও কয়েকজন বন্ধুও তাই করতে লাগল। সাধনার কাজে যত তাঁরা এগোতে লাগলেন ততই আত্মার উন্নতি সুস্পষ্ট রূপে উপলব্ধি করতে পারলেন তাঁরা। এইবার পারলৌকিক আত্মারা মহিমকে পূর্ণ সাধক ও মূল প্রচারকরূপে এবং গুরুনাথকে উত্তরসাধক রূপে কাজ করবার জ্ঞান অনুমতি দিলেন।

পার্থিব আত্মাদের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ এমন একজনের কাছে দীক্ষা নিলেন গুরুনাথ। নিয়ে সাধনা করে যেতে লাগলেন। প্রথমে সমদর্শন ও মিতাহার; তারপর সত্য, অহিংসা, শৌচ, ব্রহ্মচর্য এবং অপরিগ্রহ এই পাঁচটি গুণের উৎকর্ষ সাধন। মন্ত্রসাধনা ও যোগসাধনাকে অনাবশ্যক জ্ঞানে পরিষ্কার করে শুধু গুণসাধনাকে অবলম্বন করে এগিয়ে যেতে লাগবেন গুরুনাথ। ফলে তাঁর রিপুগুলি একে একে বশীভূত হলো। জীবর প্রতি অভেদজ্ঞান সঞ্চারিত হলো এবং এই জ্ঞান ক্রমে বন্ধুগণের প্রতি প্রসারিত হলো। এই সময় পশুপাখি, কীট-পতঙ্গের উপর থেকে হিংসার ভাব দূর হয়ে গেল। তিনি একটা নির্মল নিষ্পাপ অবস্থার স্বাদ গ্রহণ করতে লাগলেন।

এইভাবে প্রেম, ভক্তি একাগ্রতা ও অভেদজ্ঞান সহকারে সাধনা করতে করতে একদিন সহসা ব্রহ্মতেজ দর্শন করলেন গুরুনাথ। দেখলেন আদিত্যবরণ একজন মহামহোন্নত পুরুষ অমৃত বচনে বললেন, সত্ত্বর হও, অনতিবিলম্বে তোমার নিগূঢ় অভীষ্ট পূর্ণ হবে। ক্রমে কঠোর উপাসনার প্রভাবে তাঁর আত্মা স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহগত সমস্ত পাশ হতে মুক্ত হয়ে জীবনমুক্ত অবস্থা লাভ করল।

কিন্তু তাতেও সম্পূর্ণরূপে তৃপ্ত হতে পারলেন না গুরুনাথ। ব্রহ্মের চকিত বা ক্ষণিক দর্শন নয়, ব্রহ্মের নিত্য দর্শন লাভের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠল তাঁর মন। তার জন্য আরও কঠোর তপস্যায় নিমগ্ন হলেন তিনি। এটাই হলো সাধন জীবনের তৃতীয় বা শেষ স্তর।

এই ভাবে কঠোরতম সাধনার সাহায্যে ধীরে ধীরে ব্রহ্মের প্রতি অভেদ জ্ঞানে সফলকাম হয়ে উঠলেন মহাত্মা গুরুনাথ। এইভাবে প্রেমানন্দময়, জ্ঞানময়, সৎস্বরূপ অর্থাৎ সচ্চিদানন্দ পরম ব্রহ্মের অন্তর্গত হয়ে উঠল তাঁর মহান আত্মা।

এই সাধনায় সিদ্ধি লাভ করতে গিয়ে যে কয়টি স্তর অতিক্রম করতে হয় গুরুনাথকে তা তিনি বিশ্লেষণ করে

দেখিয়েছেন। প্রথমে প্রেমসাধনা, পরে ভক্তি সাধনা। তারপর একাগ্রতা সাধনা। এরপর সরলতা পবিত্রতা ও বিশ্বাস প্রভৃতি গুণসাধনা। এগুলির পর সাধককে করতে হয় চক্রভেদ সাধনা।

ষট্চক্রভেদ না করতে পারলে সাধক অষ্টপাশ থেকে মুক্ত হতে পারে না। দেহের মধ্যে মূলধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ, আজ্ঞা ও সহস্রার এই সাতটি চক্র আছে। কিন্তু চক্র সংখ্যা সাত হলেও সত্য, শিব, শান্তি, সহিষ্ণুতা, প্রিয়কথন ও দয়া এই ছয়টি গুণ সাতটি চক্রভেদের মধ্য দিয়ে আয়ত্ত করতে হয় বলে একে ষট্চক্রভেদসাধনা বলে।

ষট্চক্রভেদ সাধনার পর অভেদজ্ঞান সাধনা। এরপর আত্মার অসীমত্ব সাধনা। যে গুণ দ্বারা দেহবচ্ছিন্ন আত্মা এক সময়ে ভিন্ন ভিন্ন যায়গায় সূক্ষ্মভাবে উপস্থিত হতে পারে তাকে দেহাবচ্ছিন্ন আত্মার অসীমত্ব বলে।

এইভাবে সাধনার সব স্তরগুলি একে একে অতিক্রম করার পর পূর্ণসিদ্ধি লাভ করেন মহাত্মা গুরুনাথ। ফলে বহু অলৌকিক শক্তির অধিকারী হয়ে ওঠেন তিনি। এই শক্তিবলে তিনি এক জায়গায় বসে থেকে দূরে কোথায় কী ঘটছে তা বলে দিতে পারতেন। দূরের শব্দও শুনতে পেতেন। বিবিধ গুণের জ্যোতিঃ দেখতে পেতেন। পরহৃদয়াভিজ্ঞতালাভ অর্থাৎ পরের মনের কথা বলে দিতে পারতেন। পারলৌকিক সূক্ষ্মদেহধারী আত্মাদের আকর্ষণ ও তাদের সঙ্গে কথা-বার্তা বলতে পারতেন। গত জন্মের কথা যেমন জানতে পারতেন, তেমনি ভবিষ্যতে কী হবে তাও জানতে পারতেন। বাক্ সিদ্ধির দ্বারা অপরকে পাপ হতে মুক্ত করতে ও ক্ষেত্র বিশেষে অপরকে প্রয়োজনমত আয়ু দান করতে পারতেন। গুরুনাথের বয়স তখন একচল্লিশ।

মহাত্মা গুরুনাথের এই সব অলৌকিক শক্তির কথা লোকমুখে চারিদিকে ছড়িয়ে যায় অল্প দিনের মধ্যে। একদিন বেন্দাগ্রাম নিবাসী

গোবিন্দ সেন নামে একটি লোক গুরুনাথের বাসায় গিয়ে তাঁর নিকট যত আত্মাদের দেখবার প্রার্থনা জানান। মহাত্মা বললেন, যত আত্মা তুমি দেখলেই জ্ঞান হারিয়ে ফেলবে। অতএব সেই আত্মার অস্তিত্বের পরিচায়ক কাজ দেখ।

এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে দোতলার একটি শূন্য ঘরে একটি ঘটি ঠন ঠন শব্দে বাজতে লাগল। এই ব্যাপার দেখে গোবিন্দবাবু ভয় পেয়ে মহাত্মার কাছে সরে গিয়ে বসলেন।

একবার মহাত্মা গুরুনাথ কোন এক কাজের জন্ত বাসা হতে অত্ন এক জায়গায় গিয়েছিলেন। হঠাৎ তাঁর বন্ধু মহিমচন্দ্র তাঁর কাছে গিয়ে তাড়াতাড়ি বাসায় যেতে বলেন। গুরুনাথ তখন তাঁকে বললেন, আমি যাচ্ছি, তুমি তার আগে এখনি ফিরে যাও। এখন তুমি কী ভাবছ তা বুঝতে পেরেছি।

মহিমচন্দ্র বললেন, কী ভাবছি বল।

গুরুনাথ তখন কতকগুলি ভাল ভাল খাবারের নাম করে বসলেন, তোমার এগুলি খাবার ইচ্ছা হয়েছে। আমি ঠিক সময়ে নিয়ে যাব। তুমি এখনি ফিরে যাও। তা না হলে চোরে সব চুরি করে নিয়ে যাবে।

মহিমচন্দ্র তাড়াতাড়ি বাসায় ফিরে দেখলেন সত্যিই চোর ঢুকেছে। আর একটু দেরী হলে সব চুরি হয়ে যেত।

গৈলাবাসী বসন্তকুমার দাস নামে একজন লোক মহাত্মাকে পরীক্ষা করবার জন্ত একদিন এসে বললেন, বলুন তো আমি গতরাতে স্বপ্নে কী দেখেছি?

মহাত্মা গুরুনাথ সঙ্গে সঙ্গে উত্তর করলেন, তুমি স্বপ্নে তোমার বাবা-মাকে দেখেছ।

মহাত্মা মাঝে মাঝে দূরের ভক্তদের কাছে সূক্ষ্ম শরীরে উপস্থিত হতেন। তাদের সাধনার উৎসাহ ও মনোবল যোগাবার জন্তই তিনি এসব করতেন। একবার রামকুমার বিহারত্ন নামে কোন

এক ভক্তসাধক চিক্কাহুদের ধারে একটি পাহাড়ের উপর বসে উপাসনার শেষে একাগ্রচিত্তে মহাত্মাকে স্মরণ করেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি দেখলেন, মহাত্মা তাঁর সামনেই দাঁড়িয়ে রয়েছেন। কিন্তু হাত বাড়িয়ে ধরতে যেতেই মহাত্মা নিমেষের মধ্যে অন্তর্হিত হয়ে গেলেন। মহাত্মা এই সময় কলকাতায় ছিলেন।

আর একবার রামকুমার বিচারত্ব মশায় হিমালয়ে থাকা কালে মহাত্মাকে স্মরণ করেন। সেবারও সূক্ষ্ম দেহ ধারণ করে দেখা দেন মহাত্মা। এবার শুধু দেখা নয়, তিন ঘণ্টা কাল ধরে নীতি-উপদেশ দান করার পর সেখান থেকে অন্তর্হিত হন।

একদিন মনোহরা দেবী নামে এক শিশু জ্বর ও ওলাওঠা রোগে আক্রান্ত হন। ক্রমে তিনি অত্যন্ত ক্ষীণ হয়ে পড়েন। এই সময় মহাত্মা তাঁর কাছে গিয়ে গায়ে হাত বুলাতেই ক্ষণিকের মধ্যেই সেরে ওঠেন তিনি।

একদিন মহাত্মা ছুই-একজন শিশুর সঙ্গে বসে কথা বলছিলেন। হঠাৎ ফণা উঁচু করে একটি সাপ সেখানে তাঁর পায়ের কাছে উপস্থিত হয়। মহাত্মা কোনরূপ ব্যস্ত বা বিচলিত না হয়ে শান্তকণ্ঠে সাপটিকে সেখান থেকে চলে যেতে বলেন। তার কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে সাপটি সেখান থেকে ফণাটি নিচু করে চলে গেল।

একমাত্র অষ্টাঙ্গ যোগবিদ্যায় পূর্ণসিদ্ধি লাভ করার পরই অষ্টে বিভূতির অধিকারী হন সাধকেরা। ঐশিষ্ট বা বশিষ্টরূপ যোগ-বিভূতির দ্বারা সিদ্ধ সাধকেরা আত্মজ ও সর্বভূতকে বশীভূত করে তার উপর প্রভুত্ব বিস্তার করতে পারেন। তখন তাঁরা থাকে যা বলেন সে তাই শুনতে বাধ্য হয়। গুরুনাথ কিন্তু কোন যোগসাধনা না করে একমাত্র গুণসাধনার দ্বারাই সমস্ত যোগবিভূতি লাভ করেন।

একবার মহাত্মা কলকাতা থেকে মধুমতী নদীর উপর দিয়ে নৌকায় করে গৈলা যাচ্ছিলেন। সঙ্গে ছিলেন তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যা ক্ষীরদা এবং কলকাতা-নিবাসী ভক্ত ত্রিগুণাচরণ মিশ্র। বিকালের

দিকে হঠাৎ ঝড় উঠল। নদীতে বড় বড় ঢেউ উঠতে লাগল। ত্রিগুণা বাবু ভীত হয়ে এই সব ঢেউগুলি সংযত করবার জন্য অনুরোধ করলেন মহাত্মাকে। মহাত্মা তখন বললেন, তরঙ্গ নিবারণ অকর্তব্য। তবে আমি আমাদের নৌকার চারপাশের ঢেউগুলিকে দমন করব। সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল নৌকার চারপাশের ঢেউগুলি শান্ত হয়ে গেল কার ঐন্দ্রজালিক ইংগিতে। নির্বিঘ্নে এগিয়ে যেতে লাগল নৌকাটি।

একদিন গৈলানিবাসী নিবারণ দাস নামে এক ভদ্রলোক মহাত্মার কাছে এসে দূরদর্শন জিনিসটি কী তা বুঝতে চান। মহাত্মা ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত সাতপাড় নামক গাঁয়ে ছিলেন। গৈলা হচ্ছে বরিশাল জেলার অন্তর্গত। মহাত্মা নিবারণবাবুকে গৈলায় দাসেদের বাড়িতে তখন কী কী হচ্ছে সব বুঝিয়ে দিলেন এবং সময়ের উল্লেখ করে একটি কাগজে সব লিখে রাখতে বললেন। পরে নিবারণবাবু গৈলা গিয়ে মিলিয়ে দেখলেন। সবই ঠিক মিলে গেছে।

সত্যধর্ম প্রচারের প্রথম দিকে যাঁরা দীক্ষালাভ করেছিলেন তাঁদের আয়ু দান করবায় ক্ষমতা দেয়া হয়। আবশ্যক বোধে নিজেদের আয়ু থেকে কিছুটা অল্প কোন মৃতপ্রায় লোককে দিতে পারতেন। কিন্তু অনেক সময় দেখা যেত প্রয়োজন না হতেই অনেকে এই ক্ষমতার অপব্যবহার করতেন। একবার সত্য ধর্মাবলম্বী এক মৃতবৎসা মহিলা একটি জীবিত পুত্রসন্তান লাভ করেন। তিনি তখন আনন্দে অধীর হয়ে প্রয়োজনের কথা বিচার না করেই নিজের যতটুকু আয়ু নিঃশেষে পুত্রকে দান করে ফেলেন। সঙ্গে সঙ্গে মহিলাটি মৃত্যুমুখে পতিত হন। এইজন্য তখন হতে মহাত্মার বিনা অনুমতিতে আয়ু দান নিষিদ্ধ করে দেয়া হয়।

এরপর বরাহনগরের ধীরেনবাবু নামে একজন ভদ্রলোক অনেকদিন ধরে কালাজ্বর ও যক্ষ্মারোগে ভুগছিলেন। একদিন তাঁর বাবা গোপনে নিজের আয়ুর কিছুটা ছেলের জীবন রক্ষার

জন্ম দান করেন। মহাত্মা সঙ্গে সঙ্গে তা অলৌকিক যোগ শক্তিবলে জানতে পেরে সেখানে গিয়ে তাঁকে তিরস্কার করেন। তিনি বলেন, আমার বিনা অনুমতিতে আয়ুদান নিষিদ্ধ জেনেও কেন তুমি একাজ করলে? যাই হোক, আমি তোমার ছেলের জীবন এযাত্রা রক্ষা করলাম।

একবার রামকুমার বিদ্যারত্ন মশায় তিব্বতে গিয়ে একজন বৌদ্ধ-লামার কাছে কিছু ধর্মোপদেশ চান। তখন লামা মহাত্মা গুরুনাথের নাম করে তাঁর কাছে যেতে বলেন। মহাত্মা কখনো তিব্বতে যাননি। কী করে সেই লামা তাঁকে জানলেন তা বুঝতে পারলেন না রামকুমার। লামা বললেন, আমরা পরস্পর পরস্পরকে জানি। সূক্ষ্মভাবে তাঁদের মধ্যে দেখা হত ও কথা হত।

একবার মহাত্মা গুরুনাথ হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলে সংকীর্ণ একটি গিরিপথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ দেখলেন, একটি বুনো মোষ তাঁকে দেখে রক্তচক্ষু অবস্থায় তাঁর দিকে চেয়ে আছে।

গুরুনাথ শান্তভাবে তাঁর কাছে গিয়ে বললেন, আমি তো তোমার কোন অপকার করতে আসি নি। তবে তুমি কেন আমায় পথ ছেড়ে দেবে না?

এই কথা শোনার পর মোষটি পথ ছেড়ে অন্য দিকে চলে গেল।

যে ধর্ম চিরকালের জন্ম সত্য; যা অনন্তকাল বিद्यমান ছিল; বর্তমানে আছে এবং চিরকাল থাকবে তাই হচ্ছে সত্যধর্ম।

সত্যধর্মের সবচেয়ে প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো তার নিরাকারবাদিতা। সাকার উপাসনার মতে ভগবান জড় বস্তুজগতের সঙ্গে নিজের একটা অংশকে যুক্ত করেছেন, কিন্তু তিনি নিজেকে নির্লিপ্তভাবে পৃথক করে রেখেছেন। তাই যদি হয় তাহলে আকারবিশিষ্ট জড়বস্তুর মধ্যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্ভব নয়। যিনি

পরমপিতা অনাদি অনন্ত ; তিনি কখনই কোন আকারবিশিষ্ট বস্তুর সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে থাকতে পারেন না। এইজন্ত সত্যধর্ম সাকার উপাসনার পক্ষপাতী নয়।

হিন্দুধর্মের শাক্ত শৈব বৈষ্ণব প্রভৃতি মতাবলম্বীরা সাকার উপাসনা করে থাকলেও তাঁরা স্বীকার করেন যে, পরমপিতা ঈশ্বর নিরাকার। কিন্তু নিরাকার ঈশ্বরের উপাসনা প্রথমে সম্ভব নয় বলে সাকার উপাসনা দরকার। সাকার উপাসনা নিরাকার উপাসনার সোপান মাত্র। এইজন্তই ব্রহ্মের রূপ কল্পনা করা হয়। শাস্ত্রে বলে, সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণোরূপকল্পনা। সাধকদের হিতের জন্তই ব্রহ্ম বা নিরাকার পরমাত্মার রূপ কল্পনা করা হয়। কিন্তু যা শুধু কল্পনা, যা সত্য নয়, তা বাহুল্য মাত্র।

বেদান্ত নিরাকার বাদী হলেও তার থেকে সত্যধর্ম ভিন্ন। বেদান্ত ব্রহ্মকে নিরাকার বলে স্বীকার করলেও বেদান্তে কতকগুলি অহংকারময় অত্যাঁঘ্য কথা আছে। ‘তত্ত্বমসি’, ‘সোহং’ এই সব কথাগুলি অহংকারময়। তাছাড়া উপাসনার কোন ভাল পদ্ধতিরও কোন নির্দেশ নেই বেদান্তে।

সোহং মতের বিরুদ্ধে সত্যধর্মের সবচেয়ে বড় যুক্তি হলো এই যে, সামান্য পাথরের একটি টুকরো যেমন বিশাল হিমালয়কে আত্মতুল্য জ্ঞান করতে পারে না তেমনি ক্ষুদ্র মানুষ কখনো অনন্ত বিরাট ব্রহ্মাণ্ডেশ্বরকে আত্মতুল্য জ্ঞান করতে পারে না। একজন মানুষ অপর পাঁচজন মানুষকেই যখন আপন বলে দেখতে পারে না, সেক্ষেত্রে তার ব্রহ্মের সঙ্গে নিজের অভেদ জ্ঞান একটি অসম্ভব ব্যাপার ছাড়া কিছুই নয়।

সত্যধর্মের আর একটি যুক্তি হলো, মানুষের যতই উন্নতি হোক কখনো তার জীবাত্মা পরমাত্মার মধ্যে লীন হতে পারে না। বৃত্তের মধ্যে নিয়মিত সরল রৈখিক ক্ষেত্রের বাহুসংখ্যা যতই বাড়ানো হোক না কেন তা কখনই বৃত্তের সমান হতে পারে না।

তেমনি ঈশ্বরের এই সৃষ্ট জগতে যত রকমের পদার্থ আছে তাদের গুণগুলি যতই বাড়ুক না কেন তারা কখনই পরম পিতার তুল্য হতে পারে না।

ব্রাহ্মধর্মও নিরাকার উপাসনার পক্ষপাতী হলেও সত্যধর্মের সঙ্গে তার কয়েকটি বিষয়ে পার্থক্য আছে। ব্রাহ্মধর্মে প্রকৃত উপাসনার পদ্ধতি নেই। যে গুরু না হলে মানুষের ধর্মশিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না, সেই গুরুর প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকার করে না ব্রাহ্মধর্ম। তা ছাড়া এই ধর্মে জড়জগতের সৃষ্টি বিষয়সমূহ জানবার কোন ব্যবস্থা নেই।

পৃথিবীতে বহু ধর্ম আছে। কিন্তু প্রায় সব ধর্মই কেবলমাত্র ইহলোক নিয়েই বিব্রত। এই পৃথিবীর বাইরে এই জীবনের বাইরে সবকিছুই অন্ধকার। পরলোক সম্বন্ধে কোন যথার্থ পরিজ্ঞানের ব্যবস্থা অন্য ধর্মে পাওয়া যায় না। ইহলোকে থেকেও যে পরলোকে যাওয়াত করা যায় এবং সেখানকার বিষয় জানতে পাওয়া যায় তা একমাত্র সত্যধর্ম প্রমাণ করেছে। সত্যধর্ম অসীমভাবে বিস্তৃত। ব্রাহ্মধর্ম ব্রহ্মের অসীমত্বের কথা স্বীকার করলেও এই অসীমের দিকে যাওয়ার কোন পথ নির্দেশ করেনি। কিন্তু সত্যধর্ম অসীম জ্ঞানমার্গের পথ দেখায়।

সত্যধর্মের মূল লক্ষ্য হলো তিনটি। যথা মানবজন্মের সার্থকতা সম্পাদন, জীবাত্তার বিনাশ সাধন ও ভগ্নাংশের অখণ্ড আকারে পরিবর্তন। এই তিনটি লক্ষ্য পৌঁছবার উপায়ের পথ বলে দিয়েছে সত্যধর্ম। মানুষ যখন পরমপিতার প্রেমসুখা পান করে পরম আনন্দলাভ করে, তখনই তার মানব জন্মের সার্থকতা সম্পাদিত হয়। অষ্টপাশ থেকে মুক্ত হলেই জীবন বিনাশ হয়। মানব জীবন স্বরূপতঃ ভগ্নাংশ। কারণ পরমাত্মার থেকে তা বিচ্ছিন্ন এবং দেহের মধ্যে আবদ্ধ। দেহের মধ্যে জীবরূপে আবদ্ধ পরমাত্মার জীবাত্তা নাশ হলেই মানুষের জীবন ক্রমশই পূর্ণরূপে

অনাদি অনন্ত ঈশ্বরের নিকটবর্তীতা লাভ করতে থাকে। একেই বলে ভগ্নাংশের অখণ্ড আকারে পরিবর্তন।

ওঁ সত্যং পূর্ণমমৃতং ওঁ। উপাসনার আগে ও পরে এই কথা বলতে হবে।

সত্য হচ্ছে পূর্ণ এবং অমৃত। সত্যলাভ মানেই পূর্ণ জীবন লাভ করা। সত্য লাভই হলো অমৃত লাভ।

এই সত্যলাভের জন্য সারাজীবন ধরে সাধনা করে যেতে হয়। এই জন্য উপাসনার উপর জোর দেয় সত্যধর্ম। রোজ অন্ততঃ তিন ঘণ্টা করে উপাসনা করতে হবে। সকালে সন্ধ্যায় বলতে হবে, হে করুণাময় দয়াময় পিতা, এই দিন বা রাত্রি যেন তোমার শ্রীভিকররূপে যাপন করতে পারি।

সত্যধর্মে উপাসনার কয়েকটি স্তরের নির্দেশ আছে। প্রথমে একাগ্রচিত্তে দুই একটি গুণ কীর্তন বা গান করতে হবে। গুণকীর্তনের পর আপন আপন পাপের উল্লেখ করতে হবে। পাপগুলির মধ্যে যেগুলি প্রথমে মনে পড়বে সেগুলির কথা আগে উল্লেখ করতে হবে। পরে সাধারণ ভাবে বাকিগুলির উল্লেখ করতে হবে। কাম ক্রোধ প্রভৃতি দ্বিপুণ্ডলিও পাপের মধ্যে গণ্য। এজন্য তাদের কথারও উল্লেখ করতে হবে। পরম পিতার গুণকীর্তন ও নিজ পাপের স্বীকারোক্তির পর যখন অনুশোচনা ও আত্মগ্লানি জাগবে তখন পাপ হতে মুক্তির জন্য প্রার্থনা করতে হবে। অবশেষে গুণের জন্য প্রার্থনা। প্রথমে সাধারণভাবে সমস্ত গুণের জন্য প্রার্থনা করতে হবে। পরে প্রেম, ভক্তি একাগ্রতা প্রভৃতির মধ্যে যে গুণের অভাব সবচেয়ে বেশী বোধ হবে তার জন্য প্রার্থনা করতে হবে।

সত্যধর্মে দীক্ষাদানের পদ্ধতিটিও বড় চমৎকার। এই দীক্ষাদানের মধ্যে অহংকারের কোন অবকাশ নেই। গুরু শিষ্যের সম্পর্ক এক মধুর ভালবাসা ও ভ্রাতৃত্বাবের উপর প্রতিষ্ঠিত।

সত্যধর্ম গ্রহণ করতে ইচ্ছুক দীক্ষার্থী প্রথমে কোন দীক্ষাদাতার কাছে গিয়ে ব্যাকুলভাবে প্রার্থনা করবে। তখন দীক্ষাদাতা দীক্ষার্থীর হাত দুটি নিজের হাতের মধ্যে ধারণ করে প্রেম ভক্তি ও শ্রদ্ধার সঙ্গে বলবেন, হে অসীম অনন্ত গুণধাম প্রভু দয়াময় পিতা! অত্ন আমার সহোদরপ্রতিম (নাম উচ্চারণ) তোমার পথাবলম্বী হইতে ব্যাকুলান্তঃ-করণে যাক্ষণ করিতে তাহাকে তোমার চরণতলে সমর্পণ করিলাম। তারপর উভয়ে পরস্পরের হাত চুষন করবেন। শাস্ত্রে বলে যা দিব্য বা পরম জ্ঞানদান করে এবং যাতে সব সঞ্চিত পাপ ক্ষীণ হয় তাকেই বলে দীক্ষা।

দীয়তে জ্ঞানমত্যন্তং ক্ষীয়তে পাপসঞ্চয়ঃ।

তস্মাদ্ দীক্ষেতি সা প্রোক্তা মুনিভিস্তত্ত্বদর্শিভিঃ ॥

দীক্ষা মানেই নব জন্ম। এই পরম নব জন্মের পিতা হলো গুরু, মাতা বাহ্য জগতের অভিজ্ঞতা বা বিশিষ্ট জ্ঞান এবং জন্মভূমি হচ্ছে পরমেশ্বরের পরম প্রেমময় কোল। এই দীক্ষা জন্ম ছাড়া মানুষের মানবজন্ম বিফল।

শাস্ত্রমতে গুরু সাত রকমের—পরমেশ্বর গুরুশ্রেষ্ঠ, সাক্ষর গুরু মন্ত্র, মন্ত্রদাতা পরমগুরু, জন্মদাতা মাতাপিতা মহাগুরু, রাজা গুরু, আচার্য গুরু ও যাবতীয় ভক্তিভাজন জনই গুরু।

শাস্ত্রমতে শিষ্যেরও কতকগুলি গুণ থাকা দরকার। যিনি আস্তিক, যিনি গুরুর প্রতি, মন্ত্রের প্রতি ও ঈশ্বরের প্রতি দৃঢ়ভক্তিসম্পন্ন এবং যিনি পরলোকের অস্তিত্ব জ্ঞানবিশিষ্ট তিনিই শিষ্য হতে পারেন। পুষ্প হতে পুষ্পান্তরে গমনরত মধুলোলুপ ভৃঙ্গের মত জ্ঞানলুব্ধ শিষ্য এক গুরু হতে অন্য গুরুর নিকট গমন করতে পারে। দীক্ষাগুরুরও কতকগুলি গুণ থাকা দরকার। দীক্ষাগুরু হবেন সর্বশাস্ত্রে পারদর্শী, স্বচ্ছ, সুন্দর, সত্যবাদী, সুবক্তা, জিতেদ্রিয়, কুলীন। এখানে কুলীন অর্থে জন্মের দিক থেকে নয়, জ্ঞানের দিক থেকে। কুলার্বতন্ত্রে কুলীনের গুণ সম্বন্ধে বলা হয়েছে :

জীব প্রকৃতি তত্ত্ব দিক কালাকাশমেবচ ।

ক্ষিত্যপ্ তেজো বায়বশ্চ কুলমিত্যভিধীয়তে ॥

যিনি জীবতত্ত্ব, প্রকৃতি তত্ত্ব, দিক, কাল, ও পঞ্চভূত—এই সকল বিষয়ে জ্ঞানসম্পন্ন তিনিই কুলীন ।

কোন কোন ব্রাহ্ম বলেন, ঈশ্বর যখন সর্বশক্তিমান তখন তাঁর শক্তিপ্রভাবে গুরুর অভাবেও যে মানুষের মুক্তি হতে পারে, তাতে সন্দেহ করা উচিত নয় ।

এর উত্তরে সত্য ধর্মের যুক্তি এই যে, ঈশ্বর যেমন সর্বশক্তিমান, তেমনি তিনি ক্রমময়ী সৃষ্টির বিধাতা । তাঁর অনন্ত গুণ এমনভাবে আছে যে এক গুণ অগুণের বিরোধী নয় । তিনি যেমন পাপীর শাস্তিদাতা, তেমনি আবার পাপীর উদ্ধার কর্তা । তাঁর সমস্ত সৃষ্টিই একটি ক্রমপর্যায় মেনে চলে । রাত্রির অবসানের সঙ্গে সঙ্গেই একেবারে মধ্যাহ্ন হয় নয় না । কোন ছেলেকে ভূমিষ্ঠ হবার সঙ্গে সঙ্গেই বলবান করে তোলেন না । সব কিছু হয় ক্রমানুসারে । ব্রহ্মদর্শী গুরু ছাড়া ঈশ্বরের এই ক্রমানুসারিনী গুণাবলীর প্রকৃত মর্ম উদ্ঘাটন সম্ভব নয় । গুরু স্বীকার না করলে প্রকৃত সাধনার ব্যাঘাত হয় । বিশ্বসৃষ্টির দিকে ভালভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যায় সব কিছুই ক্রমপূর্ণ এবং সকল উন্নতিই পরকীয় সাহায্য সাপেক্ষ ।

সত্যধর্মমতে গুণসাধনাই ধর্মসাধনার ভিত্তি । উপাসনার দ্বারা গুণের বৃদ্ধি হলেও অভ্যাস না করলে গুণের প্রকৃত উন্নতি হয় না । সত্যধর্মমতে প্রেম, ভক্তি ও একাগ্রতা শ্রেষ্ঠ গুণ । এই গুণগুলির মধ্যে যেটি শ্রেষ্ঠ গুণ বিপরীত ক্রমে তার অভ্যাস আগে করতে করতে হবে । যে গুণের অধিকার এবং ব্যাপকতা সবচেয়ে বেশী সেটিই হলো শ্রেষ্ঠ গুণ ।

প্রেম বিশ্বব্রহ্মাণ্ডব্যাপিনী ; তাই প্রেম হচ্ছে শ্রেষ্ঠ গুণ । এই গুণসাধনার ফল এই যে, প্রথমে ঈশ্বর সৃষ্ট চেতন পদার্থ ও পরে অচেতন

জড় বস্তুর প্রতি প্রেম বিস্তার করে অতুল আনন্দ উপভোগ করা যায় এবং এইভাবে ধীরে ধীরে অনন্ত প্রেমময় পরম পিতার নিকটবর্তী হওয়া যায়।

এই সব শ্রেষ্ঠ গুণগুলির সাধনার উপায়ও বলে দেওয়া হয়েছে সত্যধর্মে। সত্যধর্মে দাম্পত্য প্রেমই সর্বপ্রেমের মূল। পুরুষ সাধুশীল স্ত্রীকে এবং স্ত্রী সাধুশীল পুরুষকে অবলম্বন করে প্রেম গুণাভ্যাস করবে। করুণরস ও মমতা দ্বারা প্রেমের বৃদ্ধি হয়।

মাতাপিতার প্রতি ভক্তির মাধ্যমেই ভক্তিগুণের অভ্যাস করতে হয়। মাতাপিতার পর গুরুও বিবিধ উৎকৃষ্ট গুণসম্পন্ন আত্মার প্রতি ভক্তিভাজন হতে হয়। এইভাবে ভক্তিলাভ সহজ হয়।

এরপর একাগ্রতা। পরম পিতার উপাসনার সময় রোজ একাগ্রতা বাড়বে। প্রেম ও ভক্তিলাভ হলেও একাগ্রতা বাড়ে। উপাসনার সবয় মনে করতে হবে।

যে শক্তি আমাদের প্রার্থনার আগেই আমাদের কত কি দিয়েছেন। প্রাণের সঙ্গে প্রার্থনা করতে তিনি সমস্তই আমাদের দেবেন। তাতে কোন সন্দেহ নেই।

দর্শনে পদার্থ দুই প্রকার—ভাব ও অভাব। ভাব পদার্থ পাঁচ প্রকার—দ্রব্য, গুণ, কর্ম, জাতি ও সম্বন্ধ। যা দ্রব্যে অবস্থিত হয়ে দ্রব্যের পরিচয় দেয়, কিন্তু স্বয়ং দ্রব্য বা ক্রিয়া নয় এবং যার বৃদ্ধি বা হ্রাস লক্ষিত হয় তাকেই গুণ বলে।

প্রেম অসীম গুণ, ভক্তি এই গুণের সীমাবদ্ধ ভাব অর্থাৎ স্ভয় প্রেম। সৃষ্ট আত্মা অসীম, সুতরাং প্রেমের ভাজনও অসীম। কিন্তু ভক্তির ভাজন অসীম নয়। কারণ সকলকেই ভয় করি না বা সমীহ করি না। ভক্তির যত উন্নতি হয় ততই ভক্তি-ভাজনের সংখ্যা কমে যায় এবং অবশেষে একমাত্র অনাদি পুরুষই

ভক্তিভাজন থেকে যান। কিন্তু প্রেম গুণের যতই বৃদ্ধি হয়, প্রেমের ভাজনের সংখ্যাও তেমনি বেড়ে যায়। পার্থিব ভক্তির পূর্ণতা ও লয় হলে ঈশ্বরভক্তি বিদ্যমান থাকে।

যে গুণ দ্বারা একটি মাত্র পদার্থ অবলম্বন করে মন স্থির থাকে তাকে একাগ্রতা বলে। এই একাগ্রতা চার রকমের। যথা ক্লিকনিবিষ্টতা বা বিক্ষিপ্ততা, এক নিবিষ্টতা, একলক্ষ্য প্রধানতা ও একত্বময়তা বা পূর্ণ একাগ্রতা।

প্রথম ভাগে মন এক বস্তুতে কিছুকাল অবস্থান করার পর অস্থির বস্তুতে চলে যায়। বাল্যকালে এইভাবে দেখা যায়। দ্বিতীয় ভাগে মন অস্থির বিষয়ের দ্বারা আকৃষ্ট হয়েও এক বস্তুতেই বহুকাল থাকে। একাগ্রতার এই অবস্থা যৌবনকালে দেখা যায়। একাগ্রতার তৃতীয় ভাগে মন একটি বিষয়ে প্রধানভাবে নিবিষ্ট থাকে, কিন্তু অস্থির বিষয়ের কথাও জানতে পারে ও বিভিন্ন কর্ম করেও লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় না। এই একাগ্রতা প্রৌঢ় জীবনের প্রতিক্রিয়া। একাগ্রতার চতুর্থ বা শেষ অবস্থায় খণ্ডন সাধনা শেষ হয় এবং নির্জন সাধনা শুরু হয় বলে সব কিছুই এক বলে জ্ঞান হয়। একত্ব জ্ঞানের উৎপত্তির ফলে যখন যাতে অভিনিবিষ্ট হওয়া যায়, তখন সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডকে তার অন্তর্গত করে দেখতে পাওয়া যায়। এই একত্বময়তাকেই পূর্ণ একাগ্রতা বলে এবং অবস্থা পূর্ণ বার্ষক্যের প্রতিক্রিয়া।

ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে ভগবান তিনটি যোগের কথা বলেছেন,

যোগ জ্ঞয়ো ময়া প্রোক্তা নূনাং জ্ঞেয়ো বিধিৎসয়া

জ্ঞানং কর্মচ ভক্তিঞ্চ নোপায়োহতোহস্তু কশ্চন।

আমি মানবগণের মঙ্গল বিধানের জন্য তিন রকমের যোগের কথা বলছি। যথা জ্ঞান যোগ, কর্মযোগ ও ভক্তিযোগ। এছাড়া অস্থির কোন উপায় নেই। এরপর কার পক্ষে কোন যোগ দরকার তাও বলেছেন। নির্বেদযুক্ত ব্যক্তিদের জ্ঞানযোগ,

সংসারাসক্ত কর্মীদের জন্ম কর্মযোগ এবং ঈশ্বর বাক্যে শ্রদ্ধাবান
অনতিসক্ত ব্যক্তিদের জন্ম ভক্তিযোগের কথা বলেছেন।

সত্যধর্ম মতে ভক্তিযোগ ও জ্ঞানযোগ কর্মযোগ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।
যিনি অনাদি অনন্ত অসীম অচিন্ত্য অবাঙ্মানসগোচর, যিনি
সত্যস্বরূপ এবং যাঁর সত্তায় মিথ্যা জগৎও সত্যরূপে প্রতিভাত,
যিনি জ্ঞানস্বরূপ ও অমৃতস্বরূপ, যিনি মঙ্গলময় ও দয়াময়, যিনি
প্রকাশ, কর্ম ও-আবরণ এই গুণত্রয়ের সমাবেশে নিজের স্বপ্রকাশ
নাম জগতে প্রকাশ করছেন, সেই কর্মগুণনিধি, আনন্দনিধি,
সর্বশক্তিমান পরমেশ্বরের কাছে যেতে হলে ভক্তিযোগ ছাড়া
অন্য কোন উপায় নেই।

যেমন পাকা রসাল ফলের অল্পমধুর রসের অন্য ফলরসের সঙ্গে
তুলনা করা যায় না, তেমনি যাঁরা প্রকৃত সাধনপথ অবলম্বন করে
ঈশ্বররাজ্যে গমন করেন তাঁরাও এমন একটি অতুলনীয় অবস্থা
লাভ করেন যা অল্পমধুর অর্থাৎ প্রেম ভক্তি মিশ্রিত। এই অবস্থা
ভক্তি ও প্রেমের মিশ্রিত অবস্থা। কোন কিছুর তুলনা দিয়ে এই
অবস্থার কথা বলে বোঝান যায় না।

মহাত্মা গুরুনাথের অতুলনীয় আধ্যাত্মিক প্রভাবের ফলে সত্যধর্ম
যখন বাংলাদেশে ক্রমশঃ প্রসার লাভ করে চলেছে তখন ইঠাৎ
একদিন একটি দুর্ঘটনায় আহত হয়ে পড়েন গুরুনাথ। তখন ১৩২১
সালের জ্যৈষ্ঠ মাস। একদিন প্রবল ঝড়ে ঘর পড়ে যাওয়ায় গলায়
প্রচণ্ড আঘাত পান তিনি। যিনি অজস্র ভক্ত শিষ্যের রোগ নিরাময়
করেছেন, তিনি কিন্তু নিজের রোগমুক্তির কোন চেষ্টাই করলেন না।
আত্মীয় বন্ধু ও শিষ্যদের ব্যাকুল ক্রন্দনকে উপেক্ষা করে জ্যৈষ্ঠ-
মাসের একুশ তারিখে এই স্বেচ্ছাময় মহাপুরুষ স্বেচ্ছায় তাঁর নশ্বর
শরদেহ ত্যাগ করে পরলোক গমন করেন।

LIBRARY

No.

Shri Shri

BANARAS

শ্রী শ্রী Ashram

शुद्ध ज्ञान